এসো তাকওয়া অর্জন করি

২য় খণ্ড

মুফতী মনসূরুল হক

www.darsemansoor.com
www.islamijindegi.com
"Islami Jindegi" এ্যাপ ইন্সটল করুন

হযরত যাকারিয়া ও ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালাম

হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম

হযরত মুহাম্মাদ ﷺ

www.darsemansoor.com
www.islamijindegi.com
“Islami Jindegi” এ্যাপ ইন্সটল করুন

হযরত যাকারিয়া ও ইয়াহইয়া আ.

মুফতী মনসূরুল হক

মাকতাবাতুল মানসূর
www.darsemansoor.com
www.islamijindegi.com

GET IT ON Google Play
Download From App Store

সূচীপত্র

হযরত যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালাম ও হযরত ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালামের জীবনে আল্লাহ তা‘আলার অপূর্ব নিদর্শন
যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালামের জন্ম ও বংশপরিচয়
মারিয়াম ‘আলাইহাস সালামের লালন-পালনে যাকারিয়া আ.-এর ভূমিকা
ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালাম ও ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম এর পারস্পরিক সম্পর্ক
কুরআনে যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালামের আলোচনা
দীন প্রচারে আল্লাহর নিকট সন্তান কামনা
বন্ধ্যা স্ত্রীর গর্ভে সন্তানধারণ
ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালামের জন্মলাভ
গর্ভের শিশুর সিজদাপ্রদান
ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালামের আল্লাহভীতি
যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালাম ও ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালামের ওফাত
যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালাম ও ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালামের শাহাদাতের ব্যাপারে ভিত্তিহীন বর্ণনা
ভিত্তিহীন বর্ণনার প্রথম অংশ: ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালামের শহীদ হওয়া প্রসঙ্গ
ভিত্তিহীন বর্ণনার দ্বিতীয় অংশ: যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালামের শহীদ হওয়া প্রসঙ্গ
যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালাম ও ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালামের ঘটনা থেকে শিক্ষা
মারিয়াম ‘আলাইহাস সালামের জীবনচরিত
‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম সম্পর্কে খ্রিস্টানদের ভ্রান্ত চিন্তা
মারিয়াম ‘আলাইহাস সালামের জন্ম ও তার মায়ের মান্নত
মারিয়াম ও মেরী নাম রাখা সম্পর্কে জরুরী কথা
জন্মের দিন সন্তানের নাম রাখা প্রসঙ্গে
ঝাড়-ফুঁক ও তাবিজ-কবজ সম্পর্কে কিছু কথা
হান্না আলাইহাস সালামের মান্নত পূরণ
দ্বন্দ্ব নিরসনে লটারীর আয়োজন
মারিয়াম ‘আলাইহাস সালামের বেড়ে উঠা
আল্লাহর পক্ষ থেকে রিযিকপ্রাপ্তি
রিযিকের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুজিযা
মারিয়াম ‘আলাইহাস সালাম যেভাবে গর্ভবতী হলেন
গর্ভধারণ ও সন্তানপ্রসব

ইসলামের দৃষ্টিতে মৃত্যু কামনার বিধান
শ্রেষ্ঠত্বের আসনে মারিয়াম ‘আলাইহাস সালাম
পৃথিবীর কয়েকজন শ্রেষ্ঠ নারী

باسمه تعالی

হযরত যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালাম ও হযরত ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালামের জীবনে আল্লাহ তা‘আলার অপূর্ব নিদর্শন

আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

اِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرَانَ رَبِّ اِنِّیْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِیْ بَطْنِیْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّیْ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ○ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّیْ وَضَعْتُهَاۤ اُنْثٰی وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَیْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰی وَاِنِّیْ سَمَّیْتُهَا مَرْیَمَ وَاِنِّیْۤ اُعِیْذُهَا بِكَ وَذُرِّیَّتَهَا مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ○ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ وَّاَنْۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَّكَفَّلَهَا زَكَرِیَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَیْهَا زَكَرِیَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ یٰمَرْیَمُ اَنّٰی لَكِ هٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ یَرْزُقُ مَنْ یَّشَآءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ ○ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِیَّا رَبَّهٗ قَالَ رَبِّ هَبْ لِیْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّیَّةً طَیِّبَةً اِنَّكَ سَمِیْعُ الدُّعَآءِ ○

অর্থ: স্মরণ করুন, যখন ইমরানের স্ত্রী বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক, আমার গর্ভস্থ সন্তানকে একান্ত আপনার জন্য উৎসর্গ করলাম। সুতরাং আপনি আমার প্রার্থনা কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী। অতঃপর যখন সে সন্তান প্রসব করল, তখন বললো, হে আমার প্রতিপালক, আমি কন্যাসন্তান প্রসব করেছি; সে যা প্রসব করেছে, সে সম্বন্ধে আল্লাহ সম্যক অবগত। আর (ঐ কাঙ্ক্ষিত) ছেলে সন্তান (এই) মেয়ে সন্তানের মতো নয়। আমি তার নাম মারিয়াম রেখেছি। আমি তাকে ও তার বংশধরদের অভিশপ্ত শয়তান থেকে আপনার আশ্রয়ে সোপর্দ করছি। অতঃপর তার প্রতিপালক তাকে উত্তমরূপে কবুল করে নিলেন এবং তাকে উত্তমরূপে প্রতিপালন করলেন। আর তাকে যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালামের তত্ত্বাবধানে দিলেন। যখনই যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালাম মারিয়াম আ. এর কক্ষে যেতেন, তখনই তার নিকট বিশেষ খাদ্যসামগ্রী দেখতে পেতেন। তিনি বললেন, হে মারিয়াম, তোমার জন্য এসব কোত্থেকে এলো?

মারিয়াম উত্তর দিলেন, এসব আল্লাহর পক্ষ হতে এসেছে। নিশ্চয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিযিক দান করেন। সেখানেই যাকারিয়া তার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করে বললেন, হে আমার প্রতিপালক, আমাকে আপনি নিজের পক্ষ হতে সৎ বংশধর দান করুন। নিশ্চয় আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী। (সূরা আল-ইমরান; আয়াত: ৩৫-৩৮)

যাকারিয়া 'আলাইহিস সালামের জন্ম ও বংশপরিচয়

হযরত যাকারিয়া 'আলাইহিস সালামের পিতার নাম 'বরখিয়া।' কোন কোন মুফাসসির বলেন, 'উদন'। তার স্ত্রী তথা ইয়াহইয়া 'আলাইহিস সালামের মায়ের নাম ছিল 'ঈশা'।

হযরত যাকারিয়া 'আলাইহিস সালাম খ্রিস্টপূর্ব আনুমানিক ৯১ অব্দে বর্তমান প্যালেস্টাইনে জন্মগ্রহণ করেন এবং দ্বিতীয় খ্রিস্টাব্দে নবুওয়্যাত প্রাপ্ত হন। পবিত্র কুরআনে চারটি সূরায় তার নাম মোট সাতবার উল্লেখ হয়েছে। তার একমাত্র সন্তান হযরত ইয়াহইয়া 'আলাইহিস সালাম। তিনিও একজন নবী। উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত হযরত যাকারিয়া 'আলাইহিস সালামের দু'আর পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এই পুত্রসন্তান দান করেছিলেন।

সকল নবীরই বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তাঁরা আপন জীবিকার ব্যবস্থা নিজ হাতেই করতেন। এ ব্যাপারে তাঁরা কারো দ্বারস্থ হতেন না। বরং একথা বলতেন,

ما اسئلكم عليه من اجر ان اجرى الا علي رب العلمين

অর্থ: আমি এ কাজের বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না। আমার প্রতিদান বিশ্বজগতের প্রতিপালক নিজ দায়িত্বে রেখেছেন। (সূরা শু'আরা- ১০৯)

এই 'নববী বৈশিষ্ট্যে' হযরত যাকারিয়া আ.-ও ব্যতিক্রম ছিলেন না। সহীহ মুসলিমের এক বর্ণনায় এসেছে, নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

كان زكرياءنجارا

অর্থাৎ 'যাকারিয়া আ. কাঠের কাজ করতেন'। (সহীহ মুলিম, ফাযাইল অধ্যায়, হাদীস নং: ১৬৯। আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড: ২, পৃষ্টা: ৪৯)। এর মাধ্যমেই নিজের জীবিকা নির্বাহ করতেন।

মারিয়াম 'আলাইহাস সালামের লালন-পালনে যাকারিয়া আ.-এর ভূমিকা

পবিত্র কুরআনের উল্লিখিত আয়াতে ইমরান-কন্যা হযরত মারিয়াম 'আলাইহাস সালামের জন্ম ও বাল্যকালের ঘটনাকে কেন্দ্র করে হযরত যাকারিয়া 'আলাইহিস সালামের আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে। সে আলোচনায় আবার তাঁর সন্তান হযরত ইয়াহইয়া 'আলাইহিস সালামের আলোচনা এসেছে।

আল্লামা ইবনে ইসহাক রহ. বলেন, ইমরান-কন্যা মারিয়ামকে যাকারিয়া 'আলাইহিস সালামের তত্ত্বাবধানে প্রদানের কারণ হল, তিনি পিতৃহীন ছিলেন। মুসতাদরাকে হাকিমে বর্ণিত এক হাদীসের ভাষ্যমতে, পিতা তো আগেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন, অতঃপর মারিয়াম 'আলাইহাস সালামের মাতার মৃত্যুর পর তাকে যাকারিয়া 'আলাইহিস সালামের তত্ত্বাবধানে দেয়া হয়। (মুসতাদরাকে হাকীম, ৩:২০৭)

এ থেকে বুঝা যায়, শিশু মারিয়াম 'আলাইহাস সালামকে যাকারিয়া 'আলাইহিস সালামের তত্ত্বাবধানে দেয়ার সময় তার বাবা-মা কেউ জীবিত ছিলেন না। কোন কোন মুফাসসির বলেন, সে বছর বনী ইসরাইল সম্প্রদায়ের মাঝে দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছিল। এ কারণে যাকারিয়া 'আলাইহিস সালাম শিশু মারিয়ামকে নিজের তত্ত্বাবধানে নিয়েছিলেন।

তবে মারিয়াম 'আলাইহাস সালামকে নিজের দায়িত্বে নিতে যাকারিয়া অলাইহিস সালামকে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এ

TOP

Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com App Store

সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ○

‘এটা গাইবের সংবাদ, যা আমি আপনার নিকট ওহী পাঠাচ্ছি। আপনি তাদের নিকট ছিলেন না, যখন তারা কলম নিক্ষেপ করছিল (এ ফায়সালা করার জন্য) যে, মারিয়ামের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাদের মধ্যে কে গ্রহণ করবে এবং আপনি তাদের নিকট ছিলেন না, যখন তারা বাদানুবাদ করছিল’। (সূরা আল- ইমরান, আয়াত:৪৪)

এর বিস্তারিত ঘটনা হল, ইকরীমা রা. বলেন, মারিয়াম ‘আলাইহাস সালামের আম্মা মারিয়াম ‘আলাইহাস সালামকে কোলে নিয়ে কাহিন বিন হারুন ‘আলাইহিস সালামের বংশধরের কাছে গেলেন। তখন তারা বায়তুল মুকাদ্দাসের দায়িত্বে ছিলেন। ইমরান ‘আলাইহিস সালামের স্ত্রী হান্না তাদের বললেন, মান্নতকৃত এই শিশুটি আপনারা রাখুন। কারণ, আমি তাকে বায়তুল মুকাদ্দাসের খেদমতের জন্য উৎসর্গ করেছি। আর এই হল আমার মেয়ে। জানি, ঋতুমতী নারীরা গির্জায় প্রবেশ করে না, তবু আমি একে বাড়িতে ফিরিয়ে নিব না। তারা বললেন, এ তো আমাদের ইমাম সাহেবের মেয়ে, যিনি আমাদের জন্য উৎসর্গিত ছিলেন। (মারিয়াম ‘আলাইহাস সালামের বাবা ইমরান ‘আলাইহিস সালাম তাদের নামাযের ইমামতি করতেন।) সেসময় যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালাম বললেন, একে আমার তত্ত্বাবধানে দাও। কারণ, আমার স্ত্রী এর খালা। তখন তারা বললেন, না, এতে আমরা সন্তুষ্ট নই। সে হল আমাদের ইমাম সাহেবের মেয়ে। আমরা তার তত্ত্বাবধান করবো। শেষে সিদ্ধান্ত হয়, এ ব্যাপারে ভাগ্যপরীক্ষা করা হবে। এতে যার নাম আসবে, তিনিই হবেন মারিয়াম ‘আলাইহাস সালামের তত্ত্বাবধায়ক। সেমতে তারা সকলে জর্ডান নদীর তীরে গিয়ে ভাগ্যপরীক্ষা শুরু করলেন। ভাগ্যপরীক্ষার পদ্ধতি সাব্যস্ত হল, এতে

TOP

যারা অংশগ্রহণ করবেন, তারা সকলে নিজ নিজ কলম নদীতে নিক্ষেপ করবেন। প্রবহমান পানিতে যার কলম ভেসে থাকবে, তিনিই হবেন মারিয়ামের তত্ত্বাবধায়ক। কথামতো সকলেই নিজ নিজ কলম নদীতে নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালামের কলম ব্যতীত সবার কলম পানিতে ডুবে গেল। ফলে যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালাম মারিয়াম ‘আলাইহাস সালামের তত্ত্বাবধায়ক সাব্যস্ত হলেন। (তাফসীরে ইবনে কাসির, ২:৪৭)

বস্তুত ইমরান-কন্যার সৌভাগ্যই বলতে হয় যে, আল্লাহ তা‘আলা যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালামকে তার তত্ত্বাবধানে নিয়োগ করেন। এতে মারিয়াম ‘আলাইহাস সালামের জন্য তাঁর থেকে কল্যাণ ও জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ তৈরি হয় এবং সুন্দর চরিত্র-মাধুর্য ও আমল-আখলাক শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। তাছাড়া যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালাম ছিলেন মারিয়াম ‘আলাইহাস সালামের খালুজান। স্বভাবতই তিনি তার প্রতি স্নেহভাজন ছিলেন।

ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালাম ও ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম এর পারস্পরিক সম্পর্ক

হযরত যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালামের সাথে হযরত মারিয়াম ‘আলাইহাস সালামের আত্মীয়তার সম্পর্কের এ সূত্র ধরেই মারিয়াম ‘আলাইহাস সালামের ছেলে ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম ও যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালামের ছেলে ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালামকে হাদীস শরীফে পরস্পর খালাতো ভাই বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, হযরত মালেক বিন আনাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে রাতে ঊর্ধ্বাকাশে ভ্রমণ করানো হয়েছিল, সে রাত সম্বন্ধে তিনি সাহাবীদের নিকট বিস্তারিত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, জিবরাইল ‘আলাইহিস সালাম আমাকে নিয়ে উপরে আরোহণ করলেন এবং দ্বিতীয় আকাশে পৌঁছে জিবরাইল ‘আলাইহিস সালাম দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হল, কে?

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

বললেন, জিবরাইল। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার সাথে কে? বললেন, মুহাম্মদ। আবার জিজ্ঞেস করা হল, তাকে কি আহ্বান করা হয়েছে? বললেন, হ্যাঁ। এসব সওয়াল-জবাব শেষ হওয়ার পর দরজা খুলে দেওয়া হলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন সেখানে ইয়াহইয়া এবং 'ঈসা আলাইহিমাস সালামকে দেখতে পান। তাঁরা পরস্পর খালাতো ভাই। জিবরাইল 'আলাইহিস সালাম বললেন, এঁরা হলেন ইয়াহইয়া ও 'ঈসা 'আলাইহিস সালাম। তাদের সালাম দিন। আমি সালাম দিলাম। তারা সালামের উত্তর দিলেন। অতঃপর বললেন, ধন্যবাদ হিতৈশী ভ্রাতা ও যোগ্যতম নবীকে। (বুখারী শরীফ, ২:১৬১, হাদীস: ৩৪৩০। باب قول الله تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا)

কুরআনে যাকারিয়া 'আলাইহিস সালামের আলোচনা

আল্লাহ তা'আলা সূরা মারিয়ামে হযরত যাকারিয়া 'আলাইহিস সালামের আলোচনা প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন,

ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِيَّا ○ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا ○ قَالَ رَبِّ اِنِّىْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّىْ وَ اشْتَعَلَ الرَّاْسُ شَيْبًا وَّ لَمْ اَكُنْۢ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا ○ وَ اِنِّىْ خِفْتُ الْمَوَالِىَ مِنْ وَّرَآءِىْ وَكَانَتِ امْرَاَتِىْ عَاقِرًا فَهَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ○ يَّرِثُنِىْ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ ۖ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ○ يٰزَكَرِيَّآ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمِ ۨ اسْمُهٗ يَحْيٰى ۙ لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ○ قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ وَّكَانَتِ امْرَاَتِىْ عَاقِرًا وَّ قَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ○ قَالَ كَذٰلِكَ ۚ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ وَّ قَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْـًٔا ○ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّىْٓ اٰيَةً ؕ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ○ فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحٰٓى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّ عَشِيًّا○

এটা আপনার প্রতিপালক কর্তৃক তার বান্দা যাকারিয়ার 'আলাইহিস সালামের প্রতি অনুগ্রহের বিবরণ। যখন তিনি তার প্রতিপালকের নিকট দু'আ করেছিলেন নিভৃতে; তিনি বলেছিলেন, হে আমার রব, আমার অস্থি দুর্বল হয়ে গেছে। বার্ধক্যে আমার মস্তক শুভ্রোজ্জ্বল হয়ে গেছে। হে আমার প্রতিপালক, আপনার নিকট দু'আ করে আমি

TOP

কখনো ব্যর্থ হইনি। আমার পর আমার স্বগোত্রীয়দের সম্বন্ধে আমি আশঙ্কা করছি। আর আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। সুতরাং আপনি নিজের পক্ষ হতে আমাকে দান করুন উত্তরাধিকারী, যে আমার উত্তরাধিকারিত্ব করবে এবং উত্তরাধিকারিত্ব করবে ইয়াকুবের বংশের। আর হে আমার প্রতিপালক, তাকে করুন সন্তোষভাজন।

(আল্লাহ তা'আলা বললেন,) হে যাকারিয়া, আমি আপনাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি, যার নাম হবে 'ইয়াহইয়া'। এই নামে পূর্বে আমি কারো নামকরণ করিনি। তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক, আমার পুত্র হবে কেমন করে, যখন আমার স্ত্রী বন্ধ্যা এবং আমি বার্ধক্যের শেষ সীমায় উপনীত? তিনি বললেন, এভাবেই হবে। আপনার প্রতিপালক বলছেন, এটা আমার জন্য সহজ। আমি তো ইতোপূর্বে আপনাকে সৃষ্টি করেছি যখন আপনি কিছুই ছিলেন না। যাকারিয়া 'আলাইহিস সালাম বললেন, হে আমার প্রতিপালক, আমাকে একটি নিদর্শন দিন। তিনি বললেন, আপনার নিদর্শন হল আপনি (সুস্থ থাকা সত্ত্বেও) তিনদিন কারো সাথে বাক্যালাপ করতে সক্ষম হবেন না।

অতঃপর তিনি কক্ষ হতে বের হয়ে তার সম্প্রদায়ের নিকট এলেন এবং ইঙ্গিতে তাদের সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে বললেন। (সূরা মারয়াম, আয়াত: ২-১১)

হযরত যাকারিয়া 'আলাইহিস সালাম সন্তান লাভের আশায় নিজের বার্ধক্য ও বাহ্যিক-অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা প্রকাশ করে আল্লাহর কাছে সন্তান লাভের জন্য প্রার্থনা করেন। অতঃপর বলেন, আপনার কাছে আমি যতবারই প্রার্থনা করেছি, সব প্রার্থনাই আপনি কবুল করেছেন। আপনার কাছে আমি যা চেয়েছি, সে ব্যাপারে আমাকে নিরাশ করেননি।

সন্তান কামনায় যাকারিয়া 'আলাইহিস সালামের দু'আর আরেকটি বিবরণ সূরা আল ইমরানেও বিবৃত হয়েছে। উক্ত দু'আয় তিনি বলেন,

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءِ

‘হে আমার প্রতিপালক, আপনার পক্ষ থেকে আমাকে সুসন্তান দান করুন। নিশ্চয় আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী।’ (সূরা আল- ইমরান, আয়াত: ৩৮)

যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালাম এই প্রার্থনা নির্জনে করতেন। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا

যখন তিনি তার রব-পরওয়ারদিগারকে ডাকলেন চুপিসারে। (সূরা মারয়াম, আয়াত: ৩)

নির্জনে এই প্রার্থনা করার কারণ সম্পর্কে কোন কোন মুফাসসির বলেন, তিনি সংগোপনে এই প্রার্থনা করতেন, যাতে করে বৃদ্ধ বয়সে সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষাকে কেউ নির্বুদ্ধিতা বলে আখ্যা না দেয়। কেউ কেউ বলেন, নির্জনে প্রার্থনা করার কারণ হলো, নির্জনে প্রার্থনা আল্লাহ তা‘আলা বেশি পছন্দ করেন। যেমন, উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত কাতাদা রহ. বলেন, আল্লাহ তা‘আলা হৃদয়ের কথা জানেন এবং সুপ্ত ধ্বনি শোনতে পান।

আল্লাহ তা‘আলা যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালামের প্রার্থনা কবুল করলেন এবং ফেরেশতাগণের মাধ্যমে সন্তান লাভের সুসংবাদ পাঠালেন। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালাম যখন আপন কক্ষে নামাযে দণ্ডায়মান ছিলেন, তখন ফেরেশতাগণ তাঁকে সম্বোধন করে বললেন, আল্লাহ আপনাকে ইয়াহইয়া-এর জন্মের সুসংবাদ দিচ্ছেন, যিনি হবেন আল্লাহর প্রেরিত কালেমার সত্যায়নকারী, সরদার, সংযমশীল ও পুণ্যবান নবী। তখন যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালাম সবিস্ময়ে বললেন, হে আমার প্রতিপালক, আমার পুত্র হবে কীভাবে, আমার তো বার্ধক্য এসে গেছে এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা! আল্লাহ তা‘আলা বললেন, এভাবেই আল্লাহ করেন, যা তার ইচ্ছা হয়। তিনি বললেন, হে আমার

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

প্রতিপালক, আমাকে একটি নিদর্শন দান করুন। আল্লাহ বললেন, আপনার নিদর্শন হল, তিনদিন আপনি ইঙ্গিত ছাড়া মানুষের সাথে কথা বলতে পারবেন না। (অর্থাৎ ঐ তিনদিন শুধু ইশারা-ইঙ্গিতে কথা বলবেন, মুখে কথা বলতে সক্ষম হবেন না।) আর আপনার প্রতিপালককে অধিকহারে স্মরণ করুন এবং সকাল-সন্ধ্যা তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন।' (সূরা আল- ইমরান, আয়াত: ৩৯-৪১)

দীন প্রচারে আল্লাহর নিকট সন্তান কামনা

হযরত যাকারিয়া 'আলাইহিস সালাম স্বগোত্রীয়দের ব্যাপারে শঙ্কা ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি ভয় পেয়েছিলেন, তার মৃত্যুর পর তারা পাপ-পংকিলতায় জড়িয়ে পড়বে। ফলে আল্লাহর কাছে সন্তান লাভের জন্য প্রার্থনা করলেন, যেন তার ওফাতের পর সেই সন্তান নবী হয়ে নবুওয়্যাতের মাধ্যমে তাদের পরিচালিত করতে পারেন। আল্লাহ তা'আলা তার মনের বাসনা পূরণ করলেন।

যাকারিয়া 'আলাইহিস সালাম এজন্য শঙ্কা করেননি যে, তার মৃত্যুর পর তারা তার ত্যাজ্য সম্পদের মালিক হয়ে যাবে। কারণ, প্রথমতঃ নবীগণের সম্পদে কোন ওয়ারিস নাই। তারা যা রেখে যান, তা সদকারূপে গণ্য হয়। এ প্রসঙ্গে বুখারী ও মুসলিম শরীফে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমরা নবীগণ যা-কিছু রেখে যাই, তার কোন উত্তরাধিকারী হয় না। বরং তা সদকার মধ্যে গণ্য হয়। (বুখারী, ফরযুল খুমুস অধ্যায়)

দ্বিতীয়তঃ নবীগণ এ ধরনের পার্থিব ব্যাপার হতে অনেক উর্ধ্বে যে, তারা সম্পদের ভালোবাসায় এতটা মোহগ্রস্ত থাকবেন যে, নিজের মৃত্যুর পর স্বগোত্রীয় লোকদের দ্বারা তাঁর সম্পদের উত্তরাধিকারী হওয়াকে পরশ্রীকাতরতার চোখে দেখবেন এবং সন্তান লাভের জন্য প্রার্থনা করবেন, যাতে সে তার রেখে যাওয়া সম্পদের মালিক হয়। তা ছাড়া স্বাভাবিকভাবেও তাঁর এ পরিমাণ সম্পদ ছিলনা, যে সম্পদের উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য তাঁর গোত্রের লোকেরা লালসা

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

করবেন। কারণ, তিনি নিজ হাতে কাঠের কাজ করে জীবিকানির্বাহ করতেন। এ কাজ করে কতটুকুই বা সম্পদ জমা করা যায়!

সুতরাং আয়াতে বর্ণিত উত্তরাধিকারী হওয়ার অর্থ হবে, তার মৃত্যুর পর নবুওয়্যাতের ক্ষেত্রে তাঁর উত্তরাধিকারী হওয়া। পরবর্তী বাক্য "এবং ইয়াকুব বংশধরের উত্তরাধিকারী হবে" এ কথাটিও উপর্যুক্ত অর্থেরই সমর্থন করে। নবীদের উত্তরাধিকারী হওয়ার বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُوْدَ

অর্থঃ সুলাইমান 'আলাইহিস সালাম দাউদ 'আলাইহিস সালামের উত্তরাধিকারী হলেন।

অর্থাৎ নবুওয়্যাতের ক্ষেত্রে তার স্থলাভিষিক্ত হলেন। অন্যথায় যদি এখানে সম্পদের উত্তরাধিকারের কথা বলা হত, তবে তাঁর ভাইদের বাদ দিয়ে বিশেষভাবে শুধু তাঁর কথা উল্লেখ করা হত না। কারণ, সব ধর্ম ও শরী'আতের স্বতঃসিদ্ধ বিষয় হল, স্বাভাবিকভাবেই সন্তান তার বাবার সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়। আলোচ্য আয়াতে যেহেতু নবুওয়্যাত প্রাপ্তির বিশেষ উত্তরাধিকারের কথা বুঝানো হয়েছে, সেজন্যই এ ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। মুজাহিদ রহ. উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তাঁর উত্তরাধিকার ছিল ইলমকেন্দ্রিক। তেমনি কাতাদা রহ. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা যাকারিয়া 'আলাইহিস সালামের উপর দয়া করুন, তাঁর মাল-সম্পদের কোন উত্তরাধিকারী ছিল না। (তাফসীরে আব্দুর রাযযাক; ২: ৫/১৭৩৪)

বন্ধ্যা স্ত্রীর গর্ভে সন্তানধারণ

হযরত যাকারিয়া 'আলাইহিস সালাম স্বীয় স্ত্রীর বন্ধ্যা হওয়ার কথা উল্লেখ করে সন্তান লাভের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার খাস কুদরতী করুণা কামনা করেছেন। এতে প্রমাণিত হয়, যাকারিয়া 'আলাইহিস সালামের স্ত্রী শুরু বয়সে বন্ধ্যা ছিলেন। এ কারণে তাঁর কোন সন্তানাদি

হত না। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালামের দু‘আ কবুল করে তাঁর স্ত্রীকে সন্তান ধারণের যোগ্যতা দান করলেন।

এ বিষয়ে সূরা আম্বিয়ায় আল্লাহ তা‘আলা বলেন, “স্মরণ করুন যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালামের কথা, যখন তিনি তার প্রতিপালকের নিকট দু‘আ করে বলেছিলেন, হে আমার প্রতিপালক, আমাকে একা রাখবেন না। আপনি তো উত্তম ওয়ারিশ দানকারী। আমি তাঁর দু‘আ কবুল করলাম এবং তাঁকে দান করলাম ইয়াহইয়াকে। আর তাঁর জন্য তাঁর স্ত্রীকে যোগ্যতাসম্পন্ন করেছিলাম। তারা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করতেন। তারা আমাকে ডাকতেন আশা ও ভয়ের সাথে এবং তারা ছিলেন আমার প্রতি বিনীত। (সূরা আম্বিয়া আয়াত: ৮৯-৯০)

আবদুল্লাহ বিন হাকিম রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবুবকর রা. একবার আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন। হামদ ও সালাত পাঠ করার পর তিনি বললেন, আল্লাহকে ভয় করার ব্যাপারে আপনাদের উপদেশ দিচ্ছি। আপনারা আল্লাহ তা‘আলার যথাযথ প্রশংসা করুন ভয়ের সাথে আগ্রহকে সংযোগ করে এবং যাঞ্চার সাথে আগ্রহ-মিনতিকে একত্র করে। কারণ, আল্লাহ তা‘আলা যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালাম ও তার পরিবার-পরিজনের প্রশংসা করেছেন এবং বলেছেন, তারা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করতেন, তারা আমাকে ডাকতেন আশা ও ভয়ের সাথে এবং তারা ছিলেন আমার নিকট বিনীত। (তাফসীরে ইবনে কাসীর; ৫/৩৮১)

আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. বলেন, আল্লাহ তা‘আলা যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালামের স্ত্রীকে যোগ্যতাসম্পন্ন করেছিলেন- এর ব্যাখ্যা হল, আগে তার ঋতুস্রাব হতো না। যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালামের প্রার্থনার পর তার ঋতুস্রাব শুরু হয়। যার ফলে তিনি সন্তান জন্মদানের যোগ্যতা লাভ করেন। (আল বিদায়া; ২/৫২)

ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালামের জন্মলাভ

হযরত যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালামের দু‘আর ফসলরূপে হযরত ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালাম ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের জন্মের কিছুদিন পূর্বে বর্তমান ফিলিস্তিনে জন্মগ্রহণ করেন। তখন যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালামের বয়স হয়েছিল ১২০ বছর।

ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালাম ২৮ খ্রিস্টাব্দে নবুওয়্যাত লাভ করেন। আর ৩১ খ্রিস্টাব্দে দামেশক শহরে ইহুদীদের হাতে শহীদ হন।

পবিত্র কুরআনের চারটি সূরায় মোট পাঁচবার ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালামের আলোচনা এসেছে। সূরা মারিয়ামে আল্লাহ তা‘আলা ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালামের আলোচনা করতে গিয়ে ইরশাদ করেন,

يٰيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ ؕ وَاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ○ وَّحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكٰوةً ؕ وَكَانَ تَقِيًّا ○ وَّ بَرًّۢا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ○ وَسَلٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَ يَوْمَ يَمُوْتُ وَ يَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ○

অর্থঃ হে ইয়াহইয়া, কিতাবটি দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ করুন। আমি তাঁকে শৈশবেই দান করেছিলাম জ্ঞান এবং আমার নিকট হতে হৃদয়ের কোমলতা ও পবিত্রতা। তিনি ছিলেন মুত্তাকী, পিতা-মাতার অনুগত এবং তিনি ছিলেন না উদ্ধত ও অবাধ্য। তার প্রতি শান্তি, যেদিন তিনি জন্ম লাভ করেছেন, যেদিন তার মৃত্যু হবে এবং যেদিন তিনি জীবিত অবস্থায় উত্থিত হবেন। (সূরা মারয়াম; আয়াত: ১২-১৫)

আল্লাহ তা‘আলা শৈশবেই তাকে জ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং তাওরাত কিতাব ও শরী‘আতের জ্ঞানের অধিকারী করেছিলেন। সাথে সাথে দান করেছিলেন ভালো কাজের রীতি-নীতি সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وآتيناه الحكم صبيا

অর্থ: আর আমি তাকে শৈশবেই জ্ঞানবত্তা দান করেছিলাম।

উল্লেখ্য, "শৈশবেই জ্ঞানবত্তা" দানের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কেউ কেউ মনে করে থাকেন যে, ইয়াহইয়া আ. কে শৈশবেই নবুওয়্যাত দান করা হয়েছিল। এ ব্যাখ্যাটি সঠিক নয়। হাফেয ইবনে কাসীর রহ. এখানে 'জ্ঞানবত্তা'র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন,

اٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا أى: الفهم والعلم والجد والعزم، والإقبال على الخير، والإكباب عليه، والاجتهاد فيه وهو صغير حدث [السن]

অর্থ: আয়াতে 'জ্ঞানবত্তা' দ্বারা (নবুওয়্যাত উদ্দেশ্য নয়; বরং) উদ্দেশ্য হল, (সাধারণ) প্রজ্ঞা, জ্ঞান, বুঝ ও ভালো কাজের পথ ও পদ্ধতি সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি, যা আল্লাহ তা'আলা তাঁকে শৈশবেই দান করেছিলেন। (তাফসীরে ইবনে কাসীর; সূরা মারয়াম; ১২)

মাওলানা হিফযুর রহমান সিওহারবী রহ. তার (কাসাসুল কুরআন ২/৬২২) গ্রন্থে 'জ্ঞানবত্তা' দ্বারা 'নবুওয়্যাত' উদ্দেশ্য না হওয়ার কথা জোরালোভাবে উপস্থাপন করেছেন।

মুসনাদে আহমাদের এক বর্ণনায় হযরত ইয়াহইয়া আ. কর্তৃক আল্লাহর নির্দেশে বনী ইসরাইলকে বাইতুল মুকাদ্দাসে সমবেত করে দাওয়াত প্রদান করার আলোচনা এসেছে। (হাদীস নং- ১৭১৭০)

আল্লাহ তা'আলা ইয়াহইয়া 'আলাইহিস সালামের উত্তম গুণাবলী আলোচনা করার পর বলেন, তাঁর প্রতি শান্তি, যেদিন তিনি জন্মলাভ করেছেন, যেদিন তাঁর মৃত্যু হবে এবং যেদিন তিনি জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হবেন। এ প্রসঙ্গে সুফিয়ান বিন উওয়াইনা রহ. বলেন, তিন ক্ষেত্রে মানুষ সবচেয়ে বেশি নিঃসঙ্গতা অনুভব করে।

১. যেদিন সে ভূমিষ্ঠ হয়। এ সময়ে সে নতুন পৃথিবীতে এসে একাকিত্ব অনুভব করে।

২. যেদিন তার মৃত্যু হয়, সেদিন সে এমন কিছু লোককে দেখে, যাদের সে জীবনে কোনদিন দেখেনি।

৩. যেদিন সে পুনরুত্থিত হবে, সেদিন সে অসংখ্য মানুষের সমাবেশে নিজেকে দেখে একাকিত্ববোধ করবে।

আল্লাহ তা'আলা এ সকল দিনে ইয়াহইয়া 'আলাইহিস সালামের প্রতি অনুগ্রহ করার ঘোষণা দিয়েছেন। (তাফসীরে ইবনে কাসীর; ৫/২২৪- ২২৫)

ইয়াহইয়া 'আলাইহিস সালামের বিশেষত্ব

ইয়াহইয়া (يحيى) শব্দের উৎপত্তি হায়াত (حياة) শব্দ থেকে, যার অর্থ জীবন। তাকে 'ইয়াহইয়া' নামকরণের কারণ হলো, আল্লাহ তার মাধ্যমে জীবন দান করবেন। (কুরতুবী: ৪/৭৭)

এই আয়াতে হযরত ইয়াহইয়া 'আলাইহিস সালামের চারটি বিশেষ গুণের কথা বলা হয়েছে।

তন্মধ্যে প্রথম গুণ হচ্ছে, তিনি আল্লাহর প্রেরিত কালেমার সত্যায়নকারী হবেন। হযরত হাসান বসরী রহ., কাতাদা রহ. প্রমুখ তাবেয়ী বলেন, এখানে 'আল্লাহর প্রেরিত কালেমা' দ্বারা উদ্দেশ্য হলেন, হযরত 'ঈসা 'আলাইহিস সালাম। অর্থাৎ ইয়াহইয়া 'আলাইহিস সালাম হযরত 'ঈসা 'আলাইহিস সালামের নবুওয়্যাতের সত্যায়নকারী হবেন। হযরত রবি ইবনে আনাস রহ. বলেন, হযরত ইয়াহইয়া 'আলাইহিস সালাম সর্বপ্রথম 'ঈসা 'আলাইহিস সালামকে নবী হিসেবে সমর্থন করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর ব্যাখ্যায় বলেন, ইয়াহইয়া 'আলাইহিস সালাম ও 'ঈসা 'আলাইহিস সালাম পরস্পরে খালাতো ভাই ছিলেন। ইয়াহইয়া 'আলাইহিস সালামের আম্মা মারিয়াম 'আলাইহাস সালামকে বলতেন, আমার অনুভূত হচ্ছে, আমার উদরস্থ সত্তাটি তোমার উদরস্থ সত্তাটিকে সিজদা করছে। এর দ্বারা বুঝা যায়, ইয়াহইয়া 'আলাইহিস সালাম কর্তৃক 'ঈসা 'আলাইহিস সালামের নবুওয়্যাতের সত্যায়নকারী হওয়ার বিষয়টি এভাবে হয়েছে যে, তিনি আপন মাতৃগর্ভ থেকেই 'ঈসা 'আলাইহিস সালামকে নবী

TOP

হিসেবে সত্যায়ন করেছেন, যদিও তখন 'ঈসা 'আলাইহিস সালামের জন্মই হয়নি। কারণ, ইয়াহইয়া 'আলাইহিস সালাম বয়সে 'ঈসা 'আলাইহিস সালামের চেয়ে বড় ছিলেন।

গর্ভের শিশুর সিজদাপ্রদান

তৎকালীন শরী'আতে সালাম দেওয়ার রীতি হিসেবে সিজদা করার বিধান ছিল। যেমন, ইউসুফ 'আলাইহিস সালামকে তার বাবা-মা ও ভাইয়েরা সিজদা করেছিলেন। তেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা আদম 'আলাইহিস সালামকে সিজদা করার জন্য ফেরেশতাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ রীতি আমাদের শরী'আতে বৈধ নয়। আমাদের শরী'আতে সিজদা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য খাস।

শায়েখ আহমদ শাকের রহ. বলেন, মাতৃগর্ভে থেকে ইয়াহইয়া 'আলাইহিস সালাম কর্তৃক 'ঈসা 'আলাইহিস সালামকে সিজদা করার অর্থ হল, শ্রদ্ধাশীল সমর্থনকারীরূপে তিনি তার সামনে অবনমিত হয়েছেন।

মালেক বিন আনাস রহ. এ সিজদা করার ঘটনাটি বর্ণনা করে বলেন, এতে করে ইয়াহইয়া 'আলাইহিস সালামের উপর 'ঈসা 'আলাইহিস সালামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়।

হযরত ইয়াহইয়া 'আলাইহিস সালামের দ্বিতীয় গুণ বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি সরদার হবেন। হযরত সায়িদ ইবনুল মুসাইয়িব রহ. বলেন, এর অর্থ হল, তিনি আলেম ও ফকীহ হবেন।

ইয়াহইয়া 'আলাইহিস সালামের তৃতীয় গুণ বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি সংযমী হবেন। ইবনে কাসীর রহ. 'আশ-শিফা' গ্রন্থ থেকে কাজী ইয়াজ রহ. এর এ বক্তব্য উল্লেখ করেছেন, "জেনে রাখা আবশ্যক, ইয়াহইয়া 'আলাইহিস সালামের প্রশংসায় আল্লাহ তা'আলা 'সংযমী হবেন' বলে যে গুণ উল্লেখ করেছেন, কেউ এর অর্থ করেছেন স্বভাব ভীতু। কেউ করেছেন পৌরুষহীন। বস্তুত এর অর্থ এমনটি নয়। কারণ,

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

প্রবীণ মুফাসসির আলেমগণ এ অর্থ গ্রহণ করেননি। তারা বলেন, পৌরুষহীনতা ও স্বভাবভীরুতা হল খুঁত ও ত্রুটিবাচক শব্দ, যা নবীদের ক্ষেত্রে বেমানান। মূলত এর অর্থ হল, তিনি নিষ্কলুষ ও পঙ্কিলতামুক্ত হবেন। তিনি এসব হতে নিজেকে সম্পূর্ণ গুটিয়ে নিবেন। কেউ এর অর্থ করেছেন, তিনি কুপ্রবৃত্তি হতে নিজেকে সংযত রাখবেন। কেউ বলেছেন, তার কোন রকমের নারী আসক্তি হবে না। এতে প্রমাণিত হয়, বিবাহে অক্ষম হওয়ার বিষয়টি শারীরিক অসম্পূর্ণতার পরিচায়ক আর বিবাহে সক্ষম হয়েও পৌরুষকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলে সেটা কামালাতের প্রমাণ বহন করে।”

কাজী ইয়াজের আলোচনা শেষে আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. বলেন, ‘সংযমী ও নারীদের প্রতি বিরাগী হবেন’ বলে ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালামের বিশেষ গুণ বর্ণনা করা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, তিনি নারীর সংস্পর্শে সক্ষম হবেন না। বরং এর অর্থ হলো, তিনি অশ্লীলতা ও পংকিলতা হতে নিরাপদ থাকবেন। আর এটা বিবাহ-সংসার ও সন্তান জন্মদানের অন্তরায় নয়।

বলাবাহুল্য, যে ব্যক্তি বিবাহ করতে এবং বিবাহসংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয় এবং তা আল্লাহ তা‘আলার বিধান পালনে বাধার কারণ না হয়, তার জন্য বিবাহ ও সংসার যাপন বড় মর্যাদার বিষয়। এটাই আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকা। বিবাহ তাঁর জীবনে মহান প্রতিপালকের ইবাদত পালনে অন্তরায় হতে পারেনি। বরং এতে তাঁর ইবাদত-বন্দেগী উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি স্ত্রীদের সতীত্ব রক্ষা করেছেন, তাদের অধিকার আদায় করেছেন, তাদের জন্য উপার্জন করেছেন, আর বিশেষত তাদের ধর্মীয় পথনির্দেশনা দান করেছেন। সুতরাং বিবাহ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত ও আদর্শ। এসম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘বিবাহ করা আমার সুন্নত।’ (স্বীয় সুন্নাত সম্পর্কে

TOP

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরেক বর্ণনায় বলেছেন,) যে আমার সুন্নত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, সে আমার উম্মত নয়।’

যদিও বিবাহ করাটা সাধারণ মানুষের নিকট পার্থিব বিষয় বলে বিবেচিত, কিন্তু নবীজি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত মোতাবেক সংসারজীবন নিছক পার্থিব কোন বিষয় নয়, সংসারজীবন দীনের চাহিদা পূরণেরই অংশ। বিবাহ ও সংসারজীবনের সাথে সংযমের কোন বিরোধ নেই। তাই এক্ষেত্রে বিবাহের সাথেই সংযম অবলম্বন জরুরী।

সুতরাং ইসলামের চাহিদা হল, সংসারবিহীন বৈরাগী হয়ে থাকবে না। বরং বিবাহ ও ঘর-সংসার করার সাথে সাথে নিজেকে যাবতীয় পঙ্কিলতা ও নাজায়েয কর্ম থেকে বিরত রাখবে। আর আল্লাহ তা‘আলার ইবাদত-বন্দেগীতে নিজেকে যথাযথভাবে নিয়োজিত রাখবে।

হযরত ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালামের চতুর্থ গুণ বলা হয়েছে, ‘তিনি পুণ্যবান নবী হবেন।’ বস্তুত সকল নবীই পুণ্যবান ছিলেন। তাঁরা ছিলেন সম্পূর্ণ মাসুম বা নিষ্পাপ। তারাই সর্বপ্রথম ও পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর দীন পালনকারী। আর নবুওয়্যাতের বিষয়টি যেহেতু আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষভাবে মনোনয়নের বিষয়। তাই নবীগণ দুনিয়াতে জন্মই গ্রহণ করেন নবী হওয়ার মহান গুণ নিয়ে। কিন্তু পৃথীবির মানুষ তা জানতে পারে নবুওয়্যাত প্রাপ্তির পর।

হযরত ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালামের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছিল, আল্লাহ তা‘আলা হযরত যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালামকে তাঁর সন্তান জন্মের পূর্বে, এমনকি মায়ের গর্ভে আসার পূর্বেই সন্তানের নাম ইয়াহইয়া হওয়া এবং তাঁর নবী হওয়ার ব্যাপারে সুসংবাদ জানিয়ে দিয়েছিলেন। এটাই ছিলো হযরত ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালামের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য।

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

ইয়াহইয়া 'আলাইহিস সালামের আল্লাহভীতি

হযরত হারিস আশআরী রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলা ইয়াহইয়া 'আলাইহিস সালামকে পাঁচটি বাক্যের উপর আমল করতে বলেছেন এবং বনী ইসরাইলকে আমল করার জন্য নির্দেশ দিতে বলেছেন। এ ব্যাপারে ইয়াহইয়া 'আলাইহিস সালামের বিলম্ব হওয়ার উপক্রম হয়েছিলো। তখন 'ঈসা 'আলাইহিস সালাম তাকে বললেন, আপনাকে তো নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, পাঁচটি বিষয়ের উপর আপনি নিজে আমল করবেন এবং বনী ইসরাইলকে আমল করার নির্দেশ দিবেন। হয় ব্যাপারটি আপনি বনী ইসরাইলকে জানান নতুবা আমি জানিয়ে দিই। ইয়াহইয়া 'আলাইহিস সালাম বললেন, আপনি যদি এক্ষেত্রে আমার চেয়ে অগ্রগামী হন, তবে আমার আশঙ্কা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে শাস্তি দিবেন অথবা মাটির নিচে ধসিয়ে দিবেন। এরপর ইয়াহইয়া 'আলাইহিস সালাম বনী ইসরাইলকে বায়তুল মুকাদ্দাসে একত্র করলেন। ফলে মসজিদটি কানায় কানায় ভরে গেল।

তখন ইয়াহইয়া 'আলাইহিস সালাম মিম্বরে গিয়ে বসলেন এবং আল্লাহ তা'আলার গুণ-প্রশংসা করে বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে পাঁচটি বিষয়ে আমল করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং আপনাদের আমল করার জন্য নির্দেশ দিতে বলেছেন।

১. আপনারা আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করুন এবং তার সাথে কাউকে শরীক করবেন না। কারণ, আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করে তার সাথে কোন কিছু শরীক করার উপমা ঐ ব্যক্তির মতো, যে নিরেট স্বর্ণ অথবা রৌপ্যমুদ্রা দ্বারা একটা দাস ক্রয় করল আর এই দাস কাজ করে যা উপার্জন করে, তা নিজের মনিবকে না দিয়ে অন্য কাউকে দিয়ে দেয়। আপনাদের কেউ কি চান তার দাস এমন হোক? নিশ্চয় চান না। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আপনাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই আপনাদের

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

আহার যোগান; সুতরাং তাঁর ইবাদত করুন এবং তার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবেন না।

২. আমি আপনাদের নামাযের নির্দেশ দিচ্ছি। আর তা মনযোগ দিয়ে পড়ার জন্য বলছি। কারণ, আল্লাহ তা'আলা তার নামাযরত বান্দার প্রতি মনোযোগী হন, যতক্ষণ সে নামায থেকে অন্যদিকে অমনোযোগী না হয়। সুতরাং যখন আপনারা নামায পড়বেন, তখন অমনোযোগী হবেন না।

৩. আমি আপনাদের রোযার নির্দেশ দিচ্ছি। কারণ, এর উদাহরণ হলো, একব্যক্তি এক জনসমাগমের মাঝে রয়েছে। তার কাছে মিশক আম্বরের একটি থলে আছে। আশপাশের সকলেই সেই মিশকের ঘ্রাণ পাচ্ছে। নিশ্চয় রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ তা'আলার নিকট মিশক-আম্বরের ঘ্রাণের চেয়েও বেশি সুগন্ধময়।

৪. আমি আপনাদের দান-সদকার নির্দেশ দিচ্ছি। কারণ, এর উদাহরণ হল ঐ ব্যক্তির মতো, যাকে শত্রুবাহিনী আটক করে নিয়ে গেল এবং তার হাত ঘাড়ের সাথে মিলিয়ে বেঁধে ফেলল। অতঃপর তাকে হত্যা করার জন্য প্রস্তুত হলো। তখন সে বললো, আমি কি আপনাদের হাত থেকে মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়া পেতে পারি? এই প্রস্তাবে তারা রাজি হয়ে গেল। ফলে সে তাদের মুক্তিপণ দিয়ে নিজেকে মুক্ত করে নিল। (অনুরূপ দান-খয়রাত মানুষকে জাহান্নাম ও বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি দেয়)।

৫. আমি আপনাদের বেশি বেশি করে আল্লাহর যিকির করার নির্দেশ দিচ্ছি। কারণ, এর উদাহরণ হল ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যাকে শত্রুবাহিনী পিছু ধাওয়া করেছে আর সে সুদৃঢ় এক কেল্লায় এসে আশ্রয় নিয়েছে। বস্তুত বান্দা শয়তানের ফাঁদ হতে সবচাইতে বেশি নিরাপদ থাকে তখন, যখন সে আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকে।

TOP

Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com App Store

হযরত ইয়াহইয়া 'আলাইহিস সালাম এই বয়ান করে মিম্বর থেকে নেমে পড়লেন।

এই হাদীস বর্ণনার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমিও তোমাদের পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি, যেগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন।

১. মুসলিমদের দলবদ্ধ হয়ে থাকা।
২. দীনের নেতার হুকুম মনযোগ দিয়ে শোনা।
৩. দীনের নেতার হুকুম মানা।
৪. দীনের জন্য হিজরত করা।
৫. আল্লাহর পথে জিহাদ করা।

কারণ, যে ব্যক্তি মুসলিমদের জামা'আত থেকে এক বিঘত পরিমাণও সরে দাঁড়াল (অর্থাৎ ইসলামী আকীদার মধ্যে সামান্য পরিমাণ পরিবর্তন ঘটাল), সে তার গর্দান হতে ইসলামের বেড়ি খুলে ফেললো। তবে যদি সে পুনরায় মুসলিমদের জামাতে ফিরে আসে (অর্থাৎ ঈমান-আকীদা ঠিক করে) তাহলে তার কথা ভিন্ন। আর যে ব্যক্তি জাহেলী যুগের মতো কোন কথার দিকে আহ্বান করে, সে জাহান্নামকে নিজের ঠিকানা বানিয়ে নেয়।

সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহর রাসূল, সে নামায-রোযা আদায় করলেও, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদিও সে নামায-রোযা আদায় করে এবং নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করে।

আর তোমরা মুসলিমদের তাদের নাম ধরে আহ্বান করো, আল্লাহ তা'আলা যে নামে তাদের নামকরণ করেছেন আর সেটা হলো 'আল্লাহর বান্দা'।

যাকারিয়া 'আলাইহিস সালাম ও ইয়াহইয়া 'আলাইহিস সালামের ওফাত

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালামের ওফাতের ব্যাপারে সহীহ সনদে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। সে কারণে তাঁর মৃত্যু স্বাভাবিকভাবে হয়েছিল নাকি তিনি শহীদ হয়েছিলেন, তা দৃঢ়তার সাথে বলা যায় না। আর ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালামের ব্যাপারে সহীহ সনদে শুধু এতটুকু পাওয়া যায় যে অবাধ্য সম্প্রদায় বনী ইসরাইল অন্যান্য অনেক নবীর মত তাকেও শহীদ করে দিয়েছিল। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব রহ. এর বর্ণনা মোতাবেক তিনি বর্তমান সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে শহীদ হন।

হযরত সায়িদ বিন মুসাইয়িব রহ. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, বাদশা বখতেনসর যখন দামেশকে আসেন, তখন সেখানে ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালামের রক্ত টগবগ করতে দেখে লোকদের এর কারণ জিজ্ঞেস করেন। স্থানীয় লোকেরা সব ঘটনা খুলে বলে। ঘটনা শুনে বখতেনসর (পেরিচাদ নেজার) এর বদলা নিতে সত্তরহাজার ইহুদীকে হত্যা করেন। এতে করে সেই রক্তের টগবগে ভাব থেমে যায়। এ বর্ণনা থেকে শুধু এতটুকু বুঝা যায় যে, হযরত ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালামকে বনী ইসরাইল দামেশকে শহীদ করে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু শহীদ হওয়ার বিস্তারিত বিবরণ কোন সহীহ বর্ণনায় পাওয়া যায় না।

যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালাম ও ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালামের শাহাদাতের ব্যাপারে ভিত্তিহীন বর্ণনা

যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালাম ও ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালামের শাহাদাতের ব্যাপারে বিভিন্ন ঘটনা জনমুখে প্রচলিত আছে। যেগুলো আম্বিয়ায়ে কিরামের শানবিরোধী ও বেয়াদবীমূলক। এর মধ্যে কিছু তো একেবারেই সনদবিহীন বানোয়াট, কিছু বর্ণনার সনদ হাদীস বিশারদদের মতে অগ্রহণযোগ্য। আবার কিছু ঘটনা পাওয়া যায় এমন সব ইসরাঈলী রেওয়ায়েতে, যেগুলো ইসলামের মৌলিক রুচির সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ার কারণে পরিত্যাজ্য।

সচেতন পাঠক যেন এসব ভিত্তিহীন ঘটনা বর্ণনা ও বিশ্বাস করা থেকে বিরত থাকতে পারেন সেজন্য এখানে এ সংক্রান্ত একটি দীর্ঘ বর্ণনা

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

উল্লেখ করে তার বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর সূত্রে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে সম্পৃক্ত সে বর্ণনাটির প্রথম অংশে ইয়াহইয়া 'আলাইহিস সালামের শহীদ হওয়ার ঘটনা এবং দ্বিতীয় অংশে যাকারিয়া 'আলাইহিস সালামের শাহাদাতের কথা বলা হয়েছে।

ভিত্তিহীন বর্ণনার প্রথম অংশ: ইয়াহইয়া 'আলাইহিস সালামের শহীদ হওয়া প্রসঙ্গ

মিরাজের রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকারিয়া 'আলাইহিস সালামকে আসমানে দেখতে পেয়ে সালাম দিলেন এবং বললেন, 'হে আবু ইয়াহইয়া, আপনার হত্যাকান্ড সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন, সেটা কীভাবে সংঘটিত হয়েছিল এবং বনী ইসরাইল সম্প্রদায় আপনাকে কেন হত্যা করেছিল?' তখন যাকারিয়া 'আলাইহিস সালাম বললেন, 'হে মুহাম্মদ, আমি আপনাকে সব বলছি, আমার পুত্র ইয়াহইয়া ছিল সে যুগের সবচাইতে ভালো ছেলে এবং অত্যন্ত সুদর্শন যুবক। আর সে ছিল আল্লাহর বাণী, সরদার ও সংযমশীলতার বাস্তব নমুনা। তার ভিতরে কোন নারীর প্রতি কোনরূপ মোহ ছিল না। কিন্তু একসময় বনী ইসরাইলের রাণী তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। রাণী ছিল চরিত্রহীন। সে ইয়াহইয়ার কাছে তার আসক্তির কথা জানিয়ে দূত পাঠায়। আল্লাহ তা'আলা ইয়াহইয়াকে নিরাপদে রাখেন। ফলে সে এই আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে। ফলে রাণী ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়ে ইয়াহইয়াকে হত্যার পরিকল্পনা করে।

বনী ইসরাইলের মাঝে প্রতিবছর একটা উৎসব পালিত হত। সেই উৎসবে সবাই জমা হতো। আর রাজার একটা নীতি ছিল, সে প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতো না এবং মিথ্যা বলতো না।

রাজা উৎসবের দিন উৎসবে যোগদানের জন্য বের হলো। রাণী রাজাকে বিদায় জানানোর জন্য তার সাথে বেরিয়ে এলো। এতে রাজা খুব খুশি হলো। অথচ ইতোপূর্বে রাণী এমনটি করতো না। যখন রাণী

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

রাজাকে বিদায় সম্ভাষণ জানালো, তখন রাজা বললো, আমি তোমার এ কাজে সন্তুষ্ট হলাম। কাজেই তুমি যা চাইবে, আমি তা-ই দেবো। রাণী বললো, আমি যাকারিয়ার পুত্র ইয়াহইয়ার রক্ত চাই। রাজা বললো, তুমি এ ছাড়া অন্যকিছু চাও। রাণী বললো, না, আমি এটাই চাই। রাজা বললো, আচ্ছা, তা-ই তোমাকে দেবো।

তখন রাজা তার বাহিনী পাঠিয়ে দিল ইয়াহইয়াকে হত্যা করার জন্য। ইয়াহইয়া তার কক্ষে নামায আদায় করছিলেন। আমি তার পাশে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করছিলাম। তারা তাকে জবাই করে একটি পাত্রে তার ছিন্ন মস্তক ও রক্ত রাণীর কাছে নিয়ে গেলো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তখন আপনার ধৈর্যের সীমানা কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল? যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালাম বললেন, আমি নামাযে মশগুল ছিলাম। এই অবস্থায় কোনদিকে এতটুকু ফিরে তাকাইনি।

ভিত্তিহীন বর্ণনার দ্বিতীয় অংশ: যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালামের শহীদ হওয়া প্রসঙ্গ

এরপর যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালাম বলেন, এই অন্যায় ও জুলুমের কারণে ঐদিন সন্ধ্যাবেলা আল্লাহ তা‘আলা রাজা, তার পরিবার-পরিজন ও অনুচরবর্গ সবাইকে মাটিতে ধসিয়ে দেন। তখন ভোরবেলা বনী ইসরাইল বললো, যাকারিয়ার প্রভু যাকারিয়ার কারণে ক্রোধান্বিত হয়েছেন। এসো, আমরা আমাদের বাদশার জন্য ক্রোধান্বিত হই। প্রতিশোধ স্বরূপ আমরা যাকারিয়াকে হত্যা করবো। তখন তারা আমাকে হত্যা করার জন্য আমার সন্ধানে বেরিয়ে পড়লো।

এদিকে একজন সংবাদবাহক এসে এই ভীতিকর অবস্থার কথা আমাকে জানালো। আমি বনী ইসরাইলের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য সরে পড়তে লাগলাম। কিন্তু ইবলীস শয়তান তাদের সম্মুখে আমার সন্ধান বলে দিলো। তখন তারা আমার পিছু নিলো।

সেসময় আমার আশঙ্কা হলো, পালিয়ে তাদের চোখের আড়াল হওয়া সম্ভব না। তবু যেতে লাগলাম। তখন হঠাৎ আমার সামনে একটি বৃক্ষ পড়লো। বৃক্ষটি আমাকে ডেকে বললো, 'আমার ভিতরে আসুন। আমার ভিতরে আসুন'। এই বলে বৃক্ষটি আমার জন্য বিদীর্ণ হয়ে গেল। আমি তড়িঘড়ি করে তার ভিতরে ঢুকে পড়লাম।

এদিকে ইবলীস দৌড়ে এসে আমার চাদরের একটা অংশ ধরে ফেললো। তখন বৃক্ষটি সাথে সাথে মিলে গেলো, কিন্তু আমার চাদরের কোনাটি গাছের বাইরে বের হয়ে রইলো।

বনী ইসরাইল গাছটির কাছে এলে শয়তান তাদের বললো, তোমরা কি তাকে দেখোনি? সে তো যাদুবলে এই বৃক্ষের ভিতরে ঢুকে পড়েছে। এই দেখো, তার চাদরের কোনা বের হয়ে আছে।

তারা তা দেখে বললো, গাছটিকে আমরা জ্বালিয়ে দেবো। ইবলীস বললো, আরে, গাছটিকে করাত দিয়ে চিরে ফেলো। শেষে করাত দিয়ে গাছের সাথে আমাকে দ্বিখণ্ডিত করা হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আপনি কি কোন আঘাত বা ব্যথা পাননি? তিনি বললেন, না, বরং গাছটি ব্যথা পেয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আমার প্রাণ তার ভিতরে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিলেন।

এই বর্ণনাটি ইবনে আসাকির রহ. 'তারীখু মাদীনাতি দিমাশক' - এ উল্লেখ করেছেন। এই বর্ণনার সনদে একজন রাবী রয়েছেন, যার নাম ইসহাক বিন বিশর। যাকে মুহাদ্দিসীনে কিরাম

كذاب وضاع এবং متروك

ইত্যাদি শব্দে বিশেষায়িত করেছেন।

আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. উক্ত হাদীসকে নিতান্ত দুর্লভ উপস্থাপনা ও বিরল হাদীস হিসেবে অভিহিত করে বলেছেন, হাদীসটি রাসূলুল্লাহ

TOP

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে নিসবত হওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।

তারীখে দিমাশকে যাকারিয়া 'আলাইহিস সালামের ঘটনাটি ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ ও সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব রহ. থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু সেগুলোর সনদও (বর্ণনাসুত্র) নির্ভর করার মত নয়।

মোটকথা, প্রথম বর্ণনার দিকে লক্ষ করলে ঘটনাদুটো সম্পূর্ণ বানোয়াট। আর ওয়াহহাব ইবনে মুনাব্বিহ ও সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব রহ. এর বর্ণনার দিকে লক্ষ করলে প্রথমত তারা এগুলো বলেছেন কি না, তাই নিশ্চিত নয়। দ্বিতীয়ত এগুলো তাদের বক্তব্য হিসেবে প্রমাণিত হলেও এক্ষেত্রে তাদের উৎস হলো ইসরাঈলী রেওয়ায়েত। আলোচ্য ঘটনায় সে বক্তব্য কুরআন-হাদীসের মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ার কারণে তা গ্রহণযোগ্য নয়।

এ কারণেই ইবনে কাসীর রহ. বলেছেন যে, 'এ বর্ণনায় এমন সব বিষয় রয়েছে যা সর্ববস্থায় পরিত্যাজ্য'।

কখনো কখনো এই কাহিনীকে আরো মারাত্মকভাবে উপস্থাপন করা হয়। বলা হয়, 'আল্লাহর পরিবর্তে গাছের কাছে সাহায্য চাওয়ার কারণে আল্লাহ তা'আলা যাকারিয়া 'আলাইহিস সালামকে এই শাস্তি দিয়েছিলেন'।

দেখুন, একেতো বানোয়াট ও পরিত্যাজ্য একটি ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে। তার উপর আবার সে ঘটনার কারণ খুঁজে বের একজন নবীর উপর তা আরোপ করা হচ্ছে। অথচ এ অংশের অবস্থা আরো বেহাল। কোন ইসরাঈলী রেওয়ায়েতেও একথা খুঁজে পাওয়া যায় না।

নবী-রাসূলগণের শানে এধরনের অভিযোগ আরোপ করা চরম পর্যায়ের ধৃষ্টতা। এ ধরনের আপত্তিকর কথা বিশ্বাস করা, বর্ণনা করা সবকিছু থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালাম ও ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালামের ঘটনা থেকে শিক্ষা

মূলত পবিত্র কুরআনে নবীগণের ঘটনা বর্ণনার মূল উদ্দেশ্য হলো, মানবজাতিকে জরুরী বিষয়াদি শিক্ষাদান করা। যার কারণে হযরত ইউসুফ ‘আলাইহিস সালাম ব্যতীত অন্য কোনো নবী-রাসুলের পূর্ণাঙ্গ ও ধারাবাহিক জীবনী পবিত্র কুরআনে আলোচিত হয়নি। বরং তাদের জীবনের শিক্ষণীয় খণ্ড খণ্ড অংশ বিভিন্ন জায়গায় বিবৃত হয়েছে।

সেই নিরিখে হযরত যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালাম ও ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালামের জীবনের শিক্ষণীয় অংশগুলো কুরআন-হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। এই মহান দুই নবীর জীবনী থেকে আমাদের অর্জন করতে হবে, ইবাদত-মুজাহাদা, কুরিপু দমন ও আত্মশুদ্ধি অর্জনের শিক্ষা। সেই সাথে বাতিলের সামনে মাথা নত না করে আল্লাহ তা‘আলার বিধান পালনের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হবে। এজন্য প্রয়োজনে জীবন বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত থাকতে হবে।

মারিয়াম ‘আলাইহাস সালামের জীবনচরিত

ইতোপূর্বে যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালামের আলোচনায় প্রাসঙ্গিকভাবে মারিয়াম ‘আলাইহাস সালামের জন্মপরবর্তী কিছু ঘটনা এবং তৎসংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা আলোচিত হয়েছে। এখন তাঁর সম্পর্কে অন্যান্য বর্ণনা পেশ করা হচ্ছে। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

اِنَّ اللّٰهَ اصۡطَفٰۤی اٰدَمَ وَنُوۡحًا وَّاٰلَ اِبۡرٰهِیۡمَ وَاٰلَ عِمۡرٰنَ عَلَی الۡعٰلَمِیۡنَ ○ ذُرِّیَّۃًۢ بَعۡضُهَا مِنۡۢ بَعۡضٍ ؕ وَاللّٰهُ سَمِیۡعٌ عَلِیۡمٌ ○

আল্লাহ তা‘আলা আদম ও নূহকে এবং ইবরাহীম ও ইমরানের বংশধরকে বিশ্বজগতে মনোনীত করেছেন। তারা একে অপরের বংশভুক্ত। আল্লাহ তা‘আলা সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম সম্পর্কে খ্রিস্টানদের ভ্রান্ত চিন্তা

আল্লাহ তা'আলা সূরা আল ইমরানের ৮৩টি আয়াত খ্রিস্টানদের ভ্রান্ত বিশ্বাস অপনোদনের জন্য অবতীর্ণ করেছেন। তাদের দাবি ছিল, আল্লাহ তা'আলা সন্তান ধারণ করেছেন এবং 'ঈসা 'আলাইহিস সালাম আল্লাহর পুত্র। অথচ আল্লাহ তা'আলা এসব হতে পবিত্র। 'ঈসা 'আলাইহিস সালাম হলেন আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

একবার নাজরান এলাকা হতে একটি খ্রিস্টান-প্রতিনিধিদল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে সাক্ষাতের জন্য এলো এবং এক পর্যায়ে তারা ত্রিত্ববাদ সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করে দিলো। তারা বললো, আল্লাহ তা'আলা হলেন তিন স্রষ্টা এক। তাদের বিশ্বাসমতে তিন স্রষ্টা হলেন, (১) পবিত্র সত্তা, (২) 'ঈসা 'আলাইহিস সালাম ও (৩) মারিয়াম 'আলাইহাস সালাম। খ্রিস্টান-প্রতিনিধিদলের এই ভ্রান্ত দাবি প্রত্যাখ্যানের নিমিত্তে আল্লাহ তা'আলা সূরা আল ইমরানের শুরুর আয়াতগুলো অবতীর্ণ করেছেন।

এই আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, 'ঈসা 'আলাইহিস সালাম আল্লাহ তা'আলার একজন অনুগত বান্দা ও রাসূল বৈ কিছু নন। তাঁকে তিনি নিজ হুকুমের দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং পিতা ছাড়া মাতৃগর্ভে কুদরতীভাবে তাঁর আকৃতি দান করেছেন। অন্যান্য সৃষ্টিজীবের ক্ষেত্রে যেমনটি হয়ে থাকে তাঁর সৃষ্টি তেমনভাবেই হয়েছে। তবে এখানে শুধু উপায় গ্রহণের ক্ষেত্রে ভিন্নতা হয়েছে।

বাহ্যিক উপায় গ্রহণ ছাড়া মানুষের সৃষ্টি এই প্রথম নয়। মানবজন্মের শুরুই তো হয়েছে এভাবে। হযরত আদম 'আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তা'আলা মাতা ও পিতা ছাড়া সম্পূর্ণ কুদরতীভাবে সৃষ্টি করেছিলেন।

অতএব, বাহ্যিক উপায় গ্রহণ ব্যতিত কেউ জন্ম নিলেই যদি কাউকে আল্লাহর পুত্র বলা যুক্তিসঙ্গত হতো, তবে আদম 'আলাইহিস সালামকে আল্লাহর সন্তান হিসেবে দাবি করা বেশি যৌক্তিক হতো। অথচ ইতোপূর্বে কেউ এমন দাবি তোলেনি। সুতরাং শুধু পিতা ছাড়া

জন্ম নেয়ার কারণে ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামকে আল্লাহর পুত্র দাবি করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

পবিত্র কুরআনের বর্ণনামতেও জন্ম প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে আদম ‘আলাইহিস সালামের সাথে ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের সামঞ্জস্য রয়েছে। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ ؕ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ

আল্লাহ তা‘আলার নিকট ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের দৃষ্টান্ত আদম ‘আলাইহিস সালামের সদৃশ। আল্লাহ তা‘আলা (মা-বাবার অনুষঙ্গ ছাড়াই) মাটি থেকে আদম ‘আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর শুধু বলেছেন, হয়ে যাও, সঙ্গে সঙ্গে তা হয়ে যায়।

পবিত্র কুরআনে অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

وَمَاۤ اَمْرُنَاۤ اِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍۭ بِالْبَصَرِ

আমার আদেশ তো চোখের পলকে একটি কথায় নিষ্পন্ন হয়ে যায়।

বস্তুত আল্লাহ তা‘আলা মানবসৃষ্টির ক্ষেত্রে আমাদের জানামতে এ পর্যন্ত চারটি প্রক্রিয়া অবলম্বন করেছেন। এর মধ্যে একটি তো মা-বাবার যৌথ মিলন প্রক্রিয়া। যেটি সর্বজনবিদিত সাধারণ প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়াটিকে আল্লাহ তা‘আলা মানব ও সকল প্রাণীজগতের জন্য স্বভাবজাত করে দিয়েছেন।

বাকী তিনটি প্রক্রিয়া আল্লাহ তা‘আলার জন্য সহজাত হলেও মানুষের দুর্বল মেধার কাছে সেগুলো অলৌকিক। সেই প্রক্রিয়াগুলো এই,

১. আদম ‘আলাইহিস সালামকে নিছক মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন। এক্ষেত্রে মা-বাবার কোন উপায় ব্যবহার করেননি।

২. হাউওয়া আলাইহাস সালামকে আদম ‘আলাইহিস সালাম হতে সৃষ্টি করেছেন। এক্ষেত্রে মাতৃত্বের কোন উপায় ব্যবহৃত হয়নি।

৩. 'ঈসা 'আলাইহিস সালামকে শুধু মাতৃত্বের উপায় ব্যবহার করে সৃষ্টি করেছেন। এক্ষেত্রে পিতৃত্বের কোন অনুষঙ্গ ব্যবহৃত হয়নি।

মানবসৃষ্টির এই চারটি ধাপ আল্লাহ তা'আলার অসীম শক্তি ও মহান ক্ষমতার প্রমাণ বহন করে।

খ্রিস্টানদের লক্ষ্য করে অবতীর্ণ আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলা মনোনয়নের ক্ষেত্রে প্রথমত হযরত আদম 'আলাইহিস সালাম এবং তার প্রবর্তিত শরী'আতের অনুসারী ও অনুগতদের কথা উল্লেখ করেছেন। এরপর বিশেষভাবে ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের বংশধরদের কথা উল্লেখ করেছেন। হযরত ইসমাঈল 'আলাইহিস সালাম ও ইসহাক 'আলাইহিস সালামের বংশধরও এর আওতাভুক্ত। এরপর পবিত্র এই পরিবারের বর্ধিত অংশের কথা আলোচনা করেছেন, তারা হলেন ইমরান 'আলাইহিস সালামের বংশধর। এই বংশেই হযরত 'ঈসা 'আলাইহিস সালামের মাতা হযরত মারিয়াম 'আলাইহিস সালাম জন্মগ্রহণ করেছেন। এসব আয়াতে 'ঈসা 'আলাইহিস সালামের জননী মারিয়াম 'আলাইহাস সালামের ঈষৎ জন্মবৃত্তান্ত ও কিছু জীবনাচারও তুলে ধরা হয়েছে।

মারিয়াম 'আলাইহাস সালামের পিতা ছিলেন হযরত ইমরান 'আলাইহিস সালাম। কারো কারো মতে হযরত ইমরান 'আলাইহিস সালামের পিতার নাম বাশিম। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ইবনে আসাকিরের মতে, তার পিতার নাম মাসান। তবে তিনি যে দাউদ 'আলাইহিস সালামের বংশধর, এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই।

হযরত ইমরান 'আলাইহিস সালাম তৎকালীন সময়ে একজন খ্যাতিমান ইমাম ছিলেন। মারিয়াম 'আলাইহাস সালামের মাতা হান্না আলাইহাস সালাম ছিলেন একজন মহীয়সী ও ধর্মপ্রাণ নারী। হান্না ইবরানী শব্দ। সিরিয়ায় 'হান্না মঠ' নামে একটি প্রসিদ্ধ মঠ রয়েছে। হান্না আলাইহাস সালামের কবর দামেশক শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত।

মারিয়াম 'আলাইহাস সালামের জন্ম ও তার মায়ের মান্নত

ইবনে ইসহাক রহ. বলেন, মারিয়াম 'আলাইহাস সালামের মা হান্নার সন্তান হত না। একবার তিনি দেখলেন, একটা পাখি স্বীয় বাচ্চার মুখে আহার তুলে দিচ্ছে। মমতা-মধুর এই দৃশ্য দেখে তার মনে সন্তান লাভের ইচ্ছা জাগে। তখন তিনি আল্লাহর নামে মানত করেন, যদি তার গর্ভে সন্তান আসে তা হলে তাকে বায়তুল মুকাদ্দাসের খেদমতের জন্য উৎসর্গ করবেন।

বর্ণিত আছে, মানত করার সাথে সাথেই হান্না আলাইহাস সালামের মাসিক শুরু হয়। যখন তিনি পবিত্র হন, তখন স্বামীর সাথে তার সহবাস যাপন হয়। এতে হান্না আলাইহাস সালাম অন্তঃসত্ত্বা হয়ে যান। এটা বুঝতে পেরে তিনি সানন্দে বলে উঠলেন,

رَبِّ اِنِّیۡ نَذَرۡتُ لَکَ مَا فِیۡ بَطۡنِیۡ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلۡ مِنِّیۡ ۚ اِنَّکَ اَنۡتَ السَّمِیۡعُ الۡعَلِیۡمُ

হে প্রতিপালক-রব, আমার গর্ভস্থ সন্তানটি আপনার নামে উৎসর্গ করে দিলাম। সুতরাং আপনি তাকে আমার পক্ষ থেকে কবুল করে নিন। নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

তখনকার সামাজিক রীতি হিসেবে বায়তুল মুকাদ্দাসের খেদমতের জন্য কোন নারী সেবিকা গৃহীত হত না। শুধু পুরুষরাই এর জন্য নিয়োগ পেত। কিন্তু সে সময়ে দেশীয় নিয়ম-নীতির ব্যাপারটি হান্না আলাইহাস সালামের খেয়ালে ছিল না। সে জন্য তিনি তার গর্ভের সন্তান পুত্র হবে নাকি কন্যা তা নিশ্চিত না হয়েই মান্নত করে ফেলেছেন।

যখন হান্না আলাইহাস সালামের মান্নত করার ব্যাপারটি তার স্বামী ইমরান 'আলাইহিস সালাম জানতে পারলেন, তখন তিনি ভাবলেন, যেহেতু মান্নত করা হয়ে গেছে সেহেতু মান্নত তো অবশ্যই পূর্ণ করতে হবে। কিন্তু তার এ আশঙ্কাও হল, যদি কন্যা সন্তান হয়, তখন কীভাবে মান্নত পূর্ণ করা হবে?

TOP

অবশেষে তাঁর আশঙ্কাই বাস্তবায়িত হল। হান্না আলাইহাস সালাম যখন সন্তান প্রসব করলেন, তখন দেখলেন, তিনি কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ করেছেন। কন্যাসন্তানকে বায়তুল মুকাদ্দাসে উৎসর্গ করার বিষয়ে হান্না আলাইহাস সালামও ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েন। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি বললেন,

رَبِّ إِنِّيْ وَضَعْتُهَآ أُنْثٰى

হে আমার প্রতিপালক, আমি তো কন্যাসন্তান প্রসব করেছি।

তাঁকে সান্তনাবাণী শুনিয়ে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثٰى

সে কী সন্তান প্রসব করেছে, এটা আল্লাহ তা'আলা ভালো করেই জানেন। আর প্রার্থিত পুত্রসন্তান এই কন্যা সন্তানের মতো নয়। (তাকে জ্ঞান-বুদ্ধি ও আমল-আখলাকে ছেলেদের চেয়েও বেশি মর্যাদাবান করা হয়েছে।)

এরপর হান্না আলাইহাস সালাম বললেন,

وَإِنِّيْ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّيْ أُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

আমি তার নাম মারিয়াম রাখলাম। আর আমি তাকে ও তার বংশধরকে অভিশপ্ত শয়তান থেকে রক্ষায় আপনার আশ্রয়ে অর্পণ করলাম।

'মারিয়াম' মূলত সেমিটিক শব্দ। এর অর্থ প্রভুর সেবিকা, ইবাদতকারিণী। কেউ কেউ বলেন, মারিয়াম প্রাচীন সিরীয় শব্দ। এর অর্থ সেবিকা।

সুন্দর এই নামটি রেখে হান্না আলাইহাস সালাম মারিয়াম 'আলাইহাস সালামের জন্য কল্যাণ লাভ, আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য এবং তাঁর প্রতি সমর্পিত হওয়ার তাওফীক কামনা করে শয়তান থেকে রক্ষায় তাকে আল্লাহ তা'আলার আশ্রয়ে সোপর্দ করেন। যাতে সে পুণ্যবতী হয় এবং তার কার্যপ্রণালী তার নামের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়।

মারিয়াম ও মেরী নাম রাখা সম্পর্কে জরুরী কথা

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের মা মারিয়ামের আগে হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের বোনের নাম ছিল মারিয়াম এবং পিতার নাম ছিল ইমরান। স্বভাবত মানুষ নবী ও সৎলোকদের নামকে বরকতময় মনে করে। তাই বনী ইসরাইলের মাঝে ইমরান ও মারিয়াম নাম দুটি বরকতপূর্ণ নাম হিসেবে পরিগণিত হয় এবং অনেকেই এই দুই নামে সন্তানদের নাম রাখে। মুসলিমসমাজেও বর্তমানে এধারাটি প্রচলিত আছে। সেই হিসেবেই ইমরান ‘আলাইহিস সালামের সহধর্মিণী তার সন্তানের নাম মারিয়াম রাখেন।

ইউরোপ-আমেরিকায় মারিয়াম নামের বিবর্তিত রূপ হল মেরী, যা সেখানে জনপ্রিয় নাম হিসেবে বহুলপ্রচলিত। তিক্ত হলেও সত্য, ইংরেজদের অনুকরণে মারিয়াম শব্দের বিকৃত রূপটি ইদানীং আমাদের মুসলিমসমাজেও প্রিয় নামের তালিকায় স্থান পেতে শুরু করেছে। ফলে বহু মুসলিমপরিবারে তাদের কন্যা শিশুদের নাম রাখছে মেরী।

অথচ একদিকে এটা একটা শুদ্ধ সুন্দর পবিত্র নামের বিকৃত রূপ। অন্যদিকে এটা বিধর্মী খ্রিস্টানদের ব্যবহৃত একান্ত একটি শব্দ, যা তাদের কৃষ্টি-কালচারের সাথে একাকার হয়ে আছে। সুতরা মুসলমানদের জন্য এই নামের ব্যবহার কিছুতেই সমীচীন নয়।

জন্মের দিন সন্তানের নাম রাখা প্রসঙ্গে

আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. বলেন,

وَاِنِّيْ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ

আয়াতাংশ দ্বারা প্রতীয়মান হয়, জন্মদিনে সন্তানের নাম রাখা যায়। তেমনি হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছেলে ইবরাহীম জন্মগ্রহণ করলে তিনি বলেন,

وُلِدَ لِيَ اللَّيْلَةَ وَلَدٌ سَمَّيْتُه بِاسْمِ اَبِيْ اِبْرَاهِيْمَ

আজ রাতে আমার একটি সন্তান হয়েছে। আমি আমার পিতা ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের নামে তার নামকরণ করেছি।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, আনাস বিন মালিক রা.-এর ভাই যেদিন জন্মগ্রহণ করে, সেদিন তিনি তার শিশু ভাইকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন সামান্য খেজুর চিবিয়ে শিশুটির মুখে তুলে দেন এবং তার নাম রাখেন আবদুল্লাহ।

এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, সন্তানের নাম রাখার ব্যাপারে হুকুম হলো, জন্মের দিনই নাম রেখে ফেলা। কিন্তু এ ব্যাপারে অন্যরকম বর্ণনাও এসেছে। যেখান থেকে সপ্তম দিনে নবজাতকের নাম রাখার কথা বুঝা যায়। বিশুদ্ধ সূত্রে সামুরা ইবনে জুনদুব রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘প্রতিটি শিশু তার আকীকার হাতকড়ায় বন্দি। তাই ভূমিষ্ঠ হওয়ার সপ্তম দিনে তার নামে পশু জবাই করা হবে এবং তার নাম রাখা হবে, আর তার মাথা মুন্ডানো হবে’।

এই দুই ধরনের হাদীসের মাঝে সমন্বয়ের যথার্থ ব্যাখ্যা হল, যে ব্যক্তি নিজ সন্তানের আকীকা কোন কারণে বিলম্বে করতে চায়, সে যেন নবজাতকের নাম রাখতে দেরি না করে। বরং যেদিন শিশুটি ভূমিষ্ঠ হবে, সেদিনই তার নাম রেখে দেয়। যেমনটি নবীপুত্র ইবরাহীম, আবদুল্লাহ ইবনে আবু তালহা, ইবরাহীম বিন আবু মুসা এবং আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রা.-এর ক্ষেত্রে করা হয়েছে; জন্মদিনেই তাদের সবার নাম রাখা হয়েছে। আর যে ব্যক্তি আপন সন্তানের নামে অবিলম্বে আকীকা করতে ইচ্ছুক, সে সপ্তম দিনে তার সন্তানের নাম রাখবে এবং আকীকা করবে।

এটি একটি চমৎকার সমন্বয়। ইমাম বুখারী রহ. ‘যে নবজাতকের আকীকা করা হবে না তার নামকরণ’ শিরোনামে এ সংশ্লিষ্ট হাদীসগুলো এনে এই সমন্বয়ের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

TOP
GET IT ON Google Play
www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com
Download From App Store

উক্ত আয়াত দ্বারা নামকরণের সাথে সাথে এটাও জানা গিয়েছে, হান্না আলাইহাস সালাম নবজাতক মারিয়ামের নামকরণের সাথে সাথে তাকে ও তার বংশধরকে অভিশপ্ত শয়তান থেকে রক্ষার্থে আল্লাহ তা'আলার আশ্রয়ে সোপর্দ করেন। আল্লাহ তা'আলা তার এই নিবেদন কবুল করেন এবং মারিয়াম 'আলাইহাস সালাম ও তার পুত্র 'ঈসা 'আলাইহিস সালামকে শয়তানের সবধরনের অনিষ্ট হতে নিরাপদ রাখেন।

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, প্রত্যেক আদম সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার সময় শয়তান তাকে স্পর্শ করে। শয়তানের এই স্পর্শের কারণেই নবজাতক শিশু সজোরে কেঁদে উঠে। তবে শুধু মারিয়াম 'আলাইহাস সালাম ও তার পুত্র 'ঈসা 'আলাইহিস সালাম এর ব্যতিক্রম। (শয়তান তাদের স্পর্শ করতে পারেনি।) অতঃপর আবু হুরায়রা রা. এই আয়াত পাঠ করেন,

وَإِنِّيْ أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

আমি তাকে ও তার বংশধরকে অভিশপ্ত শয়তান থেকে রক্ষায় আপনার আশ্রয়ে অর্পণ করলাম।

অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসটি ইরশাদ করে উক্ত আয়াত পাঠ করেন।

হাদীসের ভাষ্য দ্বারা প্রতীয়মান হয়, কেউ যদি নিজের সন্তানকে শয়তানের অনিষ্ট হতে নিরাপদ রাখার উদ্দেশ্যে এ আয়াতটি পাঠ করে, তবে আশা করা যায়, সে সন্তান শয়তানের যাবতীয় অনিষ্ট হতে নিরাপদ থাকবে।

ঝাড়-ফুঁক ও তাবিজ-কবজ সম্পর্কে কিছু কথা

বস্তুত আল্লাহ তা'আলা রোগ-ব্যাধি দেয়ার পাশাপাশি তা নিরাময়ের জন্য ব্যবস্থাপত্রও দিয়েছেন। এর মধ্যে কিছু ব্যবস্থা আছে প্রত্যক্ষ।

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

যেমন, কালোজিরা, মধু ইত্যাদি এবং বিভিন্নভাবে প্রস্তুতকৃত নানারকম ঔষধ। আবার কিছু ব্যবস্থা আছে পরোক্ষ। যেমন, রোগ-ব্যাধি ও বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি সংক্রান্ত হাদীসে বর্ণিত দু'আ-দরূদ।

রোগ-ব্যাধি ও বিপদ-আপদের ক্ষেত্রে এসব উপায়-উপকরণ গ্রহণ তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়। বরং হাদীসের ভাষ্য মতে, দু'আ করা এবং পথ্য গ্রহণ করা সুন্নত। সে হিসেবে রোগ-ব্যাধির সময় নির্দ্বিধায় ঔষধ-পথ্য ব্যবহার করা যায়।

আর তাবিজ-কবজ গ্রহণ করার ব্যাপারে হুকুম হলো এটি মৌলিকভাবে জায়েয। সাহাবা-তাবেয়ীগণের আমল ও ফাতাওয়া ছাড়াও হযরত মুজাহিদ, ইবনে সীরীন, আতা ইবনে আবি রাবাহ সহ অন্যান্য তাবেয়ী থেকে তাবিজ ব্যবহারের বৈধতা বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনাগুলোর জন্য মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা দ্রষ্টব্য। এসব বর্ণনা থেকে পরিস্কার বুঝা যায় যে, সাহাবা-তাবেয়ীদের যুগে তাবিজ ব্যবহারের প্রচলন ছিল। এবং যে তাবিজ থেকে হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে, তা মূলত শিরকযুক্ত তা'বীজ।

উল্লেখ্য, তাবিজ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়:

১. কুরআন-হাদীস জানে না এমন অজ্ঞলোক বা অমুসলিমের কাছে তাবিজের জন্য না যাওয়া।

২. কুরআন-হাদীসের বাণী বা আল্লাহর আসমা ও সিফাত-সম্বলিত হওয়া। শিরক বা শরীয়তবিরোধী কোন কিছু না হওয়া।

৩. আরবী ভাষায় বা অন্য ভাষায় পরিস্কার অর্থবোধক হওয়া। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য কিছু না হওয়া।

৪. এই বিশ্বাস বদ্ধমূল রাখা যে, তাবিজের নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নেই। সুস্থতা, বিপদমুক্তি ও প্রয়োজনপূরণ সব আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর হুকুমে হয়।

TOP
GET IT ON Google Play
www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com
Download From App Store

৫. কুরআন-হাদীসে বর্ণিত দু‘আ ও আমলের উপর তাবিজকে অধিক গুরুত্ব না দেওয়া।

যদি এসব শর্ত মেনে কেউ তাবিজ ব্যবহার করতে পারে, তাহলে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু অধিকাংশ সময় দেখা যায়, এসব শর্ত সাধারণ মানুষ মানতে পারে না। ফলে তাদের আকীদা-বিশ্বাসে শিরকের অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে।

এ কারণেই মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. বলেন, ঝাড়-ফুঁক, তাবিজ-কবজ করা জায়েয হলেও না করাই উত্তম। অন্যত্র তিনি বলেন, তাবিজ-কবজের কারণে যদি জনসাধারণের আকীদা-বিশ্বাসে ত্রুটি আসে, তবে তাদের এই উপায় গ্রহণ থেকে নিষেধ করা হবে। তবে তাবিজ-কবজ পরিহার করা সর্বাবস্থায় শ্রেয়। সুন্নত এতটুকু যে, দু‘আ ও আয়াত পড়ে শুধু দম করা হবে।

অতএব, রোগ-ব্যাধি ও বিপদ-আপদের ক্ষেত্রে এই তাবিজ-কবজের পন্থা গ্রহণ না করে সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে হাদীস শরীফে বর্ণিত মাসনুন দু‘আ পাঠ করা ও প্রত্যক্ষ চিকিৎসা-তদবির গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়। এটাই নিরাপদ ও সহীহ পদ্ধতি।

হান্না আলাইহাস সালামের মান্নত পূরণ

হযরত মারিয়াম ‘আলাইহাস সালামের শৈশব শেষে যখন তার মাঝে কিছুটা বিবেচনাবোধ সৃষ্টি হয়, তখন তার মা হান্না তাকে বায়তুল মুকাদ্দাসে নিয়ে আসেন। এই বিলম্বের কারণ ছিল তার উৎসর্গীকৃত কন্যাটি যাতে ইবাদতগৃহের খেদমতসংশ্লিষ্ট নিয়ম-নীতি ও আচরণ-বিধি সম্বন্ধে অবগত হতে পারে এবং ইবাদতে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গকে তার লালন-পালন নিয়ে ব্যস্ত থাকতে না হয়।

হযরত মারিয়াম ‘আলাইহাস সালামকে যেদিন বায়তুল মুকাদ্দাসের খেদমতের উদ্দেশ্যে নিয়ে আসা হয়, সেদিন বায়তুল মুকাদ্দাসের ইতিহাসে উৎসর্গীকৃত সর্ব প্রথম কন্যার লালন-পালনের দায়িত্ব লাভের

TOP

Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com App Store

জন্য সকল ধর্মপ্রধান ছুটে আসেন এবং এ নিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। শেষে সিদ্ধান্ত হয়, ভাগ্যপরীক্ষা হবে।

ভাগ্যপরীক্ষার পদ্ধতি নির্ণীত হয়, দায়িত্বপ্রার্থী সকলে আপন আপন চিহ্ন দেয়া কলম এক জায়গায় জড়ো করবেন। এরপর নাবালক এক কিশোরকে বলা হবে কলমগুলোর মধ্য থেকে একটি কলম তুলে আনতে।

এই পদ্ধতিতে ভাগ্যপরীক্ষা করা হলে দেখা গেলো, নির্দেশপ্রাপ্ত বালকটি যে কলমটি তুলে এনেছে, সেটি হযরত যাকারিয়া 'আলাইহিস সালামের চিহ্ন দেয়া কলম।

কিন্তু প্রার্থীগণ এতে তুষ্ট হতে না পেরে দ্বিতীয়বার এভাবে লটারীর দাবি করলেন যে, প্রত্যেকে তার কলম নদীতে ফেলবেন। যার কলম রাতের উল্টো দিকে প্রবাহিত হবে, তিনিই বিজয়ী বলে গণ্য হবেন।

দাবি অনুযায়ী দ্বিতীয়বার লটারী করা হলো। এতেও দেখা গেল যাকারিয়া 'আলাইহিস সালামের কলমটিই রাতের উল্টো দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। আর বাকি কলম পানির রাতের অনুকূলে ভেসে যাচ্ছে।

কিন্তু এতেও তারা তুষ্ট হতে পারেননি। তারা তৃতীয়বার এই পদ্ধতিতে লটারী করার দাবি তোলেন যে, এবার পানিতে ভারী কলম ফেলা হবে। এতে যার কলম পানিতে ভেসে থাকবে, তিনিই বিজয়ী হবেন।

ভাগ্য পরীক্ষার এই তৃতীয় পদ্ধতিতেও দেখা গেল শুধু যাকারিয়া 'আলাইহিস সালামের কলমটিই পানির উপর ভেসে রয়েছে। আর বাকিদের কলম নদীগর্ভে তলিয়ে গেছে।

ফলে তখন সর্বসম্মতিক্রমে হযরত যাকারিয়া 'আলাইহিস সালামই শিশু মারিয়ামের লালন-পালনের দায়িত্ব পেয়ে ধন্য হন।

লটারীর এই তৃতীয় ধারাটির দিকেই পবিত্র কুরআনে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمَا اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ○

এটা গায়েবের সংবাদ, যা আমি আপনার নিকট ওহী পাঠাচ্ছি। আপনি তাদের নিকট ছিলেন না, যখন তারা কলম নিক্ষেপ করছিল যে, মারিয়ামের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাদের মধ্যে কে গ্রহণ করবে এবং আপনি তাদের নিকট ছিলেন না, যখন তারা বাদানুবাদ করছিল।

বুখারী শরীফে ‘জটিলতার ক্ষেত্রে লটারী প্রসঙ্গ’ শিরোনামে একটি অধ্যায় আনা হয়েছে। অধ্যায়টিতে উক্ত ঘটনাপ্রসঙ্গে হাদীস বর্ণনা করে বলা হয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, ‘দায়িত্ব প্রার্থীরা লটারী করলো। তখন সকলের কলম পানির রাতে তলিয়ে গেল। আর যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালামের কলমটি ভেসে রইলো।’

ইবনুল আদিম রহ. তার ‘তারীখে হালব’ গ্রন্থে হযরত শু‘আইব বিন ইসহাক রহ. হতে অবিচ্ছিন্ন-সূত্রে বর্ণনা করেছেন, ‘যে নদীতে দায়িত্ব প্রার্থীরা কলম নিক্ষেপ করে ভাগ্যপরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, সেই নদীর নাম ছিল ফুয়াইদ। এটা হালব জনপদের একটি সুপ্রসিদ্ধ নদী।

দ্বন্দ্ব নিরসনে লটারীর আয়োজন

ইমাম বুখারী রহ. পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এই ঘটনার অংশ বিশেষ বর্ণনা করে প্রচ্ছন্নভাবে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, লটারীর মাধ্যমে কোনকিছু নির্ণয় করা বৈধ। এর ভিত্তি হলো, পূর্ববর্তী নবীগণের উপর প্রবর্তিত শরী‘আতের কোন বিষয় যদি আমাদের শরী‘আতে বর্ণিত হয় এবং তার খেলাফ কোন হুকুম আমাদের শরী‘আতে বর্ণিত না হয়, তাহলে সেটি আমাদের শরী‘আতের পর্যায়ভুক্ত হয়।

কোন কিছু নির্ণয়ে লটারী করার খেলাফ কোন কিছু ইসলামী শরী‘আতে বলা হয়নি। অধিকন্তু অনেক হাদীস দ্বারা এ ধরনের লটারীর বৈধতার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন, হযরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোথাও

TOP
GET IT ON Google Play
www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com
Download From App Store

সফরে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন, তখন স্ত্রীদের মাঝে লটারী করতেন। লটারীতে যার নাম আসত, তাকে সাথে নিয়ে যেতেন।

এ বিষয়ক অপর এক হাদীস হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার কিছুলোককে হলফ করতে বললেন। সঙ্গে সঙ্গে তাদের সকলেই হলফ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। তখন তিনি, কে হলফ করবে, এ ব্যাপারে লটারী করার নির্দেশ দিলেন।

তবে বর্তমানে যে পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে বিভিন্ন ফাউন্ডেশন, হাসপাতাল ইত্যাদির নামে বিশেষ মূল্যমানের লটারীর টিকিট ছাড়া হয়, তা এই জায়েয লটারীর অন্তর্ভুক্ত নয়। এ ধরনের লটারী সম্পূর্ণ হারাম ও জুয়ার শামিল।

মারিয়াম 'আলাইহাস সালামের বেড়ে উঠা

আল্লাহ তা'আলা মারিয়াম 'আলাইহাস সালামের লালন-পালনের জন্য এমন এক মহান ব্যক্তিকে মনোনীত করেছেন, যিনি নবী ছিলেন। যার ব্যাপারে কুধারণার সামান্য অবকাশ ছিল না। অথচ তৎকালীন যুগের অনেক পাদরী ছিল পাপাচারী ও চরিত্রহীন। তারা অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ লুটে খেত। বাহ্যিক স্বচ্ছ পরিচয়ের আড়ালে অনৈতিক কার্যকলাপ সংঘটিত করত। কোন নারী সেবিকার দায়িত্ব গ্রহণই তাদের জন্য অপবাদের কারণ হয়ে দাঁড়াত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা মারিয়াম 'আলাইহাস সালামকে ঐসব পাপাচারী পাদরির হাত থেকে রক্ষা করেছেন।

হযরত মারিয়াম 'আলাইহাস সালাম যাকারিয়া-এর ইবাদতগৃহে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠতে লাগলেন। এখানে বসে তিনি আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে নিমগ্ন সময় কাটাতেন। এই সেই প্রকোষ্ঠ, যেখানে বসে হযরত যাকারিয়া 'আলাইহিস সালাম আপন প্রভুর সাথে নীরব-নিভৃতে বাক্যালাপ করতেন এবং এখানেই তার উপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ওহী অবতীর্ণ হত। ঈমানবিধৌত এই মনোরম পরিবেশে থেকে

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

মারিয়াম 'আলাইহাস সালাম নিজের বোধ-বুদ্ধি ও চিন্তা-চেতনাকে প্রদীপ্ত ও নিষ্কলুষ করে নেন। যদ্দরুন তার জ্ঞান-ঈমান ষোলআনা পূর্ণতা লাভ করে।

হযরত যাকারিয়া 'আলাইহিস সালামের কুঠরির এক কোণে মারিয়াম 'আলাইহাস সালামের জন্য একটি জায়গা নির্ধারিত ছিল। এখানে বসে তিনি আপন প্রভু-পরওয়ারদিগারের ইবাদত-বন্দেগী করতেন। বায়তুল মুকাদ্দাসে নিজের দায়িত্ব পালন শেষে এখানে চলে আসতেন।

আল্লাহর পক্ষ থেকে রিযিকপ্রাপ্তি

ধীরে ধীরে ইবাদত-উপাসনায় তার একাগ্রতার কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে একদিন তার নিকট ভিন্ন মৌসুমের ফল পাওয়ার অলৌকিক ঘটনাটি প্রকাশ পায়। সে সম্পর্কে কুরআনে কারীমে নিম্নোক্ত আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ○

যখনই যাকারিয়া কক্ষে তার সাথে সাক্ষাত করতে গেলেন, তখনই তার নিকট বিশেষ খাদ্যসামগ্রী দেখতে পেতেন। তিনি বললেন, হে মারিয়াম, তোমার জন্য এসব কোত্থেকে এলো? মারিয়াম উত্তর দিলেন, এসব আল্লাহর নিকট হতে এসেছে। নিশ্চয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিযিক দান করেন।

রিযিকের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুজিযা

রিযিকের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেও অনেক মুজিযা প্রকাশ পেয়েছে। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুজিযার বরকতে দেখে হযরত ফাতেমা রা. এর ঘরে থাকা সামান্য খাবারে অভাবনীয় বরকত হয়। হযরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত পূর্ণ ঘটনা এই। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুদিন যাবত অনাহারে দিন কাটাচ্ছিলেন। এতে তার খুব কষ্ট হচ্ছিল। তখন তিনি এক এক করে স্ত্রীদের ঘরে গেলেন। কিন্তু কারো ঘরে কোন খাবার পেলেন না। পরিশেষে ফাতেমা রা.-এর ঘরে এসে বললেন, মা, তোমার ঘরে কোন খাবার আছে? আমার খুব ক্ষিধে পেয়েছে। ফাতেমা রা. বললেন, আব্বা, আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমার ঘরে কোন খাবার নেই। আমার বাবা-মা আপনার উপর উৎসর্গিত হোক। (এটা সম্মানসূচক বাক্য, যা সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।)

যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমা রা.-এর ঘর থেকে বের হয়ে আসার পর ফাতেমা রা.-এর এক বাঁদী তার নিকট দুটি রুটি ও এক টুকরো গোশত পাঠিয়ে দেন। সে সময়ে তার পরিবারের সকলের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ খাবারের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ফাতেমা রা. পাঠানো খাবার হতে কিছুটা নিয়ে নিজের পাত্রে রেখে দিলেন এবং বললেন, আল্লাহর শপথ, এর দ্বারা আমি আমার এবং আমার কাছের আপনজন যারা আছে সবার উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অগ্রাধিকার দিলাম। এরপর ফাতেমা রা. হাসান ও হুসাইনকে পাঠালেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডেকে আনতে। সংবাদ পেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমার ঘরে এলেন। তখন ফাতেমা রা. পিতাকে বললেন, আমার মা-বাবা আপনার উপর উৎসর্গ হোক। আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য কিছু খাবারের ব্যবস্থা করেছেন। তার থেকে কিছু অংশ আপনার জন্য রেখে দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নিয়ে এসো দেখি মা!

ফাতেমা রা. বলেন, আমি পাত্রটি তার কাছে নিয়ে এলাম এবং পাত্রের মুখ হতে ঢাকনা উঠালাম। দেখি, রুটি ও গোশতে পরিপূর্ণ। ফাতেমা রা. ব্যাপারটি দেখে হতবাক হয়ে গেলেন এবং নিশ্চিত হলেন, এটা আল্লাহ তা'আলার কুদরত। এরপর শুকরিয়াস্বরূপ আল্লাহর প্রশংসা

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

করলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরুদ পেশ করলেন।

যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ খাবার দেখলেন, তখন আল্লাহর প্রশংসা করে বললেন, তুমি এ খাবার কোথায় পেলে? ফাতেমা রা. বললেন, ‘এ খাবার আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিযিক দান করেন’।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই উত্তর শুনে আল্লাহ তা‘আলার প্রশংসা করে বললেন, সকল প্রশংসা ঐ সত্তার, যিনি তোমাকে বনী ইসরাইলের নারীদের সরদার মারিয়াম ‘আলাইহাস সালামের মতো বানিয়েছেন। কারণ, তাঁকে আল্লাহ তা‘আলা যখন কোন রিযিক দান করতেন, সে ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলতেন, ‘এ সব আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিযিক দান করেন।’

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রা. কে ডেকে পাঠালেন। এরপর সেই খাবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর সকল স্ত্রী ও পরিবার, আলী রা., ফাতেমা রা., হাসান ও হুসাইন রা. সবাই পরিতৃপ্ত হয়ে খেলেন। ফাতেমা রা. বলেন, সবাই খাওয়ার পরও পাত্রটি যেমন ছিল তেমনি পূর্ণ রয়ে গেল। ফলে আমি অবশিষ্ট খাবার প্রতিবেশীদের মাঝে বণ্টন করে দিলাম। আল্লাহ তা‘আলা তাতে অনেক বরকত ও প্রাচুর্য দান করেছিলেন।

মারিয়াম ‘আলাইহাস সালাম যেভাবে গর্ভবতী হলেন

পবিত্র কুরআনের সূরা মারিয়ামে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مَرْيَمَ ۘ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ○ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا ۚ فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ○ قَالَتْ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ○ قَالَ اِنَّمَآ اَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ ۖ لِاَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّا ○ قَالَتْ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ

غُلٰمٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ وَّلَمْ اَكُ بَغِيًّا ۝ قَالَ كَذٰلِكِ ۚ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ ۚ وَلِنَجْعَلَهٗٓ
اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا ۚ وَكَانَ اَمْرًا مَّقْضِيًّا ۝

"এ কিতাবে মারিয়ামের বৃত্তান্ত বর্ণনা করুন, যখন তিনি তার পরিবার থেকে পৃথক হয়ে পূর্বদিকের এক স্থানে আশ্রয় নিলেন। তারপর তিনি তাদের কাছ থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্য একটি পর্দা ফেলে দিলেন। তখন আমি তার কাছে আমার রুহ (অর্থাৎ একজন ফেরেশতা) পাঠালাম, যে তার সামনে এক পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল। মারিয়াম বললো, আমি আপনার থেকে দয়াময় আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করছি, যদি আপনি মুত্তাকী হন, তাহলে আল্লাহকে ভয় করুন। (এবং আমাকে স্পর্ষ করবেন না)

তখন ফেরেশতা বললো, আমি তো আপনার প্রতিপালকের দূত; আপনাকে এক পবিত্র সন্তানের সুসংবাদ দিতে এসেছি। মারিয়াম বললেন, আমার সন্তান হবে কেমন করে? আমাকে তো কোন মানুষ স্পর্শ করেনি এবং আমি অনাচারিণী নই। ফেরেশতা বললো, এমনিতেই হবে। আপনার পালনকর্তা বলেছেন, এটা আমার জন্য সহজ এবং তাকে মানুষের জন্য নিদর্শন ও আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহের বিষয় বানাতে চাই। আর এটা একটা ফায়সালাকৃত বিষয় ছিল।"

সূরা আলে ইমরান ও সূরা মারিয়ামে হযরত মারিয়াম 'আলাইহাস সালামের জন্মবৃত্তান্তসহ তার জীবন চরিত আলোচিত হয়েছে। উল্লিখিত বর্ণনাটি তারই অংশবিশেষ।

উল্লিখিত ঘটনার বিশ্লেষণ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা যখন ইচ্ছা করলেন, হযরত মারিয়াম 'আলাইহাস সালামের গর্ভে হযরত 'ঈসা 'আলাইহিস সালামের জন্ম হবে, তখন মারিয়াম 'আলাইহাস সালাম নিজের পরিবার হতে আলাদা হয়ে বায়তুল মুকাদ্দাসের পূর্বদিকে নির্জন একস্থানে গিয়েছিলেন।

তিনি সে সময় সেখানে কেন গিয়েছিলেন, সে সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। কেউ বলেন, অভ্যাস অনুযায়ী নির্জনে ইবাদত করার জন্য কক্ষের পূর্বদিকস্থ সেই বিশেষ স্থানে গিয়েছিলেন। কেউ বলেন, গোসল করার জন্য সেই নির্জন স্থানে গিয়েছিলেন। আবার কেউ কেউ বলেন, ঋতুস্রাব হওয়ার কারণে তিনি নির্জনে চলে গিয়েছিলেন।

এসব বর্ণনার মধ্যে প্রথম বর্ণনাটি আল্লামা কুরতুবী রহ. উত্তম বলেছেন। অর্থাৎ মারিয়াম 'আলাইহাস সালাম নির্বিঘ্নে ইবাদত করার উদ্দেশ্যে সেই নির্জন স্থানে গিয়েছিলেন।

হযরত নাওফ বাকালী রহ. বলেন, হযরত মারিয়াম 'আলাইহাস সালামের জন্য পূর্বদিকের নির্জনস্থানে একটি কুঠরী তৈরি করা হয়। সেখানে তিনি ইবাদত-বন্দেগী করতেন। এ সম্পর্কেই পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا

'তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গেলেন।'

এ সময় আল্লাহ তা'আলা তার নিকট জিবরাইল 'আলাইহিস সালামকে পাঠালেন। জিবরাইল 'আলাইহিস সালাম তার সামনে সম্পূর্ণ মানবরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। মারিয়াম 'আলাইহাস সালাম যখন দেখলেন নির্জন-নিরালায় অবিকল একজন মানুষ তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, আশপাশে কোন মানুষজনও নেই, তখন তিনি ভয় পেয়ে গেলেন এবং ধারণা করলেন, লোকটা হয়তো কুমতলবে এসেছে। তাই তিনি বললেন, আমি আপনার থেকে দয়াময় আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। কাজেই যদি আপনি মুত্তাকী হয়ে থাকেন আল্লাহকে ভয় করুন এবং আমার থেকে দূরে সরে যান।

শর'ঈ নীতি এটাই যে, আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে প্রথমে সহজ উপায় অবলম্বন করতে হয়। এ জন্য মারিয়াম 'আলাইহাস সালাম তাকে প্রথমে আল্লাহ তা'আলার ভয় দেখালেন।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

তখন জিবরাইল ‘আলাইহিস সালাম মারিয়াম ‘আলাইহাস সালামের শঙ্কা দূর করে দিয়ে বললেন, আপনি আমার সম্পর্কে যেরূপ ধারণা করেছেন, আমি তেমন কেউ নই। আমি আল্লাহ তা‘আলার প্রেরিত দূত। আল্লাহ আমাকে আপনার নিকট একটি পবিত্র সন্তানের সুসংবাদ দেওয়ার জন্য পাঠিয়েছেন।

এ কথা শুনে মারিয়াম ‘আলাইহাস সালাম আশ্চর্য হয়ে বললেন, আমার সন্তান হবে কী করে? আমার তো কোন স্বামী নেই। এ যাবৎ আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করেনি। আর আমি সর্বদা পূত-পবিত্র থেকেছি। কোন অনাচার আমার থেকে প্রকাশ পায়নি।

জিবরাইল ‘আলাইহিস সালাম বললেন, আল্লাহ বলেছেন, আপনার থেকে আল্লাহর কুদরতে এমনিতেই সন্তান হবে- যদিও আপনার কোন স্বামী নেই এবং আপনার থেকে সন্তান হওয়ার মতো কোন ক্রিয়া সম্পাদিত হয়নি। আর আল্লাহ তা‘আলার কাছে এটা খুবই সহজ ব্যাপার। আল্লাহ তা‘আলা যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারেন।

আর এই কুদরতীভাবে সন্তান জন্মদান প্রসঙ্গে মারিয়াম ‘আলাইহাস সালামকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তা‘আলা বলেন, আমি তোমার গর্ভের শিশুটিকে মানবজাতির জন্য আমার অসীম শক্তি, ক্ষমতা ও অনুগ্রহের নিদর্শন বানিয়ে দেব এবং সে নবী হবে। মানুষকে আল্লাহর ইবাদতের কথা বলবে এবং আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান করবে।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ۖ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ○ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَّمِنَ الصّٰلِحِيْنَ○

“স্মরণ করুন, যখন ফেরেশতারা বললো, হে মারিয়াম, নিশ্চয় আল্লাহ আপনাকে তার পক্ষ হতে একটি কালেমার (সম্ভাবনাময় পুত্র সন্তানের) সুসংবাদ দিচ্ছেন। তার নাম মারিয়াম তনয় মাসীহ-’ঈসা।

www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com

ইহকাল ও পরকালে সে হবে সম্মানিত এবং সান্নিধ্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। সে দোলনায় থেকেও পরিণত বয়সের মানুষের সাথে কথা বলবে এবং সে হবে পুণ্যবানদের একজন। অর্থাৎ সে শৈশবে-কৈশোরে ও পৌঢ়ত্বে সর্বকালে মানুষকে সত্যের দিকে আহ্বান করবে।”

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত মুজাহিদ রহ. হতে বর্ণিত হয়েছে, মারিয়াম ‘আলাইহাস সালাম বলেন, যখন আমি নির্জনে গর্ভবতী হয়েছিলাম, তখন ‘ঈসা আমার গর্ভে থেকে আমার সাথে কথা বলেছে এবং যখন লোকালয়ে চলে এলাম, তখন সে আমার কোলে থেকে আল্লাহর পবিত্রতা ও মহত্ত্ব বর্ণনা করেছে।

বর্ণিত আছে, যখন মারিয়াম ‘আলাইহাস সালাম আল্লাহর সিদ্ধান্তে তুষ্ট হলেন, তখন জিবরাইল ‘আলাইহিস সালাম মারিয়াম ‘আলাইহাস সালামের পরিধেয় বসনের গলাবন্ধনে ফুঁক দিলেন। ফুঁৎকার দেওয়া প্রবাহটি মারিয়াম ‘আলাইহাস সালামের পেটে গিয়ে প্রবেশ করে। এতে আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছায় মারিয়াম ‘আলাইহাস সালাম সন্তানসম্ভবা হয়ে উঠেন।

এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَ مَرۡیَمَ ابۡنَتَ عِمۡرٰنَ الَّتِیۡۤ اَحۡصَنَتۡ فَرۡجَهَا فَنَفَخۡنَا فِیۡهِ مِنۡ رُّوۡحِنَا وَ صَدَّقَتۡ بِکَلِمٰتِ رَبِّهَا وَ کُتُبِهٖ وَ کَانَتۡ مِنَ الۡقٰنِتِیۡنَ ○

“আরো দৃষ্টান্ত দিচ্ছি ইমরান তনয়া মারিয়ামের। সে তার সতীত্ব রক্ষা করেছিল। ফলে আমি তার মধ্যে রুহ ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং সে তার প্রতিপালকের বাণী ও তার কিতাবসমূহ সত্য বলে গ্রহণ করেছিল। সে ছিল অনুগতদের একজন।”

আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছার নিকট সর্বান্তঃকরণে সমর্পিত থাকলেও ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের জন্মের মুহূর্তে মারিয়াম ‘আলাইহাস সালাম লোকলজ্জার মানসিক চাপে হতবিহ্বল হয়ে পড়েন। তিনি বুঝতে পারছিলেন না, সমাজের লোকদের তিনি কী বলবেন? কারণ, তিনি

TOP

ধারণা করছিলেন, এ ব্যাপারে তিনি যা-কিছু বলবেন, তা সমাজ ও পরিবারের কেউ কিছু বিশ্বাস করবে না।

এটা সে সময়ের কথা যখন যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালাম আল্লাহ তা‘আলার কাছে সন্তান লাভের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন এবং এর ফলে তার বিবিও সন্তানসম্ভাবা হয়েছিলেন। পাঠক তো পূর্বেই জেনেছেন যে, যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালামের বিবি মারয়াম ‘আলাইহিস সালামের খালা ছিলেন।

এ সময়ে মারিয়াম ‘আলাইহাস সালাম তার খালার কাছে যান এবং তার কাছে গিয়ে বসেন। তখন কথা প্রসঙ্গে যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালামের বিবি বললেন, জানো মারিয়াম, আমি সন্তানসম্ভবা হয়েছি। তখন মারিয়াম ‘আলাইহাস সালাম বললেন, আপনি কি জানেন, আমিও সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়েছি? এরপর মারিয়াম ‘আলাইহাস সালাম তার সেই অলৌকিক গোপন ব্যাপারটি তাকে খুলে বলেন। যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালামের বিবি কুদরতের এ ব্যাপার মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে নেন। কারণ, তারা সবাই ছিলেন বিশ্বাসী কাফেলার সদস্য।

গর্ভধারণ ও সন্তানপ্রসব

মুফাসসিরগণ মারিয়াম ‘আলাইহাস সালামের গর্ভকালীন সময় নিয়ে বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তবে অধিকাংশের মত হলো, মারিয়াম ‘আলাইহাস সালামের গর্ভকাল ছিল নয় মাস।

হযরত মারিয়াম ‘আলাইহাস সালামের এক নিকটাত্মীয়, যিনি তিনি তার সাথে বায়তুল মুকাদ্দাস মসজিদে খেদমত করতেন। তিনি অত্যন্ত সজ্জন ছিলেন। নাম ছিল ইউসুফ নাজ্জার। তিনি যখন মারিয়াম ‘আলাইহাস সালামের শারীরিক গর্ভজনিত অবস্থা লক্ষ্য করলেন, তখন এ নিয়ে ভাবতে লাগলেন। অতঃপর তিনি মারিয়াম ‘আলাইহাস সালামের নিষ্কলুষতা, পবিত্রতা, ধার্মিকতা ও ইবাদত-মুজাহাদার

Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com App Store

বিষয়টিও তার সামনে ছিল। এরপরও বিষয়টির ব্যাপারে নিশ্চিত হতে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, এ ব্যাপারে তাকেই সরাসরি জিজ্ঞেস করবেন।

সেমতে তিনি একসময় মারিয়াম ‘আলাইহাস সালামকে জিজ্ঞেস করলেন, মারিয়াম, আপনার কাছে আমি একটি বিষয় জানতে চাই। জবাব দিতে তাড়াহুড়া করবেন না, ভেবে-চিন্তে জবাব দিবেন। তিনি বললেন, বলুন, কী বিষয়? তিনি বললেন, মারিয়াম, বীজ ছাড়া কি কখনো বৃক্ষ হয়? শস্যদানা ছাড়া কি শস্য হয়? পিতা ছাড়া কি পুত্র হয়?

তিনি প্রশ্নগুলো করে কোন দিকে ইঙ্গিত করতে চাচ্ছেন, মারিয়াম ‘আলাইহাস সালাম তা বুঝে ফেললেন। তাই তিনি বললেন, আপনি যে প্রশ্ন করলেন, বীজ ছাড়া বৃক্ষ এবং শস্যদানা ছাড়া শস্য হয় কি না? তা হলে শুনুন, আল্লাহ তা‘আলা হযরত আদম ‘আলাইহিস সালামকে মা-বাবা ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন। এ উত্তর পেয়ে লোকটি তার কথা বিশ্বাস করে নেন এবং তার এ ব্যাপারটি তার উপরই ছেড়ে দেন।

কিন্তু মারিয়াম ‘আলাইহাস সালাম যখন উপলব্ধি করলেন, তার সমাজের লোকেরা তাকে মিথ্যা অপবাদ দিবে, তখন তিনি লোকালয় ছেড়ে নিরালয় চলে গেলেন। যাতে করে তিনি তাদের না দেখেন এবং তারাও তাকে না দেখে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهٖ مَكَانًا قَصِيًّا ○ فَاَجَآءَهَا الْمَخَاضُ اِلٰى جِذْعِ النَّخْلَةِ ۚ قَالَتْ يٰلَيْتَنِىْ
مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا ○ فَنَادٰىهَا مِنْ تَحْتِهَآ اَلَّا تَحْزَنِىْ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ
تَحْتَكِ سَرِيًّا ○ وَهُزِّىْٓ اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ○ فَكُلِىْ وَاشْرَبِىْ
وَقَرِّىْ عَيْنًا ۚ فَاِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا ۙ فَقُوْلِىْٓ اِنِّىْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ
الْيَوْمَ اِنْسِيًّا ○ فَاَتَتْ بِهٖ قَوْمَهَا تَحْمِلُهٗ ؕ قَالُوْا يٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْـًٔا فَرِيًّا ○ يٰٓاُخْتَ
هٰرُوْنَ مَا كَانَ اَبُوْكِ امْرَاَ سَوْءٍ وَّمَا كَانَتْ اُمُّكِ بَغِيًّا ○ فَاَشَارَتْ اِلَيْهِ ؕ قَالُوْا كَيْفَ نُكَلِّمُ

www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com

مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ○ قَالَ اِنِّيْ عَبْدُ اللّٰهِ ۟ اٰتٰنِيَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِيْ نَبِيًّا ○ وَّجَعَلَنِيْ مُبٰرَكًا
اَيْنَ مَا كُنْتُ ۪ وَاَوْصٰنِيْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ○ وَّبَرًّا بِوَالِدَتِيْ ۫ وَلَمْ يَجْعَلْنِيْ
جَبَّارًا شَقِيًّا ○ وَالسَّلٰمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُّ وَيَوْمَ اَمُوْتُ وَيَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا ○

অতঃপর মারিয়াম সেই শিশুকে গর্ভে সন্তান ধারণ করলেন এবং তাকে সহ এক দূরবর্তী স্থানে চলে গেলেন। প্রসব-বেদনা তাকে একটি খেজুর গাছের নিচে নিয়ে গেল। তিনি বললেন, হায়, আমি যদি কোনরূপে এর পূর্বে মারা যেতাম এবং মানুষের বিস্মৃত-বিলুপ্ত হয়ে যেতাম!

তখন ফেরেশতা তাকে নিম্ন দিক থেকে আওয়াজ দিলেন, তুমি দুঃখ করো না। তোমার পালনকর্তা তোমার পায়ের তলায় একটি নহর জারি করেছেন। আর তুমি খেজুর গাছের কান্ড ধরে নিজের দিকে নাড়া দাও; তা থেকে তোমার উপর পাকা তাজা খেজুর তোমার উপর ঝরে পড়বে। অতএব, আহার করো, পান করো এবং চোখ জুড়াও।

মানুষের মধ্যে কাউকে দেখলে বলে দিয়ো, আমি আল্লাহর উদ্দেশে রোযা মান্নত করেছি। সুতরাং আজ আমি কিছুতেই কোন মানুষের সাথে কথা বলবো না। অতঃপর তিনি সন্তানকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত হলেন। তারা বললো, হে মারিয়াম, তুমি একটি অঘটন ঘটিয়ে বসেছ। হে হারুন-ভগ্নি, তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিলেন না এবং মাতাও অসতী ছিলেন না।

তখন তিনি সন্তানের দিকে ইঙ্গিত করলেন। তারা বললো, কোলের শিশুর সাথে আমরা কেমন করে কথা বলবো? (সেই মুহূর্তে) সন্তানটি বলে উঠলো, আমি নিঃসন্দেহে আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী বানিয়েছেন। আমি যেখানেই থাকি, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। যত দিন আমি জীবিত থাকি, নামায ও যাকাত আদায় করতে আদেশ করেছেন। এবং আমাকে আমার মায়ের অনুগত বানিয়েছেন, আমাকে তিনি উদ্ধত ও হতভাগ্য বানাননি। (আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে) আমার প্রতি সালাম, যেদিন

TOP

আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন মৃত্যুবরণ করবো এবং যেদিন পুনরুজ্জীবিত হবো।

ইবনে ইসহাক রহ. বলেন, যখন মারিয়াম ‘আলাইহাস সালাম সন্তানসম্ভবা হলেন এবং বিশেষ প্রয়োজনে লোকালয়ে এলেন, এ সময় তিনি খুব ক্লান্তি অনুভব করেন। তার খাদ্য চাহিদাও বেড়ে যায় এবং গায়ের রং বিবর্ণ হয়ে যায়। এমনকি তার রসনা ফেটে চৌচির হয়ে যায়। আর শারীরিক পরিবর্তনও উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। এতে করে বিষয়টি বনী ইসরাইল সম্প্রদায়ের মাঝে জানাজানি হয়ে যায়। সকলেই বলতে থাকে, নিশ্চয় ইউসুফ নাজ্জার মারিয়ামের এ অবস্থার জন্য দায়ী। গির্জায় সে ছাড়া আর কেউ থাকে না। তখন স্বগোত্রীয় লোকদের বিরূপ মন্তব্য শুনে মারিয়াম ‘আলাইহাস সালাম লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যান। এরপর যখন তার প্রসব-বেদনা শুরু হয়, তখন তিনি একটি খেজুর গাছের গোড়ায় গিয়ে আশ্রয় নেন।

অন্য এক সূত্রে ওহাব বিন মুনাব্বিহ রহ. বলেন, স্থানটি বায়তুল মুকাদ্দাস হতে আট মাইল দূরে ‘বায়তু লাহাম’ নামক এলাকায় অবস্থিত।

এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ

আমি মারিয়াম তনয় এবং তার জননীকে এক বিশেষ নিদর্শন বানালাম। তাদের আশ্রয় দিলাম এক নিরাপদ ও প্রস্রবণ বিশিষ্ট উঁচু ভূমিতে।

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘মিরাজ রজনীতে আমি গাধার চেয়ে বড় খচ্চরের চেয়ে ছোট একটি প্রাণী ‘বোরাক’ এর কাছে এলাম। তার দৃষ্টির শেষ সীমানা ছিল তার এক পদক্ষেপ। আমি তার উপর আরোহণ করলাম, সাথে জিবরাইল ‘আলাইহিস সালাম ছিলেন। আমরা ভ্রমণ শুরু

করলাম। এক জায়গায় এসে জিবরাইল ‘আলাইহিস সালাম বললেন, এখানে নামুন এবং নামায পড়ুন। আমি নামায পড়লাম। জিবরাইল ‘আলাইহিস সালাম বললেন, আপনি কি জানেন, আপনি কোথায় নামায পড়লেন? বায়তু লাহাম এলাকায় নামায পড়লেন, যেখানে ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম জন্মগ্রহণ করেছেন।’

আর লোক পরম্পরায়ও এটাই শ্রুত হয়ে আসছে যে, বায়তু লাহামই হলো ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের জন্মস্থান এবং খ্রিস্টান পন্ডিতদের মাঝেও এটা নিয়ে কোন দ্বিমত নেই। বর্তমান খ্রিস্টানরা এই নামটিকে ‘বেথেলহেম’ বলে থাকে।

উক্ত খেজুর বৃক্ষের গোড়ায় বসে মারিয়াম ‘আলাইহাস সালাম ভরাক্রান্ত হৃদয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, হায়, এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার আগেই যদি আমার মৃত্যু হয়ে যেত! আমি যদি সৃষ্টিই না হতাম!

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, সর্বপ্রথম ইউসুফ ‘আলাইহিস সালাম মৃত্যু কামনা করেছেন। পবিত্র কুরআনে তার অভিব্যক্তি বর্ণনা করে ইরশাদ হয়েছে, তিনি বলেন,

تَوَفَّنِىۡ مُسۡلِمًا وَّ اَلۡحِقۡنِىۡ بِالصّٰلِحِيۡنَ

হে প্রতিপালক, আপনি আমাকে মুসলিম হিসেবে মৃত্যুদান করুন এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

ইসলামের দৃষ্টিতে মৃত্যু কামনার বিধান

আনাস বিন মালেক রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘তোমাদের কেউ যেন দুঃখ দুর্দশার কারণে মৃত্যু কামনা না করে। যদি এমন দুঃখ দুর্দশা দেখা দেয় যে, মৃত্যুকামনা করা আবশ্যক হয়ে পড়ে, তবে যেন এভাবে দু‘আ করে, আয় আল্লাহ, যতদিন আমার জন্য বেঁচে থাকা মঙ্গলজনক হয়, ততদিন আমাকে বাঁচিয়ে রাখুন। আর যদি মৃত্যু আমার জন্য কল্যাণকর হয়, তবে আমাকে মৃত্যুদান করুন।’

www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com

হযরত আবু উমামা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসে ছিলাম। তিনি তখন আমাদের বেশ কিছু উপদেশমূলক কথা বললেন। এতে আমাদের হৃদয় বিগলিত হয়ে গেল। এ সময় সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস রা. অঝোর ধারায় কাঁদতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, হায়, যদি আমার মৃত্যু হয়ে যেত! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা শুনে বললেন, 'তুমি আমার কাছে বসে মৃত্যু কামনা করছো?' বাক্যটি তিনি তিনবার বললেন। এরপর বললেন, 'তুমি যদি জান্নাত লাভের জন্য সৃজিত হয়ে থাকো, তবে জেনে রেখো, যতদিন বেঁচে থাকবে এবং যত পুণ্যের কাজ করবে, ততই তা তোমার জন্য কল্যাণকর হবে।

উল্লেখ্য, মৃত্যু কামনা নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি ঐ সময়ের জন্য প্রযোজ্য- যখন কোন ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে মৃত্যুকামনা করবে। তবে কেউ যদি নিজের ধর্মীয় ব্যাপারে আশঙ্কার কারণে মৃত্যু কামনা করে, সেক্ষেত্রে মৃত্যুকামনা করা তার জন্য বৈধ। যেমন, ফেরাউন যখন যাদুকরদের সত্য ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করেছিল এবং তাদেরকে হত্যা করার হুমকি দিয়েছিল, তখন যাদুকররা বলেছিল,

رَبَّنَآ اَفۡرِغۡ عَلَيۡنَا صَبۡرًا وَّتَوَفَّنَا مُسۡلِمِيۡنَ

আয় আল্লাহ, আমাদের ধৈর্যদান করুন এবং মুসলমানরূপে আমাদের মৃত্যু দিন।

অন্য এক হাদীসে এভাবে প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে, 'আয় আল্লাহ, যদি আপনার বান্দাদের বিভ্রান্তি ও গোলযোগে নিপতিত করার ইচ্ছে থাকে, তবে আমাকে বিভ্রান্তিতে নিপতিত না করে আপনার কাছে তুলে নিন।

এ সম্পর্কে অপর একটি হাদীস মুহাম্মদ বিন লাবীদ রা. হতে বর্ণিত, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'দুটি জিনিস আদম সন্তান পছন্দ করে না। ১. মৃত্যু, অথচ মুমিনদের জন্য ফেতনা

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

হতে মুক্তির জন্য মৃত্যুই হলো কল্যাণকর। ২. সম্পদের অপ্রতুলতা, অথচ সম্পদ স্বল্পতা পরকালীন হিসাব-নিকাশকে সহজতর করে দিবে।''

সুতরাং দীনদারীর ক্ষেত্রে ফেতনার প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে, মৃত্যুকামনা করা জায়েয আছে। এজন্য হযরত আলী রা. তার খিলাফতের শেষ জীবনে যখন দেখলেন, নেতৃত্বের সার্বিক ব্যাপারগুলো তার অনুকূলে আসছে না, তখন তিনি বললেন, 'আয় আল্লাহ, আমাকে আপনার কাছে তুলে নিন। আমি তাদের ব্যাপারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছি এবং তারাও আমার ব্যাপারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছে।'

তেমনিভাবে ইমাম বুখারী রহ.-এর শেষ জীবনে যখন ফেতনার আবির্ভাব হলো এবং খুরাসানের শাসনকর্তার সাথে বৈরিতা সৃষ্টি হলো, তখন তিনি বলেছিলেন, 'আয় আল্লাহ, আপনি আমাকে আপনার কাছে তুলে নিন।'

অনুরূপভাবে এক হাদীসে আছে, দাজ্জালের আবির্ভাবকালে মানুষ কবরের পাশ দিয়ে যাবে আর বলবে, হায়, এখানে যদি আমার সমাধি হত! কারণ, মানুষ তখন ফেতনা-ফাসাদ আর ভয়ংকর পরিস্থিতি দেখে অস্থির হয়ে পড়বে।

অতএব, সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় মারিয়াম 'আলাইহাস সালামের মৃত্যু কামনা অনভিপ্রেত ছিল না। কারণ, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, তার সম্ভাব্য সন্তান নিয়ে তাকে ভীষণ পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। কেউ তার এ ব্যাপার সহজে মেনে নিবে না এবং তার কথাকে বিশ্বাস করবে না। সমাজে একজন সতী-সাধ্বী ধর্মপ্রাণ মহীয়সী নারী হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার পর নতুন করে তাকে অপবাদের সম্মুখীন হতে হবে। এসব অপবাদ-ঘৃণ্যতা সয়ে নেওয়ার চেয়ে মৃত্যুর মতো কঠিন জিনিসটি তার কাছে শ্রেয় মনে হয়েছিল। সেজন্যই তিনি মৃত্যু কামনা করেছিলেন।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

মারিয়াম 'আলাইহাস সালামের এ দুর্দশার মুহূর্তে জিবরাইল 'আলাইহিস সালাম পাহাড়ের পাদদেশ হতে আহ্বান করে তাকে বললেন, আপনি দুঃখ করবেন না। আপনার পাদদেশে আল্লাহ তা'আলা একটি ঝর্না-নদী সৃষ্টি করেছেন। কেউ কেউ বলেন, আহ্বানকারী গর্ভস্থ শিশু 'ঈসা 'আলাইহিস সালাম ছিলেন।

এরপর জিবরাইল 'আলাইহিস সালাম বললেন, আপনি খেজুর গাছের কাণ্ড ধরে নিজের দিকে নাড়া দিন। গাছটি আপনাকে পাকা তাজা খেজুর দান করবে। খেজুরের মৌসুম না হওয়ায় বৃক্ষটি তখন বাহ্যত খেজুরশূন্য ছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানীতে বিনা মৌসুমেই সেই গাছ থেকে খেজুর পরলোঅ এরপর ফেরেশতা বললেন, সুতরাং আহার করুন, পান করুন চোখ শীতল করুন।

আমর বিন মায়মুন রহ. বলেন, গর্ভধারিণী মেয়েদের জন্য শুকনো তাজা খেজুরের চেয়ে উপকারী ও স্বাস্থ্যকর আর কিছু নেই। তা ছাড়া প্রসব বেদনায় পানি ও খেজুরের ব্যবহার চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও উপকারী।

এরপর ফেরেশতা বললেন, কারো সাথে যদি আপনার সাক্ষাত হয়, তখন তাকে ইঙ্গিতে বলে দিবেন, আমি দয়াময়ের উদ্দেশ্যে মৌনতা অবলম্বনের মান্নত করেছি। সুতরাং আজ আমি কিছুতেই কারো সাথে বাক্যালাপ করবো না। পূর্ববর্তী শরী'আতে নিয়ম ছিল, কেউ রোযা রাখলে তার জন্য আহার গ্রহণ নিষিদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি বাক্যালাপও নিষিদ্ধ ছিল।

অতঃপর আল্লাহর পক্ষ থেকে সংবাদ পেয়ে মারিয়াম 'আলাইহাস সালাম যখন নিশ্চিত হলেন, আল্লাহ তা'আলা তাকে দুর্নাম ও লাঞ্ছনা হতে রক্ষা করবেন, তখন তিনি নিজেই সদ্যজাত শিশুকে কোলে নিয়ে ঘরে ফিরলেন। তখন সমাজের লোকেরা মারিয়াম 'আলাইহাস সালামের সাথে নবজাতককে দেখে বিভিন্নভাবে তার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করতে লাগল। তারা বললো, মারিয়াম, তুমি তো এক অদ্ভুত কান্ড

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

ঘটিয়ে ফেলেছো। হে হারুন-ভগ্নী, তোমার পিতা তো অসৎ ছিলেন না এবং তোমার মাতাও অসতী ছিলেন না।

মারিয়াম ‘আলাইহাস সালাম মুসা ‘আলাইহিস সালামের ভাই হারুন ‘আলাইহিস সালামের বংশোদ্ভুত বলে তাকে এখানে হারুন-ভগ্নী বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

এ সম্পর্কে হযরত মুগীরা ইবনে শু‘বা রা. বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নাজরান এলাকায় পাঠালেন। তখন নাজরান অধিবাসীরা আমাকে বললো, يَٰٓأُخْتَ هَٰرُونَ আয়াত সম্পর্কে তোমরা কী বলো? মুসা ‘আলাইহিস সালাম তো ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের বহুকাল পূর্বে গত হয়ে গিয়েছেন। মুগীরা ইবনে শু‘বা রা. বলেন, আমি ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ব্যাপারটা বললাম। তখন তিনি বললেন, আমি কি তোমাদের বলিনি যে, তখনকার লোকেরা তাদের পূর্ববর্তী নবী ও পুণ্যবান লোকদের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করতেন?

হযরত কাতাদা রা. উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, কিছুলোক আছে- কল্যাণকামিতা ও ইবাদত-মুজাহাদায় যাদের পরিচিতি থাকে, তাদের পরবর্তী প্রজন্ম এ পরিচিতি নিয়েই বেড়ে উঠে। আবার কিছুলোক আছে, যাদের পরিচিতি হয় বিবাদ-বিসংবাদ আর অনাচার-অবিচারে, তাদের পরবর্তী প্রজন্ম এ পরিচিতি নিয়েই বেড়ে উঠে। হযরত মারিয়াম ‘আলাইহাস সালামও এমন অভিজাত পরিবারের কন্যা ছিলেন যে, হিতকামিতা ও পূতপবিত্রতায় তাদের প্রসিদ্ধি ছিল তুঙ্গে। অন্যায়-অপরাধের সাথে তাদের সামান্য সংস্পর্শও ছিল না।

সমাজের লোকেরা যখন মারিয়াম ‘আলাইহাস সালামের উপর ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করলো এবং এ কারণে তার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করতে লাগল, তখন তিনি নীরবতার রোযা রেখেছিলেন। তাই তিনি ইঙ্গিত করে সে কথা বুঝিয়ে নিজে উত্তর না দিয়ে তার শিশু

সন্তানের দিকে ইশারা করলেন, এ ব্যাপারে আমার শিশু সন্তানকে জিজ্ঞেস করুন। সে এ ব্যাপারে জবাব দিবে।

তারা ভাবলো, মেয়েটা আমাদের সাথে উপহাস করছে। তাই তারা বিস্মিত হয়ে বললো, তুমি আমাদের এই নবজাত শিশুর সাথে কথা বলতে বলছো? এ শিশু কী করে উত্তর দিবে?

এই সময় শিশু ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম মায়ের দুধ পান করছিলেন। লোকদের কথা শুনে তিনি স্তন থেকে মুখ সরিয়ে নেন এবং বাম পার্শ্বে ভর করে নিজের ছোট তর্জুনী আঙ্গুলটি কাঁধের দিকে বাড়িয়ে বলেন,

اِنِّیۡ عَبۡدُ اللّٰہِ ۟ؕ اٰتٰنِیَ الۡکِتٰبَ وَجَعَلَنِیۡ نَبِیًّا ○ وَّ جَعَلَنِیۡ مُبٰرَکًا اَیۡنَ مَا کُنۡتُ ۪ وَ اَوۡصٰنِیۡ بِالصَّلٰوۃِ وَالزَّکٰوۃِ مَا دُمۡتُ حَیًّا ○ وَّ بَرًّۢا بِوَالِدَتِیۡ ۫ وَلَمۡ یَجۡعَلۡنِیۡ جَبَّارًا شَقِیًّا ○ وَالسَّلٰمُ عَلَیَّ یَوۡمَ وُلِدۡتُّ وَیَوۡمَ اَمُوۡتُ وَیَوۡمَ اُبۡعَثُ حَیًّا

নিশ্চয় আমি আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী করেছেন। যেখানেই আমি থাকি না কেন, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। যতদিন আমি বেঁচে থাকবো, ততদিন আমাকে নামায এবং যাকাত আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর আমাকে আমার মাতার প্রতি অনুগত করেছেন। তিনি আমাকে উদ্ধত ও হতভাগ্য বানাননি। আমার প্রতি সালাম, যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন আমার মৃত্যু হবে এবং যেদিন আমি জীবিত অবস্থায় উত্থিত হবো।

শিশু ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের মুখে অলৌকিকভাবে জবাব শুনে কওমের লোকেরা আশ্চর্য হয়ে গেলো এবং এটাকে আল্লাহ তা‘আলার কুদরত মনে করলো।

কিন্তু কিছু মানুষ এই স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়ার পরও মারিয়াম ‘আলাইহাস সালামের প্রতি অপবাদ আরোপ করতে থাকলো। আর এ কারণে তারা আল্লাহ তা‘আলার লানতের মধ্যে পতিত হলো। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

TOP

Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com App Store

وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا

তারা লানতগ্রস্ত হয়েছিল তাদের কুফরীর জন্য এবং মারিয়ামের বিরুদ্ধে গুরুতর অপবাদ রটনার জন্য।

শ্রেষ্ঠত্বের আসনে মারিয়াম 'আলাইহাস সালাম

নিজ গোত্রের মানুষের এতসব অপবাদ-অভিযোগের উপর সীমাহীন ধৈর্য ধারণ করে হযরত মারিয়াম 'আলাইহাস সালাম মুজাহাদার ক্ষেত্রে এতটাই উন্নতি সাধন করেন যে, আসমানী দূত ফেরেশতাগণের সম্বোধনের মাহাত্ম্য লাভ করেন। ফেরেশতাগণ তাঁকে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ শোনান। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَٰٓئِكَةُ يَٰمَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَآءِ الْعَٰلَمِينَ ○

স্মরণ করুন, যখন ফেরেশতাগণ বলেছিলো, হে মারিয়াম, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে মনোনীত করেছেন এবং আপনাকে পবিত্র করেছেন। আর বিশ্বের নারীদের উপর আপনাকে মনোনীত করেছেন।

উল্লেখ্য, কেউ কেউ এই আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে বলেন, মারিয়াম 'আলাইহাস সালাম নবী ছিলেন। কিন্তু কাজী ইয়াজ রহ. জুমহুর উলামা-মাশায়েখের অভিমত উদ্ধৃত করে বলেন, 'মারিয়াম 'আলাইহাস সালাম নবী ছিলেন না।' তেমনি ইমাম নববী রহ. ইমামুল হারামাইন-সূত্রে উল্লেখ করেছেন, 'উলামায়ে উম্মতের সর্বসম্মত রায় হলো, মারিয়াম 'আলাইহাস সালাম নবী ছিলেন না।' অনুরূপভাবে হযরত হাসান বসরী রহ. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'মহিলা এবং জিন জাতির মাঝে কেউ নবী হননি।'

আল্লামা ইবনে কাসীর রহ.-ও বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরে এই মতকে গ্রহণযোগ্যরূপে ব্যক্ত করেছেন।

তবে উক্ত আয়াতের আলোকে ও হাদীস শরীফের বর্ণনার দ্বারা মারিয়াম 'আলাইহাস সালামের অনন্য শ্রেষ্ঠ মর্যাদার বিষয়টি অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়।

TOP

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

পৃথিবীর কয়েকজন শ্রেষ্ঠ নারী

হযরত আবু মুসা আশআরী রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জ্ঞান-বুদ্ধি ও ঈমান-আমলে অনেক পুরুষ পরিপূর্ণতা অর্জন করেছে। তবে নারীদের মাঝে একমাত্র ফেরাউন-পত্নী আসিয়া আলাইহাস সালাম ও ইমরান-কন্যা মারিয়াম ‘আলাইহাস সালাম ব্যতীত আর কেউ পূর্ণতা অর্জন করতে পারেনি। আর নারীদের উপর আয়েশা রা.-এর শ্রেষ্ঠত্ব যাবতীয় আহার্য উপাদানের উপর সারিদ (গোশত-ব্যঞ্জনসহযোগে প্রস্তুতকৃত রুটি)-এর ন্যায়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে তিনি অনন্য।

হযরত আনাস রা.-এর অপর এক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এই পৃথিবীর নারীসমাজের মর্যাদার জন্য ইমরান-কন্যা মারিয়াম ‘আলাইহাস সালাম, খুয়াইলিদ-কন্যা খাদিজা, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা ফাতেমা ও ফেরাউন-পত্নী আসিয়াই যথেষ্ট।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাটিতে চারটি রেখা তৈরি করলেন। এরপর সাহাবীদের বললেন, ‘তোমরা কি জানো, এগুলো কী?’ সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ ও তার রাসূলই ভালো জানেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, জান্নাতী নারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হলেন, খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ, ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম), আসিয়া বিনতে মুযাহিম এবং মারিয়াম বিনতে ইমরান আলাইহাস সালাম।

হযরত আবু সায়িদ খুদরী রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হাসান ও হুসাইন জান্নাতী যুবকদের অবিসংবাদিত নেতা আর ফাতেমা হলো জান্নাতী নারীদের

অবিসংবাদিত নেত্রী। তবে মারিয়াম ‘আলাইহাস সালামের ব্যাপারটি ব্যতিক্রম।

এসকল আয়াত ও হাদীস একত্র করলে পৃথিবীর নারীদের মধ্যে ছয়জন নারীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়।

১. হাউওয়া আলাইহাস সালাম।
২. সারা আলাইহাস সালাম।
৩. হাজেরা আলাইহাস সালাম।
৪. মুসা ‘আলাইহিস সালামের আম্মা ইউখান্দ আলাইহাস সালাম।
৫. আসিয়া আলাইহাস সালাম ।
৬. মারিয়াম ‘আলাইহাস সালাম।

নারীদের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের বর্ণনাগুলো পরস্পর সাংঘর্ষিক নয়। কারণ, প্রত্যেকের শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারটি তাদের যুগ-সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। তাই তাদের কারো ব্যাপারে শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা হয়ে থাকলে সেটা উম্মতে মুহাম্মদীর শ্রেষ্ঠ নারীদের মর্যাদার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক নয়।

সমাপ্ত

হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম

মুফতী মনসূরুল হক

মাকতাবাতুল মানসূর
www.darsemansoor.com
www.islamijindegi.com

GET IT ON Google Play
Download From App Store

সূচীপত্র

কুরআন ও হাদীসে হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম

পূর্ববর্তী কিতাবে ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী

হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের জন্ম

‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের ব্যাপারে শয়তানের ধোঁকা

শিশু ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের নবী হওয়ার ঘোষণা

‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের কৈশোর

‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের নবুওয়্যাত লাভ

ইহুদীদের ধর্ম বিকৃতি

‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের মুজিযা

মুজিযা ও যাদুর পার্থক্য

মানুষের তৈরি ও স্রষ্টার সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য

মুজিযা ভ্রান্তির মাধ্যম নয়

‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের পাঁচ মুজিযা

মুজিযা অস্বীকার করা কুফরী

দীনের প্রতি ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের দাওয়াত

হাওয়ারী শব্দের ব্যাখ্যা

‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের হাওয়ারী

নুযুলে মায়িদার ঘটনা

‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামকে হত্যার অপচেষ্টা

এ ব্যাপারে ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের ভ্রান্তি

কিয়ামতের পূর্বে ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের অবতরণ

‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের অবতরণের প্রেক্ষাপট

‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের অবতরণের প্রকৃতি
‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের অবতরণকালীন অবস্থা
অবতরণের পর ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের জীবনযাপন
‘ঈসা আ. এর বিবাহ ও দাম্পত্যজীবন
পৃথিবীতে অবতরণের পর ‘ঈসা আ. কী করবেন
‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের আবির্ভাবকালীন বরকত
ইয়াজুজ ও মাজুজের আবির্ভাব এবং ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের তুর পর্বতে অবস্থান গ্রহণ
‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের পুনরায় আগমনের হেকমত
‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের ইন্তেকাল এবং রাসূলুল্লাহর রওযার পাশে তার দাফন
পরিশিষ্ট
হযরত ‘ঈসা আ.এর হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হঠকারী ইয়াহুদী জাতি
অপরাধ ও চিরস্থায়ী লাঞ্ছনার ইতিহাস
ইয়াহুদীদের নামকরণ
ইয়াহুদীরা কেনো লাঞ্ছনা এবং নির্যাতনের উপযুক্ত?!
১. মিথ্যাবাদিতা
২. আল্লাহর শানে বেয়াদবী!
৩. হিংসা
৪. অত্যাধিক দুনিয়াপ্রীতি
৫. অত্যাধিক কৃপণতা
৬. বিশ্বাসঘাতক
৭. দুষ্কৃতি এবং নৈরাজ্যসৃষ্টি
তাওরাতের বিকৃতি সাধন
৮. আল্লাহর নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা

৯. মিথ্যা এবং অন্যায় দাবি
১০. সত্যগ্রহণে হঠকারিতা
১১. নবীগণের সত্যের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান এবং হত্যা প্রচেষ্টা
হযরত ‘ঈসা আ. এর ব্যাপারে ইয়াহুদীদের হঠকারীতা
হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ব্যাপারে ইয়াহুদীদের হঠকারীতা
অবাধ্য ও হঠকারী ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের শাস্তি
ইয়াহুদীদের শাস্তি ১: বানর এবং শুকরে পরিণত হওয়া
ইয়াহুদীদের শাস্তি ২: তীহ প্রান্তরে আটকে থাকা
ইয়াহুদীদের শাস্তি ৩: অন্তরের কঠোরতা
ইয়াহুদীদের শাস্তি ৪ : শতধাবিভক্ত ইয়াহুদী জাতি
ইয়াহুদীদের শাস্তি ৫ : লাঞ্ছিত, নির্যাতিত এবং নিপীড়িত হওয়া
‘ঈসা আ.এর উর্ধ্বারোহনের পর ইয়াহুদী জাতির লাঞ্ছনার প্রথম পর্ব ৭০-১৩৫ খৃষ্টাব্দ
রোমান সম্রাট টাইটাস (Titus) এর ধ্বংসলীলা: ৭০ খৃষ্টাব্দ
রোমান সম্রাট হেডরিয়ান Hadrian (১১৭-১৩৮ CE) এর আগ্রাসন: ১৩৫ খৃষ্টাব্দ।
ইয়াহুদীদের ব্যর্থ স্বাধীনতা প্রচেষ্টা
লাঞ্ছনার দ্বিতীয় পর্ব : ২য় হিজরী-২৩ হিজরী
বনু কাইনুকা’র বহিস্কৃতি: শাওয়াল, দ্বিতীয় হিজরী
বনু নাযীরের বহিস্কৃতি: চতুর্থ হিজরী, (গাযওয়ায়ে বীরে মাঊনার পরে)
বনু কুরাইযার এর বহিস্কৃতি: পঞ্চম হিজরী (গযওয়ায়ে আহযাবের পরে)
ইয়াহুদীমুক্ত মদীনা: সপ্তম হিজরীর পর
ইয়াহুদীমুক্ত হিজাযের পবিত্র ভূমি
লাঞ্ছনার তৃতীয় পর্ব: খৃষ্ট্রীয় দ্বিতীয় সহস্রাব্দ
লাঞ্ছনার আরো একটি পর্ব: কেয়ামতের পূর্বে ইয়াহুদী জাতি আরো একটি গণহত্যার অপেক্ষায়!!

বর্তমান সময়ে প্রতিষ্ঠিত 'ইসরাইল রাষ্ট্র'
কওমে সাবার প্রতি আল্লাহর নাফরমানীর ভয়াবহ শাস্তি
কওমে সাবার পরিচয়
সাবাবাসীর প্রতি দীনের দাওয়াত
সাবাবাসীর দীন বিমুখতা
সাবাবাসীর উপর আল্লাহর আযাব
ঘটনা থেকে শিক্ষা
আসহাবুল উখদুদের ঘটনা
আসহাবুল উখদুদের ঘটনা থেকে শিক্ষা

باسمه تعالى

হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের জীবনবৃত্তান্ত

কুরআন ও হাদীসে হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম

হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম ছিলেন উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন পয়গাম্বর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন সর্বশেষ নবী ও রাসূল, তেমনি হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম বনী ইসরাইলের মধ্যে সর্বশেষ নবী।

হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের আলোচনা কুরআনে কারীমের সর্বমোট তেরটি সূরায় করা হয়েছে। এগুলোর কোথাও তাকে ‘ঈসা নামে, কোথাও মাসীহ বা আবদুল্লাহ উপাধিতে, আবার কোথাও মারিয়াম-তনয় উপনামে উল্লেখ করা হয়েছে।

‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের পর হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত কোন নবী বা রাসূল দুনিয়াতে আগমন করেননি। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

اَنَا اَوْلَى النَّاسِ بِعِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ لِاَنَّه لَمْ يَكُنْ بَيْنِيْ وَبَيْنَه نَبِيٌّ وَاِنَّه نَازِلٌ

আমি মারিয়াম তনয় ‘ঈসার অতি ঘনিষ্ট। কেননা, আমার ও তার মধ্যবর্তী সময়ে কোন নবীর আগমন ঘটেনি এবং তিনি (পরবর্তীকালে) পুনরায় দুনিয়াতে আগমন করবেন। (বুখারী, ৪:৩৪৩; মুসলিম, ২:১৮৯)

হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের উচ্চমর্যাদা ও সুমহান ব্যক্তিত্বের নিদর্শন হলো, হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালাম যেমন বনী ইসরাইলের মধ্য থেকে নবুওয়্যাত ও রিসালাতের ইমামতের মাকামে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তেমনি ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম ছিলেন নবুওয়্যাত ও রিসালাতের ক্ষেত্রে মুজাদ্দিদের ভূমিকায়। কেননা, তাওরাতের পর ইঞ্জিলের তুলনায় অধিক মর্যাদাসম্পন্ন কোন কিতাব অবতীর্ণ হয়নি।

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

আর এটা বাস্তব সত্য যে, ইনজিল নাযিল হয়ে তাওরাতের বিধানাবলিকে পূর্ণতা দান করেছে। অর্থাৎ তাওরাত নাযিল হওয়ার পর ইহুদীরা দীনের মধ্যে যেসব গোমরাহী ও কুসংস্কারের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিল, ইনজিল অবতীর্ণ হয়ে তাদের সেসব ভ্রান্তি হতে বেঁচে থাকার প্রতি আহ্বান জানিয়েছে এবং তাওরাতের পরিপূরক হিসেবে দায়িত্ব আনজাম দিয়েছে। আর মুসা ‘আলাইহিস সালামের হেদায়েতের বাণী, যা ইহুদীরা বেমালুম ভুলে গিয়েছিল, ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম আগমন করে তাদের সেগুলোর ব্যাপারে সজাগ করেছিলেন।

তা ছাড়া হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম ছিলেন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে সর্বশ্রেষ্ঠ ঘোষক ও সুসংবাদ প্রদানকারী। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

وَاِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَاْتِيْ مِن بَعْدِ اسْمُهُ اَحْمَدُ

(হে নবী, স্মরণ করুন,) যখন মারিয়াম তনয় ‘ঈসা বলেছিলেন, হে বনী ইসরাইল, আমি অবশ্যই তোমাদের নিকট প্রেরিত আল্লাহর রাসূল আর আমার পূর্ব থেকে তোমাদের নিকট যে তাওরাত রয়েছে তার প্রত্যায়নকারী এবং একজন রাসুলের আগমনের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আসবেন, যার নাম হবে ‘আহমাদ’। (সূরা সফ, আয়াত:৬)

কুরআনে কারীমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীনের সাদৃশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে যেসকল মর্যাদাবান ব্যক্তির ‘আদর্শের আলোচনা করা হয়েছে, তাদের মধ্যে হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম, হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালাম এবং হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম উল্লেখযোগ্য। হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের ‘আদর্শের বর্ণনা এজন্য গুরুত্বপূর্ণ, হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ধর্মের প্রচার ও প্রসারের কেন্দ্রবিন্দু, তা

TOP

'মিল্লাতে ইবরাহীম' নামে অভিহিত। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

مِّلَّةَ اَبِيۡكُمۡ اِبۡرٰهِيۡمَ هُوَ سَمّٰكُمُ الۡمُسۡلِمِيۡنَ

ইসলাম তোমাদের পিতা ইবরাহীমের ধর্ম এবং তিনি তোমাদের মুসলমান নাম প্রদান করেছেন। (সূরা হজ্জ, আয়াত:৭৮)

তেমনি ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম হলেন সেই বয়োজ্যেষ্ঠ পয়গাম্বর, যিনি শিরকের মোকাবেলায় তাওহিদে ইলাহীকে হানিফী ধর্ম উপাধিতে ভূষিত করেছেন এবং পরবর্তীকালে যারা সত্যের অনুসারী হবে, তাদের জন্য মিল্লাতে হানীফা নামে বৈশিষ্ট্য কায়েম করেছেন। অর্থাৎ তিনি আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের ক্ষেত্রে এমন আদর্শ উপস্থাপন করেছেন, ভবিষ্যতে সত্য ধর্মের জন্য তার অনুসরণ মাপকাঠিরূপে গণ্য হয়ে গিয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলা তাকে এ পরিমাণ কবুল করেছিলেন যে, তিনি হেদায়েতের ইমাম হয়ে গিয়েছেন। এসম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

فَاتَّبِعُوۡا مِلَّةَ اِبۡرٰهِيۡمَ حَنِيۡفًا وَمَا كَانَ مِنَ الۡمُشۡرِكِيۡنَ

সুতরাং তোমরা একনিষ্ঠভাবে মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসরণ কর আর তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত:৯৫)

অনুরূপ হযরত মুসা 'আলাইহিস সালামের আলোচনা এজন্য গুরুত্ব রাখে যে, স্বীয় জাতির মূর্খতা, নাফরমানী, আল্লাহর দুশমনদের পক্ষ হতে অগ্নিপরীক্ষা ও অবিরত দুঃখ-কষ্টের বিপরীতে তাঁর ধৈর্যধারণ উম্মতের জন্য আদর্শ হয়ে রয়েছে। এসব ক্ষেত্রে মুসা 'আলাইহিস সালাম ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে সামঞ্জস্য পাওয়া যায়।

উল্লিখিত বৈশিষ্টের কারণেই হযরত 'ঈসা 'আলাইহিস সালামের জীবনীর আলোচনাও গুরুত্বপূর্ণ। এজন্যই পবিত্র কুরআনে তার জীবনী বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। আর এর ভূমিকাস্বরূপ তার মা

TOP

হযরত মারিয়াম ও তার প্রতিপালনকারী হযরত যাকারিয়া এবং ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের আগমনের সুসংবাদদাতারূপে আগমনকারী হযরত ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালামের কথা আলোচিত হয়েছে।

হযরত ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালাম যে ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের আগমনের সুসংবাদদাতা ছিলেন, তার বর্ণনা কুরআনে এভাবে এসেছে,

فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّيْ فِي الْمِحْرَابِ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَحَصُوْرًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ○

ফেরেশতারা হযরত যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালামকে সেসময় আহ্বান করলো যখন তিনি কুঠুরিতে নামাযরত ছিলেন। আল্লাহ তা‘আলা আপনাকে ইয়াহইয়ার সুসংবাদ দিচ্ছেন, যিনি আল্লাহর কালেমা ‘ঈসা সম্পর্কে সত্যায়ন করবেন। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত:৩৯)

উক্ত আয়াতে كلمة (কালেমা) শব্দ দ্বারা হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম উদ্দেশ্য। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রহ. তার তাফসীরগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, জমহুর আলেমের মত অনুসারে كلمة (কালেমা) দ্বারা হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম উদ্দেশ্য। (তাফসীরে কাবীর, ৮:৩৫)

হযরত ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালামের জন্ম হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের আগেই হয়েছিলো। তবে তিনি ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম থেকে কতটুকু বড় ছিলেন, তা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না।

পরবর্তীকালে ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামকে উঠিয়ে নেওয়ার আগে হযরত ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালামকে অস্বীকারকারীরা শহীদ করে দেয়।

সূত্র:

قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب وهو يقتضي أنه قتل بدمشق وأن قصة بخت نصر كانت بعد المسيح (٢) كما قاله عطاء والحسن البصرى فالله أعلم. البداية والنهاية ط إحياء التراث(٢/٦٥)

তবে ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালাম ও তার পিতা যাকারিয়া আলইহিস সালামের শাহাদাতের ব্যাপারে ভিত্তিহীন একটি ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে, এ বিষয়ে তাঁদের জীবনীতে পাঠক অবগত হয়েছেন।

পূর্ববর্তী কিতাবে ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আল্লাহপ্রদত্ত দীনের দাওয়াত ও তাবলীগের ধারা যদিও হযরত আদম ‘আলাইহিস সালাম থেকে শুরু হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে চলে এসেছে। কিন্তু এ ধারা বিশেষভাবে শক্তিশালী ও কার্যকর করার লক্ষ্যে আল্লাহ তা‘আলা কয়েক শতাব্দী পর পর এমন একজন উচ্চ মনোবল সম্পন্ন সুমহান মর্যাদার অধিকারী পয়গাম্বরকে পাঠাতেন, যিনি কালের ঘূর্ণাবর্তে সৃষ্ট আত্মিক শৈথিল্য দূর করে সত্য গ্রহণের নিভুপ্রায় আগ্রহ পুনরায় প্রোজ্জ্বল করে তোলতেন এবং রুহানী দুর্বল অবস্থাসমূহ সবল থেকে সবলতর করে দিতেন, যা দেখে মনে হত, ধর্মের ঘুমন্ত জগতে হক ও হক্কানিয়াত এবং সত্য ও সততার শিঙ্গা ফুঁকে এক মহাবিপ্লবের জন্ম দিয়ে মৃত অন্তরসমূহে নব প্রাণের সঞ্চার করা হয়েছে।

যে জাতি ও উম্মতের মাঝে সেই মর্যাদাবান নবীর আবির্ভাব হতো, বহু শতাব্দী পূর্ব হতে সে উম্মতের নবীগণ উক্ত মর্যাদাবান নবীর আগমনের সুসংবাদ আল্লাহর ওহীর মাধ্যমে কওমকে জানিয়ে দিতেন। যেন সত্যের দাওয়াতের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং যখন সেই নূর উদ্ভাসিত হওয়ার সময় হবে, তখন উম্মতের জন্য তার আকস্মিক আগমন অনাহূত ও অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যাপার না হয়ে যায়।

হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামও সেই দৃঢ় মনোবল ও সুমহান মর্যাদার অধিকারী নবীগণের অন্যতম।

এ কারণেই দেখা যায় যে, বনী ইসরাইলের অনেক নবী তার আগমনের সুসংবাদ দিয়েছেন। আর এ সুসংবাদের ভিত্তিতে বনী ইসরাইল প্রতিশ্রুত ‘ঈসার আবির্ভাবের প্রতীক্ষায় ছিল, যেন তার আবির্ভাবের পর পুনরায় তারা হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের

যামানার ন্যায় সমুদয় জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে বিশিষ্ট ও সম্মানিত হতে পারে এবং হেদায়েতের শুষ্ক ক্ষেত্রে সজীবতা ফিরে আসে আর আল্লাহর মহিমা ও মাহাত্ম্য দ্বারা তাদের অন্তর সমুজ্জ্বল হয়ে উঠে। সেজন্যই শব্দগত ও অর্থগত বিকৃতির শিকার হওয়ার পরও বর্তমান বাইবেলে হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের আগমনের সুসংবাদগুলো রয়ে গেছে।

সেই তাওরাতের বিবরণে উল্লেখ আছে, ‘মুসা ‘আলাইহিস সালাম বলেছেন, আল্লাহ তা‘আলা সাইনা হতে আগমন করেছেন, সায়ির থেকে উদিত হয়েছেন এবং ফারানের পর্বতমালা হতে আলোকিত হয়েছে। এখানে সাইনা হতে আল্লাহ তা‘আলার আগমন দ্বারা হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের নবুওয়্যাত লাভের প্রতি এবং সায়ির হতে উদিত হওয়ার দ্বারা হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা, হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম সায়ির পাহাড়ের একটি টিলা ‘বাইতু লাহমে’ জন্মলাভ করেন। আর ফারানের পর্বতমালা হতে আলোকিত হওয়ার দ্বারা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা, ফারান হলো হেজাযের প্রসিদ্ধ পাহাড় সারির নাম। (তাওরাত, অধ্যায়:৩৩ পদ:২০)

হযরত ইয়াস‘আ ‘আলাইহিস সালামের সহীফায় বর্ণিত আছে, ‘দেখ, আমি তোমার পরে একজন পয়গাম্বর পাঠাচ্ছি, যিনি তোমার রাস্তা প্রস্তুত করবেন। ময়দানে এক আহ্বানকারীর ধ্বনি ভেসে এলো, ‘আল্লাহর রাস্তা প্রস্তুত করো, তার রাস্তা সোজা-সরল করো’। এ সুসংবাদে ‘পয়গাম্বর’ শব্দ দিয়ে হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামকে এবং ‘ময়দানে আহ্বানকারী’ বলে হযরত ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালামকে বুঝানো হয়েছে। হযরত ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালাম হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের আগমনের সংবাদ ঘোষণা করতেন

এবং তার নবুওয়্যাতের সুসংবাদ শুনাতেন। (তাওরাত, অধ্যায়:৪০ পদ:৩-৮)

তেমনিভাবে ইউহান্নার ইঞ্জিলে বর্ণিত রয়েছে, যখন ইহুদীরা জেরুজালেম হতে কাহেন আনলো ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালামকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করার জন্য যে, ‘আপনি কে’ তখন তিনি অকপটে স্বীকার করলেন, আমি প্রতিশ্রুত মাসীহ নই। তারা জিজ্ঞেস করলো, আপনি কে? আপনি কি ইলিয়া? তিনি বললেন, আমি ইলিয়া নই। তারা বললো, তবে কি আপনি সেই প্রতিশ্রুত নবী? তিনি ‘না’ বললেন। অবশেষে তারা প্রশ্ন করলো, তা হলে আপনি কে? আপনি আমাদের জানান, যাতে আমরা সেসব লোককে আপনার ব্যাপারে বলতে পারি, যারা আমাদের পাঠিয়েছে এ কথা জানার জন্য যে, আপনি নিজের ব্যাপারে কী বলেন? তিনি বললেন, আমি তো সেই ব্যক্তি, যেমন, হযরত ইয়াস‘আ ‘আলাইহিস সালাম বলেছেন অর্থাৎ ময়দানে আহ্বানকারীর আওয়াজ এলো, তোমরা খোদার রাস্তা তৈরি করো। (অধ্যায়:১ পদ:১৯-২৩)

মার্ক ও লুকের ইঞ্জিলে বর্ণিত আছে, তারা সবাই প্রতীক্ষা করছিল এবং দিলে দিলে ভাবছিল, ইউহান্না সেই প্রতিশ্রুত মাসীহ কি না? তখন ইউহান্না সবার জবাবে বললেন, আমি তো তোমাদের যাজকনিদর্শন দিচ্ছি, তবে যিনি আমার চেয়ে অধিক মর্যাদাবান, তিনি অচিরেই আগমন করবেন। আমি তো তার জুতোর ফিতা খোলারও যোগ্য নই। তিনি তোমাদের রুহুল কুদস থেকে যাজকনিদর্শন দিবেন। (লক্কার ইঞ্জীল, বাব:২, আয়াত, ১৫-১৬)

উভয় সুসংবাদ হতে বুঝা যায়, ইহুদীরা তাদের ধর্মীয় বর্ণনানুসারে হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের প্রতীক্ষায় ছিলো। আর হযরত ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালাম তার আগমনের সুসংবাদ দানকারী ছিলেন।

হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের জন্ম

হযরত যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালাম মারিয়াম ‘আলাইহাস সালামের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর বায়তুল মুকাদ্দাসের এক কোণে তার জন্য একটি কুঠুরি তৈরি করে দেন। সেখানে হযরত মারিয়াম ও হযরত যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালাম ব্যতীত অন্য কারো প্রবেশের অনুমতি ছিল না। মারিয়াম ‘আলাইহাস সালাম সেই কক্ষে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকতেন।

এ সময়েই একদিন আল্লাহ প্রেরিত ফেরেশতা মানুষের আকৃতিতে এসে তাঁকে একজন পবিত্র সন্তানের সুসংবাদ প্রদান করেন। মারিয়াম ‘আলাইহাস সালাম এ কথা শুনে খুবই বিস্মিত হন। ফেরেশতা তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে অভয়বাণী শুনায়।

এরপর সেই ফেরেশতা আল্লাহর পক্ষ থেকে রুহ ফুঁকে দিলে তিনি গর্ভবতী হয়ে যান। প্রসবকাল যখন নিকটবর্তী হয়, দুর্নাম ও মিথ্যা অপবাদের ভয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং বায়তুল মুকাদ্দাস হতে প্রায় নয় মাইল দূরে সায়ির পর্বতের একটি টিলায় আশ্রয় নেন।

হযরত মারিয়াম যখন গর্ভবতী হন, তখন তার বয়স কত ছিল, এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কারো মতে, তখন তারা বয়স বারো বছর ছিল। কারো মতে, দশ বছর ছিল। আবার কারো মত হচ্ছে, তখন তার বয়স হয়েছিল বিশ বছর। (তাফসীরে কাবীর, ২১ খণ্ড, ১৮৪)

হযরত মারিয়াম ‘আলাইহাস সালামের জীবনবৃত্তান্ত এই গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। এসব ঘটনা সংশ্লিষ্ট কুরআনের বিভিন্ন আয়াতও সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইমাম নাসায়ী রহ. বর্ণনা করেন, হযরত আনাস রা. থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত আছে, যে খেজুর গাছের নিচে মারিয়াম আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেই জায়গাটির নাম ‘বায়তু লাহাম’। জনৈক রোমান বাদশা এই স্মৃতি রক্ষার জন্য এখানে একটি সৌধ নির্মাণ করেন। হাদীসটি ইমাম

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

বায়হাকী রহ. উল্লেখ করেছেন এবং সহীহ বলে বর্ণনা করেছেন। (কাসাসুল আম্বিয়া, ৪৪৫ পৃষ্ঠা)

সেখানেই মারিয়াম 'আলাইহাস সালাম 'ঈসা 'আলাইহিস সালামকে প্রসব করেন। আল্লাহ তা'আলা সেখানে মারিয়াম আলাইহাস সালামের জন্য একটি নহর জারী করে দেন এবং বিনা মৌসুমে তাজা খেজুরের ব্যবস্থা করে দেন।

'ঈসা 'আলাইহিস সালামের ব্যাপারে শয়তানের ধোঁকা

একটি ইসরাঈলী রেওয়ায়েতে বর্ণনা অনুযায়ী, হযরত 'ঈসা 'আলাইহিস সালামের জন্মের পর সমস্ত মূর্তি তার দিকে সিজদাবনত হয়। এ অবস্থা দেখে ইবলীস ঘাবড়ে যায়। সে নানান দিকে খোঁজাখুঁজি করে কোন কিছু দেখতে পেল না- পূর্ব দিকেও না, পশ্চিম দিকেও না। তখন সে ব্যর্থ মনে ঘুরছিল। এমন সময় হঠাৎ দেখতে পেল, একটি খেজুর গাছের নিচে একজন মহিলা একটা বাচ্চা কোলে নিয়ে বসে আছেন। আর ফেরেশতাগণ তাদের বেষ্টন করে রেখেছেন এবং বলাবলি করছেন, একজন নবী পিতা ছাড়া জন্মলাভ করেছেন। এ কথা শুনে ইবলীস ঘাবড়ে গেল এবং মনে মনে বললো, নিশ্চয় এখানেই সেই ঘটনা ঘটেছে। অতঃপর ইবলীস কসম খেয়ে বললো, এর দ্বারা আমি অনেককে বিভ্রান্ত করবো। সেমতে পরবর্তীকালে ইবলীস ইহুদীদের গোমরাহ করেছে। ইহুদীরা 'ঈসা 'আলাইহিস সালামকে 'নাউযুবিল্লাহ' জারজ সন্তান বলে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করেছে। আর খ্রিস্টানদের ভ্রষ্ট করেছে এভাবে যে, তারা বলেছে, 'ঈসা 'আলাইহিস সালাম আল্লাহর পুত্র।

অপরদিকে হযরত 'ঈসা 'আলাইহিস সালামের জন্মের অলৌকিকতা হলো, ইবলীস বলতে লাগলো, প্রত্যেক মহিলাই গর্ভবতী হয়েছে আমার সামনে এবং সন্তান প্রসব করেছে আমার হাতের তালুতে। কিন্তু এ সন্তানের ব্যাপারে আমি জানি না। গর্ভের সময়ও না এবং প্রসবের সময়ও না। (দুররে মানসূর, ৫:৪৩৬)

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের জন্মের পর ইবলীস তার ব্যাপারে অপপ্রচার করে জনমনে বিভ্রান্তি ছাড়ানোর জন্য মারিয়াম ‘আলাইহাস সালামের গর্ভে তার পিতা ছাড়া জন্ম লাভের সংবাদ সবার মাঝে ছড়িয়ে দিলো। এ সংবাদ শুনে বনী ইসরাইল সম্প্রদায় মারিয়ামকে খোঁজা আরম্ভ করলো। তারা তাকে খুঁজতে বায়তুল মুকাদ্দাসে গেলো। সেখানে তারা তার ব্যাপারে ইউসুফ নাজ্জারকে জিজ্ঞাসা করলো, যিনি মারিয়ামের সাথে বায়তুল মুকাদ্দাসের খেদমত করতেন। তিনি উত্তর দিলেন, আমি জানি না। তবে তার কক্ষের চাবি হযরত যাকারিয়ার কাছে আছে। তারা যাকারিয়া ‘আলাইহিস সালাম থেকে চাবি এনে দরজা খুললো এবং তাকে কক্ষে তালাশ করলো। সেখানে যখন তাকে পেলো না, তখন তারা ইউসুফকে অপবাদ দিল। এমন সময় এক ব্যক্তি বললো, আমি তাকে অমুক জায়গায় দেখেছি। এ কথা শুনে তারা সেদিকে এগিয়ে গেল। (দুররে মানসূর, ৫:৪৩৭)

অন্য এক বর্ণনায় আছে, মারিয়াম ‘আলাইহাস সালাম কিছুটা সুস্থতা অনুভব করলেন এবং সন্তান কোলে নিয়ে বসলেন। এ দিকে তার সম্প্রদায় তার খোঁজে বের হয়ে একজন রাখালকে জিজ্ঞাসা করলো, তুমি কি অমুককে দেখেছো? রাখাল বললো, না। তবে আমি একদিন রাত্রে আমার গরুর মধ্যে এমন একটি বিষয় দেখেছি, যা পূর্বে কখনো দেখেনি। আমি দেখেছি, গরুটি এই উপত্যকার দিকে সিজদা করছে। তখন তারা সেদিকে এগিয়ে গেল। (দুররে মানসূর, ৫:৪৩৯)

সে সময় মারিয়াম ‘আলাইহাস সালাম চল্লিশ দিন পর নিফাস থেকে পবিত্র হলেন এবং সন্তানকে কোলে নিয়ে বের হয়ে এলেন। পথিমধ্যে সম্প্রদায়ের লোকদের সাথে তার দেখা হলো। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

فَأَتَتْ بِهِۦ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُۥ

অতঃপর মারিয়াম সন্তানকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত হলেন। (সূরা মারিয়াম, আয়াত ২৭)

TOP

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

সম্প্রদায়ের লোকেরা মারিয়ামের কোলে বাচ্চা দেখে বিস্ময়ভরা বদনে এগিয়ে এলো এবং তাকে এ ব্যাপারে অপবাদ দিয়ে ভর্ৎসনা করতে লাগলো। এভাবে তারা হযরত মারিয়ামের প্রতি অপবাদ আরোপ করলেন। তারা মারিয়াম ‘আলাইহাস সালামের পবিত্র ও নিষ্কলুষ চরিত্রকে কলুষিত করার জন্য উঠে পড়ে লাগলো।

শিশু ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের নবী হওয়ার ঘোষণা

এ অবস্থায় মারিয়াম ‘আলাইহাস সালাম অত্যন্ত অসহায় হয়ে পড়লেন। তিনি নিজে কথাগুলো কাউকে বুঝাতে পারছেন না। কেননা, আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশে তিনি আজ কোন মানুষের সাথে কথা না বলার সাওমের মান্নত করেছেন। আর নির্জনে গিয়ে যে তিনি আশ্রয় নিবেন, সে পরিস্থিতিও নেই। সবাই তাকে ঘিরে ধরেছে। তবে এ অবস্থায় তিনি বিচলিত হলেন না। ফেরেশতার বাণীর মাধ্যমে আল্লাহর উপর তার তাওয়াক্কুল ও ভরসা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। তার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে, নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা তাকে এ অপবাদ থেকে মুক্ত করে তার পবিত্রতা সবার সামনে সুস্পষ্ট করে দিবেন। এ আত্মবিশ্বাস ও তাওয়াক্কুল নিয়ে তিনি প্রথমত ফেরেশতার বাতলানো নির্দেশনা অনুযায়ী নিজের কথা না বলার রোযার মান্নতের কথা সম্প্রদায়ের লোকদের ইশারায় বুঝালেন। এরপর তিনি শিশু ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের দিকে হাত দ্বারা ইঙ্গিত করলেন। অর্থাৎ এ শিশু সন্তানের সাথে আপনার কথা বলুন। এ সন্তানই আপনাদের প্রশ্নের জবাব দিয়ে দেবে।

তখন লোকেরা বললো, আমরা তার সাথে কেমন করে কথা বলবো? সে তো কোলের শিশু! তুমি কি আমাদের সাথে ঠাট্টা করছো? এমন সময় দুধের শিশু ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম বলে উঠলেন,

TOP

اِنِّيْ عَبْدُ اللّٰهِ ۟ اٰتٰنِيَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِيْ نَبِيًّا ۝ وَّ جَعَلَنِيْ مُبٰرَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ ۠ وَ اَوْصٰنِيْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۝ وَّ بَرًّا بِوَالِدَتِيْ ۫ وَلَمْ يَجْعَلْنِيْ جَبَّارًا شَقِيًّا ۝ وَالسَّلٰمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُّ وَيَوْمَ اَمُوْتُ وَيَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا۝

নিশ্চয় আমি আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী করেছেন। যেখানেই আমি থাকি না কেন, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। যতদিন আমি বেঁচে থাকবো, ততদিন আমাকে নামায এবং যাকাত আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর আমাকে আমার মাতার প্রতি অনুগত করেছেন। তিনি আমাকে উদ্ধত ও হতভাগ্য বানাননি। আমার প্রতি সালাম, যেদিন আমি জন্ম গ্রহণ করেছি, যেদিন আমার মৃত্যু হবে এবং যেদিন আমি জীবিত অবস্থায় উত্থিত হবো। (সূরা মারিয়াম, আয়াত, ৩০-৩৩)

‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের কৈশোর

পবিত্র কুরআনে হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের শৈশবের কথাই শুধু বর্ণনা করা হয়েছে। তার কৈশোরের কোন ঘটনা কুরআন শরীফে আলোচিত হয়নি। তাই বিভিন্ন ইসরাঈলী রেওয়ায়েতের আলোকে নিম্নে কিছু বিষয় উল্লেখ করা হলো।

ইসরাঈলী রেওয়ায়েতের বিখ্যাত বর্ণনাকারী ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ রহ. থেকে যে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে এবং যার বর্ণনা মথির ইঞ্জিলেও আছে। সেখানে এ ঘটনাটিও রয়েছে যে, যখন হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম ভূমিষ্ঠ হলেন, সে রাতে পারস্যের বাদশা আসমানে একটি অভিনব উজ্জ্বল নক্ষত্রের উদয় দেখতে পেলেন এবং ভয় পেয়ে গেলেন। বাদশা তার দরবারের জ্যোতিষী মন্ডলীকে সেসম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারা বললেন, এ নক্ষত্রের উদয় একজন মহামানবের জন্ম লাভের সুসংবাদ বহন করে, যিনি শামদেশে জন্মগ্রহণ করেছেন। তখন বাদশা স্বর্ণ ও মূল্যবান দ্রব্যসমূহের উপঢৌকন দিয়ে এক প্রতিনিধিদল শামদেশে প্রেরণ করলেন। উদ্দেশ্য

TOP

GET ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

হলো, তারা সেখানে গমনপূর্বক সেই মর্যাদাশালী নবজাতক শিশুর জন্মগ্রহণ সম্পর্কিত যাবতীয় ঘটনা ও অবস্থা জেনে আসবেন।

এ প্রতিনিধিদল যখন শামদেশে পৌঁছে সেখানের বাদশাকে (হিরোদিয়াসকে) তাদের আগমনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে নবজাতক শিশুর কথা বললেন, তখন বাদশা অন্যদের জিজ্ঞাসা করে বাইতুল মাকদিসে সে সময় হযরত 'ঈসা 'আলাইহিস সালামের এর জন্মের কথা জানতে পারলেন। যেহেতু 'ঈসা 'আলাইহিস সালাম মায়ের কোলেই কথা বলা আরম্ভ করেছিলেন, তাই তার খবর ছড়িয়ে পরেছিল।

তখন বাদশা আগত প্রতিনিধিদের সাথে নিজের পক্ষ থেকে কিছু লোক প্রেরণ করলেন। উদ্দেশ্য ছিল, তার খোঁজ খবর নিয়ে রাখা এবং প্রতিনিধিদল চলে গেলে তাকে হত্যা করা। এরা সবাই হযরত মারিয়ামের নিকট পৌঁছলেন, এবং প্রতিনিধিদল তাদের আনিত হাদিয়া দিয়ে নিজ দেশে ফিরে গেলেন।

ইতোমধ্যে মারিয়ামকে কেউ সংবাদ দিল যে, মনে হচ্ছে শামের বাদশার অভিপ্রায় খারাপ, এবং সে তার লোকদের মাধ্যমে শিশুটিকে হত্যা করতে চেষ্টা করছে। এই পরামর্শ শুনে হযরত মারিয়াম 'আলাইহাস সালাম শিশু 'ঈসাকে মিসরে নিয়ে গেলেন, এবং সেখানে তারা বারো বছর অবস্থান করেন। এবং সেখানে তার ছোট বয়সেই অনেক কারামাত প্রকাশ পায়। (আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ২/৮০-৮১ মাকতাবা আব্বাস আহমাদ আল-বাজ)

'ঈসা 'আলাইহিস সালামের নবুওয়্যাত লাভ

হযরত 'ঈসা 'আলাইহিস সালামের নবুওয়্যাতের পূর্বে বনী ইসরাইল সবধরনের পাপাচারে লিপ্ত ছিল। ব্যক্তিগত ও সামাজিক সবধরনের অনাচারে আক্রান্ত ছিল। অন্যায়-অপকর্ম তাদের অস্থিমজ্জায় মিশে গিয়েছিল।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

ইবাদত ও আকীদা উভয় দিক থেকে ভ্রান্তির শিকার হয়েছিল বনী ইসরাইল। এমনকি নিজ সম্প্রদায়ের পথপ্রদর্শক নবীগণকে হত্যা করতেও তারা কুণ্ঠাবোধ করতো না। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে নিম্নোক্ত আয়াতে তাদের কুফর, অন্যায়-অনাচার ও নবীগণকে হত্যা করার মতো জঘন্য কার্যকলাপের কথা তুলে ধরেছেন,

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بَآيَاتِ اللهِ وَقَتْلِهِمُ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَّقَوْلِهِمْ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ○

এবং তারা লা'নতগ্রস্ত হয়েছিল, এজন্য যে, তারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে, আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছে, নবীগণকে হত্যা করেছে এবং এই উক্তি করেছে যে, আমাদের অন্তরের উপর পর্দা লাগানো রয়েছে। অথচ বাস্তবতা হলো, তাদের কুফরের কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে মোহর করে দিয়েছেন। এ জন্য তারা অল্প কিছু বিষয় ছাড়া (অধিকাংশ বিষয়েই) ঈমান আনে না। (সূরা নিসা, আয়াত:১৫৫)

কয়েক আয়াত পর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ كَثِيْرًا ○ وَاَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ○

ইহুদীদের সীমালংঘনের কারণে আমি তাদের উপর এমন কিছু উৎকৃষ্ট বস্তু হারাম করে দিই, যা পূর্বে তাদের জন্য হালাল করা হয়েছিল এবং এ কারণে যে, তারা মানুষকে আল্লাহর পথে আসতে অত্যাধিক বাধা দিত আর তারা সুদ খেত, অথচ তাদের তা খেতে নিষেধ করা হয়েছিল এবং তারা মানুষের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করতো। তাদের মধ্যে যারা কাফের, আমি তাদের জন্য যন্ত্রণাকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। (সূরা নিসা, আয়াত:১৬০-১৬১)

TOP

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

অপর আয়াতে আল্লাহ ইরশাদ করেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاٰيَاتِ اللهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَّيَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَاْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ○

যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে, নবীদের অন্যায়ভাবে হত্যা করে এবং মানুষের মধ্যে যারা ইনসাফের নির্দেশ দেয় তাদেরকেও হত্যা করে, তাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত:২১)

ইহুদীদের ধর্ম বিকৃতি

দায়েরাতুল মাআরিফে ইহুদীদের সম্বন্ধে যে নিবন্ধ রয়েছে, তার পর্যালোচনা থেকে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের আগমনের পূর্বে ইহুদীরা ইবাদত ও আকীদার ক্ষেত্রে মুশরিকদের রুসুম-রেওয়াজ ও আকীদা-বিশ্বাসকে ধর্মের অংশ হিসেবে গ্রহণ করেছিল। মিথ্যা, ধোঁকা ও হিংসা-বিদ্বেষের মতো নিন্দনীয় চরিত্রগুলো আপন করে নিয়েছিলো এবং লজ্জার মাথা খেয়ে এসব নিয়ে তারা গর্ব করতো।

অপরদিকে তাদের বিজ্ঞজন ও সাধু-সন্ন্যাসীরা দুনিয়ার তুচ্ছ স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাওরাত শরীফে বিকৃতি সাধন করে। অর্থের লোভে তারা তাওরাতের আয়াতসমূহ বিক্রি করে ফেলে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِه

ইহুদীদের মধ্যে কিছুলোক এমন আছে, যারা (তাওরাতের) শব্দাবলিকে সেগুলোর প্রকৃত স্থান থেকে সরিয়ে দেয়। (সূরা নিসা, আয়াত:৪৬)

আল্লাহ তা‘আলা আরো ইরশাদ করেন,

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتَابَ بِاَيْدِيْهِمْ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ لِيَشْتَرُوْا بِه ثَمَناً قَلِيْلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ

TOP

সুতরাং ধ্বংস সে সকল লোকের জন্য, যারা নিজ হাতে কিতাব লেখে তারপর (মানুষকে) বলে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে, যাতে এর মাধ্যমে তারা সামান্য কিছু আয়-রোজগার করতে পারে। সুতরাং তাদের হাত যা রচনা করেছে, সে কারণে তাদের জন্য ধ্বংস এবং তারা যা উপার্জন করেছে, সে কারণে তাদের জন্য ধ্বংস। (সূরা বাকারা, আয়াত:৭৯)

ইহুদীদের ঈমানী ও আমলী যিন্দেগীর চিত্র খোদ বাইবেলে হযরত শু'আইব 'আলাইহিস সালামের যবানে এভাবে বর্ণিত হয়েছে, 'খোদাওয়ান্দ বলেন, এরা (ইহুদীরা) যবানে তো আমার সম্মানের কথা বলে, কিন্তু তাদের অন্তর আমার থেকে বহুদূরে। এরা শুধু শুধু আমার উপাসনা করে। কেননা, আমার বিধান পিছনে ফেলে দিয়ে অন্যদের হুকুমের তামিল করে।'

ইয়াহুদীরা সে সময়ে বনী ইসরাঈলের নবীগণকে হত্যার ধারাবাহিকতায় হযরত ইয়াহইয়া 'আলাইহিস সালামকেও নির্মমভাবে শহীদ করার মতো বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটায়।

এমন অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়েই হযরত 'ঈসা 'আলাইহিস সালাম নবুওয়্যাত লাভ করেন। তখন তার বয়স ছিল তিরিশ বছর।

নবুওয়্যাত লাভের পর হযরত 'ঈসা 'আলাইহিস সালাম সত্যের বাণী নিয়ে বনী ইসরাইলকে আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি দাওয়াত দিতে লাগলেন। সুধীজনদের ইলমী মজলিস, সন্ন্যাসীদের কৃচ্ছ্র-সাধনালয়, বাদশা ও তার মন্ত্রীদের দরবার এবং সাধারণ ও বিশেষ ব্যক্তিদের মাহফিল, এমনটি হাট-বাজারে সর্বত্র তিনি দীনে হকের পয়গাম শুনাতে লাগলেন।

হযরত 'ঈসা 'আলাইহিস সালামের সেই দীনী দাওয়াতের বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

وَ اِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَ مُبَشِّرًۢا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِي اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ ؕ

(হে নবী, স্মরণ করুন,) যখন মারিয়াম তনয় ‘ঈসা বলেছিলেন, হে বনী ইসরাইল, আমি অবশ্যই তোমাদের নিকট প্রেরিত আল্লাহর রাসূল আর আমার পূর্ব থেকে তোমাদের নিকট যে তাওরাত রয়েছে তার প্রত্যায়নকারী এবং একজন রাসুলের আগমনের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আসবেন, যার নাম হবে ‘আহমাদ’। (সূরা সফ, আয়াত:৬)

হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের নবুওয়্যাত লাভের কথা আল্লাহ তা‘আলা বিভিন্ন আয়াতে ভিন্ন ভিন্ন শব্দে উল্লেখ করেছেন। যেমন, পবিত্র কুরআনের এক স্থানে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَقَفَّيْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ ۫ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ؕ

নিশ্চয় আমি মুসাকে কিতাব দিয়েছি এবং তার পরে পর্যায়ক্রমে রাসূলগণকে পাঠিয়েছি। আর মারিয়াম তনয় ‘ঈসাকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী দিয়েছি এবং রুহুল কুদসের মাধ্যমে তাকে শক্তিশালী করেছি। (সূরা বাকারা, আয়াত:৮৭)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ

অতঃপর আমি তাদেরই পদাঙ্ক অনুসারী করে পাঠালাম আমার রাসূলগণকে এবং তাদের পিছনে পাঠিয়েছি ‘ঈসা ইবনে মারিয়ামকে। আর তাকে দান করেছি ইনজিল। (সূরা হাদীদ, আয়াত:২৭)

আল্লাহ তা‘আলা অপর আয়াতে ইরশাদ করেন,

وَاِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْاِنْجِيْلَ

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

স্মরণ করুন, যখন আমি আপনাকে (হযরত ‘ঈসা আ.-কে) কিতাব ও হেকমত এবং তাওরাত ও ইঞ্জিলের শিক্ষা প্রদান করেছিলাম। (সূরা মায়িদা, আয়াত:১১০)

‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের মুজিযা

আল্লাহ তা‘আলা রাসূলগণকে তাদের সত্যতা এবং আল্লাহ তা‘আলার রাসূল হিসেবে প্রমাণস্বরূপ বিভিন্ন অলৌকিক নিদর্শন প্রদান করেছিলেন। এগুলোকে মুজিযা বলা হয়।

মুজিযা শব্দের অর্থ অক্ষমকারী অলৌকিক বিষয়। অর্থাৎ নবীগণের প্রদর্শিত এমন সব বিষয়, যেগুলো সংঘটিত করা সাধারণ মানুষের পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব নয়। এসব বিষয়ই প্রমাণ বহন করে যে, এগুলোর প্রদর্শনকারী নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা‘আলার প্রেরিত রাসূল।

হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামকে এমন অনেক মুজিযা প্রদান করা হয়েছিল। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ

আমি ‘ঈসা ইবনে মারিয়ামকে অনেকগুলো মুজিযা প্রদান করেছি। (সূরা বাকারা, আয়াত:৮৭)

হযরত মারিয়াম ‘আলাইহাস সালামকে যখন ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের জন্মের ব্যাপারে সুসংবাদ দেয়া হচ্ছিল, তখনই ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামকে কী কী মুজিযা প্রদান করা হবে সে সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দিয়ে আল্লাহ তা‘আলা বলেছিলেন,

وَرَسُوْلًا اِلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۙ۬ اَنِّىْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۙ اَنِّىْٓ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا ۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَاُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَاُحْىِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ ۙ فِىْ بُيُوْتِكُمْ ۙ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

এবং তাকে (‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামকে) বনী ইসরাইলের জন্য রাসূল বানিয়ে পাঠাবেন। (তিনি মানুষকে বলবেন,) আমি তোমাদের

নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নিদর্শন নিয়ে এসেছি। আমি তোমাদের জন্য মাটি থেকে পাখির আকৃতি তৈরি করব, অতঃপর আমি তাতে ফু দেব, তাতে সেটি আল্লাহর হুকুমে সত্যিকার পাখি হয়ে যাবে। আর আমি আল্লাহর হুকুমে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করে দেব এবং মৃতকে জীবিত করব। এবং তোমরা ঘরে যা খাও ও মজুদ কর, তা তোমাদের বলে দেব। নিশ্চয় এতে তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা মুমিন হও। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত:১৪৯)

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন রাসূলকে বিভিন্ন কওমের নিকট পাঠিয়েছিলেন। যেই কওম যে বিষয়ে পারদর্শী ও বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলো, তাদের রাসূলকে আল্লাহ তা'আলা সে বিষয়ে অলৌকিক ক্ষমতার মুজিযা প্রদান করেছিলেন।

এর কারণ হলো, যদি এমন জিনিস প্রদর্শন করান হয়, যা তারা কোথাও দেখেন নি বা যে সম্পর্কে তাদের ধারণা নেই, তখন তারা রাসূলকে এ বলে অস্বীকার করার মওকা পাবেন যে, আপনি এমন এমন বিষয় দেখাচ্ছেন, যে সম্পর্কে আমাদের ধারণা নেই। যদি আমরা এর প্রশিক্ষণ নিই, তা হলে অনুরূপ বিষয় আমরাও দেখাতে পারব। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা রাসূলগণকে এমন বিষয়ের মুজিযা প্রদান করেছেন, যে ব্যাপারে ঐ জাতি পুরোপুরি পারদর্শী। এতে করে পারদর্শিতা থাকা সত্ত্বেও যখন সে বিষয়ে তাদের অক্ষমতা প্রকাশ পেত, তখন এই মুজিযা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এসেছে বলে তাদের ইয়াকীন করা সহজ হতো।

মুজিযা ও যাদুর পার্থক্য

মুসা 'আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের যাদুকররা এমন জিনিস দেখাতেন, যা দর্শকের দৃষ্টিতে বাস্তব মনে হলেও মূলত তা ছিল ভেল্কিবাজি ও অবাস্তব বিষয়। পক্ষান্তরে মুসা 'আলাইহিস সালামের মুজিযা ছিল সম্পূর্ণ বাস্তব।

Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com App Store

হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামকে আল্লাহ প্রদত্ত একটি মুজিযা এই ছিল যে, তার হাতের লাঠি মাটিতে ফেললে, তা বড় আকারের সাপ হয়ে যেত। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

وَ مَا تِلۡکَ بِیَمِیۡنِکَ یٰمُوۡسٰی ○ قَالَ ہِیَ عَصَایَ ۚ اَتَوَکَّؤُا عَلَیۡهَا وَ اَهُشُّ بِهَا عَلٰی غَنَمِیۡ وَلِیَ فِیۡهَا مَاٰرِبُ اُخۡرٰی ○ قَالَ اَلۡقِهَا یٰمُوۡسٰی ○ فَاَلۡقٰهَا فَاِذَا ہِیَ حَیَّۃٌ تَسۡعٰی ○

(আল্লাহ তা‘আলা জিজ্ঞেস করলেন,) হে মুসা, আপনার ডান হাতে ওটা কী? তিনি বললেন, এটা আমার লাঠি, আমি এর উপর ভর দিই এবং এর দ্বারা আমার ছাগলপালের জন্য গাছের পাতা ঝাড়ি এবং এতে আমার অন্যান্য প্রয়োজনও সমাধা হয়। আল্লাহ বললেন, হে মুসা, আপনি ওটা মাটিতে নিক্ষেপ করুন। তখন তিনি তা নিক্ষেপ করলেন। অমনি তা সাপ হয়ে ছোটাছুটি করতে লাগলো। (সূরা ত্বহা, আয়াত:১৭-২০)

অকস্মাৎ লাঠি সাপ হয়ে গিয়েছে দেখে মুসা ‘আলাইহিস সালাম ভয় পেয়ে গেলেন। তখন আল্লাহ তা‘আলা তাকে অভয় দিয়ে মুজিযার বিষয়টি জানিয়ে দেন। এসম্পর্কে কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে,

قَالَ خُذۡهَا وَلَا تَخَفۡ سَنُعِیۡدُهَا سِیۡرَتَهَا الۡاُوۡلٰی

আল্লাহ বললেন, আপনি ওটাকে ধরুন এবং ভয় করবেন না, অচিরেই আমি ওটাকে তার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেব। (সূরা ত্বহা, আয়াত:২১)

এখানে মুসা ‘আলাইহিস সালামের ভয় পাওয়ার দ্বারা তার মুজিযা ও কওমের যাদুর মাঝে পার্থক্য সূচিত হয়ে যায়। কেননা, যাদুকররা লাঠি নিক্ষেপ করলে লোকেরা তা সাপ মনে করে ভয় পান, কিন্তু যাদুকররা তা লাঠিই দেখেন। এ কারণে তারা অন্যদের মতো ভয় পান না। যা এর অবাস্তবতা ও ভেল্কিবাজি প্রমাণ করে। কিন্তু নিজের লাঠির সাপ হওয়া দেখে মুসা ‘আলাইহিস সালাম ভয় পেলেন, কারণ, লাঠিটি পরিবর্তন হয়ে সত্যি সত্যি সাপ হয়ে গিয়েছিলো। এটা যদি যাদু

TOP

Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com App Store

হতো, তা হলে তিনি ভয় পেতেন না, কেননা, তখন তিনি লাঠিই দেখতেন। যদিও অন্যরা তা দেখলে সাপ মনে করে ভয় পেত। এটাই মুজিযা ও যাদুর মধ্যে পার্থক্য।

আর এ পার্থক্য দেখেই মুসা ‘আলাইহিস সালামের সাথে মোকাবেলা করতে আসা যাদুকররা ঈমান এনেছে। যাদুকররা যখন দেখলো, তাদের হাতের ছুড়ে ফেলা দড়িগুলো মানুষের চোখের ধাঁধায় সাপ হয়েছে, যেগুলোকে তারা নিজেরা দড়িই দেখতে পাচ্ছেন। কিন্তু মুসা ‘আলাইহিস সালামের লাঠি ছুড়ে ফেলামাত্র বাস্তব সাপ হয়ে গেল, যা তারা স্পষ্টভাবে সাপরূপে দেখতে পেলো এবং তারা এটাও প্রত্যক্ষ করলো যে, মুসা ‘আলাইহিস সালামের লাঠির সেই সাপ সত্যিকার সাপের ভূমিকা পালন করে তাদের যাদুর সমস্ত সাপ খেয়ে ফেললো। তখন তারা উপলব্ধি করলো, মুসা ‘আলাইহিস সালামের এ প্রদর্শনী কিছুতেই যাদু নয়, বরং এটা সম্পূর্ণ অলৌকিক বিষয়। এটা মহান সৃষ্টিকর্তা-রবের কুদরতী ক্ষমতা ছাড়া কোন মানুষের পক্ষে করা সম্ভব নয়। এতে তাদের ইয়াকীন হয়ে গেল, নিঃসন্দেহে মুসা ‘আলাইহিস সালাম আল্লাহ তা‘আলার রাসূল। সঙ্গে সঙ্গেই তারা ঈমান গ্রহণ করলো।

তদ্রুপ হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের যামানায় তার সম্প্রদায়ের লোকেরা চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তাই আল্লাহ তা‘আলা তাকে সেই ধরনের অলৌকিক ক্ষমতা সংবলিত মুজিযা প্রদান করেন।

যেমন, মাটি দ্বারা পাখির সুরত তৈরি করে তাতে ফু দিয়ে সত্যিকার জীবিত পাখি বানিয়ে দেওয়া, জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে হাত বুলিয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ করা এবং মৃতব্যক্তিকে মুখের কথায় জীবিত করে তোলা, যে সম্পর্কে উল্লিখিত আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে।

যেসব ডাক্তার শরীরের বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা করেন, তার কখনো কোন মৃতব্যক্তিকে জীবিত করতে পারেন না। কারণ, মানুষ মৃত্যুর সাথে সাথে ডাক্তারের চিকিৎসা-ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। এসব

ডাক্তার যা করতে অক্ষম, হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তা‘আলা সে কাজ করার ক্ষমতা মুজিযা স্বরূপ প্রদান করেছিলেন। তাই তিনি মৃত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে শুধু বলতেন, قُمْ بِإِذْنِ اللهِ (আল্লাহর হুকুমে দন্ডায়মান হও), অমনি মৃত ব্যক্তি জীবিত হয়ে দাঁড়িয়ে যেত।

পাশাপাশি জন্মান্ধকে ভালো করা এবং শ্বেতরোগীকে নিরাময় করার মুজিযা হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামকে দেয়া হয়েছিল। কারণ, সে যামানায় এই দু’টি রোগ দুরারোগ্য ব্যাধি হিসেবে গণ্য ছিল, যার নিরাময়ের ব্যাপারে তৎকালীন চিকিৎসাবিদ্যা ব্যর্থ ছিল। তাই ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামকে এ অলৌকিক মুজিযা দান করে আল্লাহ তা‘আলা তার চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শী কওমকে হতবাক করে দেন।

মানুষের তৈরি ও স্রষ্টার সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য

মানুষের তৈরি ও সৃষ্টি আল্লাহ তা‘আলার সৃষ্টিতে অনেকগুলো পার্থক্য রয়েছে।

১. মানুষ কোন কিছু তৈরি করে বিদ্যমান জিনিস থেকে, আর আল্লাহ সৃষ্টি করেন অস্তিত্বহীন বস্তু থেকে। কোন বস্তুর মাধ্যম ছাড়া সম্পূর্ণ নতুনভাবে কোন জিনিস তৈরি করতে মানুষ অক্ষম। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা এমন জিনিসকে অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্বে আনেন, যার উপকরণ পূর্ব থেকে বিদ্যমান নেই।

২. আল্লাহ তা‘আলা তার সৃষ্টিতে এমন কিছু বিষয় দান করেন, যা মানুষ তার তৈরি বস্তুতে দিতে পারে না। আল্লাহ তার সৃষ্টিকে জীবন দান করেন, যা বর্ধনশীল। আল্লাহর সৃষ্টি হায়াত লাভ করে। ফলে তা বড় হয়, বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে। পক্ষান্তরে মানুষ যেগুলো তৈরি করে, সেগুলো বর্ধনশীল নয় বরং নিজ নিজ অবস্থায় বহাল থাকে।

হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম যে বলেছেন, ‘আমি তোমাদের জন্য মাটি হতে পাখির আকৃতি তৈরি করি, অতঃপর তাতে ফুঁক দিই, ফলে তা আল্লাহর হুকুমে সত্যিকার পাখি হয়ে যায়’- এ ব্যাপারে কথা

TOP

হচ্ছে, প্রত্যেক মানুষই মাটি দ্বারা পাখির আকৃতি তৈরি করতে সক্ষম। তবু আল্লাহ তা‘আলা পাখির আকৃতি বানানোকে ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের মুজিযা সাব্যস্ত করেছেন কী করে? এর উত্তর হলো, এরপর তাতে ফু দেওয়ামাত্র তা সত্যিকার পাখি হয়ে উড়ে যাওয়ার ব্যাপারটি সাব্যস্ত করা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এটাই হলো হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের মুজিযার বিষয়।

মুজিযা ভ্রান্তির মাধ্যম নয়

‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম এসব মুজিযা প্রদর্শন করতেন আল্লাহ তা‘আলার হুকুমে; নিজস্ব কৃতিত্বে নয়। তাঁকে আল্লাহ তা‘আলা নিজের রাসূল প্রমাণ করার জন্য এসব মুজিযা প্রদান করেছিলেন।

এগুলো প্রত্যক্ষ করে ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামকে ইলাহ বা খোদা ভাবার কোন অবকাশ নেই- যেমনটা ভেবে থাকে খ্রিস্টানরা। মানুষ যাতে এ ব্যাপারে কোনরূপ বিভ্রান্তিতে না পড়ে এজন্য তিনি প্রতিটি মুজিযার ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলার হুকুমের কথা স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন এ শব্দের মাধ্যমে بِإِذْنِ اللهِ (আল্লাহর আদেশে)। অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলার হুকুমেই আমি এমন অলৌকিক বিষয় প্রদর্শন করি। এসব আমার কৃতিত্ব নয়।

এত সুস্পষ্ট বক্তব্যের পরও ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের মুজিযা দেখে খ্রিস্টানরা তাকে ইলাহ ভাবা শুরু করেছে। অথচ ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামকে তাঁর মুজিযার কারণে ইলাহ বলা হলে তো হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের মুজিযার কারণে তাকে ইলাহ বলা দরকার ছিল, যখন তিনি চারটি পাখিকে টুকরো টুকরো করে একেক পাহাড়ে একেক অংশ রেখে এসে তাদের নাম ধরে ডাকলেন আর মৃত পাখিগুলো তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে যার যার অংশ একটা আরেকটার সাথে সংযোজিত হয়ে তাঁর নিকট চলে এলো। পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে এর বর্ণনা রয়েছে । আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتٰى ؕ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ ؕ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ؕ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ؕ وَاعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

(হে নবী,) আপনি সে সময়কে স্মরণ করুন, যখন ইবরাহীম আরজ করলেন, হে আমার প্রভু, আমাকে দেখিয়ে দিন, আপনি কীভাবে মৃতকে জীবিত করবেন? আল্লাহ তা‘আলা বললেন, আপনি কি বিশ্বাস করেন না? তিনি বললেন, অবশ্যই বিশ্বাস করি। তবে আমার অন্তরের প্রশান্তির জন্য দেখতে আবেদন করছি। আল্লাহ তা‘আলা বললেন, আচ্ছা, তা হলে আপনি চারটি পাখি আনুন। এরপর তাদের পোষ মানিয়ে নিন। তারপর (সেগুলোকে জবাই করে) একেক অংশ একেক পাহাড়ে রেখে আসুন। তারপর সেগুলোকে ডাক দিন। সবগুলো আপনার নিকট ছুটে আসবে। আর দৃঢ় বিশ্বাস রাখুন, নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। (সূরা বাকারা, আয়াত:২৬০)

ঠিক তেমনি যদি খ্রিস্টানরা হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামকে বিনাবাপে পয়দা হওয়ার কারণে ইলাহ ভেবে থাকে, তা হলে তো এর জন্য সর্বাধিক হযরত আদম ‘আলাইহিস সালামকেই ইলাহ বলা বেশি যুক্তিসঙ্গত ছিল। কারণ, আল্লাহ তা‘আলা তাকে পিতা-মাতা ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং এমন কোন বিভ্রান্তির সুযোগ নেই। কোন রকম যুক্তিই এক্ষেত্রে টিকবে না।

উল্লেখ্য যে, নবীগণের নবুওয়্যাতের প্রমাণে বিশেষভাবে দু’টি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।

১. নবীর হক্কানিয়াত ও সত্যতা প্রমাণের জন্য মজবুত দলীল পেশ করা হয়েছে।

২. মুজিযা প্রদর্শনের মাধ্যমে নবীর সত্যতা প্রমাণ করা হয়েছে।।

এ দু’টি বিষয় একত্র হয়ে মানুষের বিবেক-বুদ্ধি ও তাদের অন্তর-জগতে এমন আন্দোলনের সৃষ্টি করে, যার ফলে তারা নির্দ্বিধায় স্বীকার করে

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

নেন যে, নবীর এ কাজ তার নিজের নয়; বরং এর অন্তরালে কোন অদৃশ্য শক্তি কাজ করছে এবং নিঃসন্দেহে এটা তার সত্যবাদিতার দলীল। যেমন, কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে,

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ

(হে নবী, বদরযুদ্ধের সময় যখন আপনি এক মুষ্টি বালি শত্রুবাহিনীর দিকে নিক্ষেপ করেছিলেন, তখন) তা আপনি (নিজ শক্তিতে) নিক্ষেপ করেননি। বরং আল্লাহ তা‘আলা (তার কুদরত দ্বারা) নিক্ষেপ করেছিলেন। (সূরা আনফাল, আয়াত:১৮)

তবে এ দু’টি বিষয়ের প্রথমটি অর্থাৎ দলীল-প্রমাণ; সুধী সমাজের জন্য অধিক কার্যকর বিষয়। আর দ্বিতীয়টি তার সহায়ক ও সমর্থকমাত্র। কারণ, তারা দলিলের ভিত্তিতেই নবীর উপর ঈমান আনে। আর মুজিযা দ্বারা তাদের ঈমান আরো শক্তিশালী হয়। অবশ্য ক্ষমতাধর, বিত্ত-বৈভব ও শৌর্য-বীর্যের অধিকারী এবং তাদের সমমনা সাধারণ শ্রেণির জন্য দ্বিতীয় বিষয়টি তথা মুজিযা অধিক ফলপ্রসূ হয়। কেননা, তারা অলৌকিক ঘটনাবলীকে ‘খোদায়ী নিশান’ বলে দৃঢ় বিশ্বাস করে পয়গামে হকের সামনে নতি স্বীকার করে ঈমান আনয়ন করে।

পবিত্র কুরআনে প্রথম প্রকারের বিষয়কে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ‘হুজ্জাত’ ‘বুরহান’ ও ‘হেকমত’ প্রভৃতি শব্দ দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, সূরা আনআমে আল্লাহ তা‘আলার মহান সত্তা, একত্ব, পরকাল এবং দীনের বুনিয়াদি আকায়েদ বিভিন্ন দলীল-প্রমাণ, উপমা ও উদাহরণ দিয়ে বুঝানোর পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলা হয়,

قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ

(হে নবী, তাদের বলুন,) এমন হুজ্জাত (প্রমাণ) তো আল্লাহরই আছে, যা (অন্তরে) পৌঁছে যায়। (সূরা আনআম, আয়াত:১৪৯)

উক্ত সূরার অন্যত্র হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের আলোচনায় বলা হয়েছে,

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا اٰتَيْنَاهَا اِبْرَاهِيْمَ عَلٰى قَوْمِه

এটা ছিল আমার হুজ্জাত (ফলপ্রসূ দলীল), যা আমি ইবরাহীমকে তার কওমের বিপরীতে দান করেছিলাম। (সূরা আনআম, আয়াত:৮৩)

এক্ষেত্রে ‘বুরহান’ (সুস্পষ্ট প্রমাণ) শব্দটি এসেছে সূরা নিসা ও ইউসুফে। সূরা নিসায় ইরশাদ হয়েছে,

يَا اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ

হে লোকসকল, তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে বুরহান (সুস্পষ্ট প্রমাণ) এসেছে। (সূরা নিসা, আয়াত:১৭৪)

সূরা ইউসুফে ইরশাদ হয়েছে,

وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ رَّاٰى بُرْهَانَ رَبِّه

যদি ইউসুফ তার প্রতিপালকের বুরহান (দলীল) না দেখতেন, তা হলে তার দিকে ধাবিত হতেন। (সূরা ইউসুফ, আয়াত:২৪)

এমনিভাবে সূরা বাকারা, সূরা আলে ইমরান, সূরা নিসা, সূরা মায়িদা, সূরা লুকমান, সূরা সোয়াদ, সূরা যুখরুফ, সূরা আহযাব ও সূরা কামারে হেকমত শব্দ উল্লেখ হয়েছে। যেমন, সূরা নিসায় ইরশাদ হয়েছে,

وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

আল্লাহ আপনার প্রতি কিতাব ও হেকমত নাযিল করেছেন। (সূরা নিসা, আয়াত:১২৬)

আর দ্বিতীয় পদ্ধতি তথা মুজিযাকে কুরআনে কারীমে অধিকাংশ জায়গায় آيَةُ الله (আয়া-তুল্লাহ: আল্লাহর নিদর্শন), آيَات الله (আয়া-তুল্লাহ: আল্লাহর নিদর্শনাবলি), আবার কোথাও آيَات بينات (আয়া-তুম্বায়্যিনাত: সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী) কিংবা কোথাও শুধু بينات

www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com

(বায়্যিনাত) শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমন, হযরত সালেহ ‘আলাইহিস সালামের মুজিযা উষ্ট্রীর ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً

এটা আল্লাহর উটনী, যা তোমাদের কাছে একটি নিদর্শনরূপে এসেছে। (সূরা আ’রাফ, আয়াত:৭৩)

‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের পাঁচ মুজিযা

হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তা‘আলা যুগোপযোগী বিভিন্ন মুজিযা প্রদান করেছেন, যার বিশ্লেষণ ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তার সেই অলৌকিক মুজিযা সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

اَنِّیْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۙ اَنِّیْٓ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًۢا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَاُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَاُحْیِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ ۙ فِیْ بُيُوْتِكُمْ ۙ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

এবং তাকে (‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামকে) বনী ইসরাইলের জন্য রাসূল বানিয়ে পাঠাবেন। (তিনি মানুষকে বলবেন,) আমি তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নিদর্শন নিয়ে এসেছি। আমি তোমাদের জন্য মাটি থেকে পাখির আকৃতি তৈরি করবো, অতঃপর আমি তাতে ফু দেব, তাতে সেটি আল্লাহর হুকুমে সত্যিকার পাখি হয়ে যাবে। আর আমি আল্লাহর হুকুমে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করে দেব এবং মৃতকে জীবিত করবো। এবং তোমরা ঘরে যা খাও ও মজুদ করো, তা তোমাদের বলে দেব। নিশ্চয় এতে তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা মুমিন হও। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত:৪৯)

এ আয়াতে হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের উল্লেখযোগ্য পাঁচটি মুজিযার কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

১. মাটি দ্বারা পাখির আকৃতি তৈরি করার পর আল্লাহর হুকুমে তা সত্যিকার পাখি হয়ে যাওয়া।
২. জন্মগত অন্ধের চক্ষু আল্লাহর হুকুমে ভালো করা।
৩. কুষ্ঠরোগীকে আল্লাহর হুকুমে সুস্থ করা।
৪. কোন মৃত ব্যক্তিকে আল্লাহর হুকুমে জীবিত করা।
৫. মানুষ ঘরে কী খেয়েছে ও সংরক্ষণ করেছে তা বলে দেওয়া।

আল্লাহ তা‘আলা নবী-রাসূলগণকে অলৌকিক মুজিযা দিয়ে থাকেন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের প্রেরিত হওয়ার প্রমাণরূপে। কেননা, মুজিযার এসব কাজ অন্য কারো পক্ষেই করা সম্ভব নয়। তাই এ কাজগুলোর অলৌকিকতা এবং এ সকল বিষয়ে মানুষের অক্ষমতাই প্রমাণ করে, তারা আল্লাহর প্রেরিত নবী-রাসূল, যদ্দরুন আল্লাহ তা‘আলার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে তারা এসব করতে পারছেন।

কিন্তু কেউ কেউ ব্যর্থ চেষ্টা চালান মুজিযা ও মানুষের কর্ম ক্ষমতার মধ্যে সামঞ্জস্য করতে। তাদের দাবি, এসব বিষয় অলৌকিক নয়, বরং ক্ষেত্র বিশেষ মানুষের পক্ষে করা সম্ভব।

যেমন, জন্মান্ধের চক্ষু ভালো করার কথা। মুজিযা অস্বীকারকারীরা বলে, অন্ধের চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে। বিভিন্ন বস্তুর মিশ্রিত ঔষধের মাধ্যমে অন্ধকে ভালো করা যায়। অথবা ধরা যাক কুষ্ঠরোগের কথা। তারা বলেন, কুষ্ঠরোগের চিকিৎসায় বিভিন্ন ঔষধ আবিষ্কৃত হয়েছে।

খুবই আশ্চর্যের কথা। মুজিযার তুলনা তারা করছে চিকিৎসাবিদ্যার সাথে। অথচ চিকিৎসাবিদ্যা তো কাজ করে ঔষধের মাধ্যমে, আর ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম তো নিরাময় করতেন শুধুই মুখের এই কথা দ্বারা- আল্লাহর হুকুমে ভালো হয়ে যাও। সঙ্গে সঙ্গে রোগী ভালো হয়ে যেতো। চিকিৎসাবিজ্ঞান যতই উন্নতিসাধন করুক, কখনো তারা এভাবে শুধু মুখের কথার মাধ্যমে রোগ নিরাময় করতে সক্ষম হবে না। তারা বিভিন্ন জিনিস পরস্পর মিশিয়ে তার সাথে রাসায়নিক পদার্থের

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

মিশ্রণ ঘটিয়ে সেই অষুধ ক্ষতস্থানে ব্যবহার করে অথবা খাইয়ে চিকিৎসা করে।

সুতরাং বুঝা গেল, তাদের এ দাবি একদম মনগড়া ও ভিত্তিহীন। মুজিযার বিষয়গুলো অন্যান্য মানুষের পক্ষে করা কোনমতেই সম্ভব নয়। এটাই কুরআন, হাদীস ও বাস্তবতা দ্বারা প্রমাণিত।

অবশ্য মৃতকে জীবিত করে তোলার বিষয়টি ব্যাপক ছিলো না, বরং তা বিশেষ কিছু ব্যক্তির ক্ষেত্রে ঘটেছে। এটা শুধু মুজিযা প্রমাণের জন্য। অন্যথায় কোন নবী বা রাসূল-এর পক্ষে আল্লাহর নির্ধারিত সময়, যা তিনি প্রত্যেক বস্তুর মৃত্যুর ব্যাপারে নির্ধারণ করেছেন, তা টলানো সম্ভব নয়।

মুজিযা অস্বীকার করা কুফরী

দুঃখজনক হলো, হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের হাতে যেসব মুজিযা প্রকাশ পেয়েছে, তার সবগুলোই ইহুদীরা বিদ্বেষবশতঃ অস্বীকার করেছে। কিন্তু পরবর্তীতে কোন কোন ইসলামের দাবিদারও সেগুলোর অস্বীকারের দুঃসাহস দেখিয়েছেন। তাদের মধ্যে তো কেউ কেউ প্রবৃত্তিপূজারি নব্য ইউরোপিয়ান শিক্ষিতদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এ পথ অবলম্বন করেছেন। তাদের মধ্যে স্যার সৈয়দ আহমদ ও মৌলবী চেরাগ আলী, মাওলানা আকরম খাঁ উল্লেখযোগ্য।

আর কেউ কেউ ইহুদীদের দোসর হয়ে এ পথ ধরেছেন। তারা নিজেদের হীন স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে হিংসার বশবর্তী হয়ে হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের মুজিযাগুলো শুধু অস্বীকারই করেননি, বরং তার অপব্যাখ্যা করে বিদ্রুপ করেছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মিথ্যা নবুওয়্যাতের দাবিদার মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী এবং তারই মতাদর্শ অবলম্বনকারী মিস্টার মুহাম্মদ আলী লাহোরী। তারা এ পর্যন্ত বলতে কুণ্ঠাবোধ করেননি যে, ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের পাখি তৈরি করা একটি নির্দিষ্ট পুকুরের মাটির বৈশিষ্ট্য ছিল, এটা কোন মুজিযা ছিল না। ঐ মাটির বৈশিষ্ট্য ছিল, তা দ্বারা যে কোনো

পাখির আকৃতি তৈরীর পর মাথা থেকে পিছন পর্যন্ত ছিদ্র রাখার কারণে তাতে বাতাস ভর্তি হয়ে নড়াচড়া করতো এবং আওয়াজ সৃষ্টি হত। (নাউযুবিল্লাহ)

এটা মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ও মিস্টার মুহাম্মদ আলী লাহোরীর মস্তিষ্কপ্রসূত ভিত্তিহীন কথা। এ ধরনের ভ্রান্তি পোষণ করা ঈমানের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।

অনুরূপভাবে মৃতকে জীবনদানের মুজিযা অস্বীকার করে তারা বলেছে, কুরআনের ফায়সালা হলো, মৃত্যুর পর কিয়ামত পর্যন্ত কাউকে দুনিয়াতে জীবিত করে পাঠানো হবে না।

অথচ মৃত্যুর পর জীবিত করার বিষয়টি নতুন নয়। আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মানুষকে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবনদান করেছেন। যেমন, সূরা বাকারায় তিন জায়গায় এ রকম বর্ণনা রয়েছে। গাভীর ঘটনায় আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَا ؕ كَذٰلِكَ يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتٰى ۙ وَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ○

এরপর আমি বললাম, গাভীটির একটি টুকরো দ্বারা নিহত লোকটিকে স্পর্ষ কর। এ ভাবেই আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন এবং তোমাদের দেখান তার নিদর্শন, যাতে তোমরা বুঝতে পারো। (সূরা বাকারা, আয়াত:৭৩)

তেমনি চল্লিশ বা সত্তর হাজার বনী ইসরাইলকে মৃত্যুদানের পর হযরত হিযকীল 'আলাইহিস সালামের দু'আ কবুল করে আল্লাহ তা'আলা পুনরায় তাদের জীবন দান করেছেন বলে এ সূরায় উল্লেখ রয়েছে। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ ۪ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا ۟
ثُمَّ اَحْيَاهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ○

(হে রাসূল,) আপনি কি তাদের দেখেননি যারা মৃত্যুর ভয়ে তাদের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল? অথচ তারা ছিল হাজার হাজার। তারপর

TOP

আল্লাহ তাদের বললেন, তোমরা মরে যাও (সাথে সাথে তারা মারা গেল)। তারপর তিনি তাদের জীবিত করলেন। (সূরা বাকারা, আয়াত:২৪৩)

অনুরূপ হযরত উযাইর 'আলাইহিস সালামকে একশত বছর পর পুনরায় জীবিত করার ঘটনা পবিত্র কুরআনে বিধৃত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

فَأَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ

অতঃপর আল্লাহ তাকে একশ বছর পর্যন্ত মৃত রাখলেন, তারপর তাকে জীবিত করলেন। (সূরা বাকারা, আয়াত:২৫৯)

সুতরাং বুঝা গেল, 'ঈসা 'আলাইহিস সালামের পূর্বেও বিভিন্ন সময়ে আল্লাহ তা'আলা নিজ কুদরতে মৃতকে জীবিত করেছিলেন। সুতরাং মৃত্যুর পর কেয়ামত পর্যন্ত কাউকে জীবিত করা হবে না, এ দাবী করে মুজিযাকে অস্বীকার করা যাবে না। বরং এটাকে অস্বীকার করা পবিত্র কুরআন ও হাদীসের এ সংক্রান্ত বর্ণনাকে অস্বীকার করার নামান্তর, যা কুফরী।

দীনের প্রতি 'ঈসা 'আলাইহিস সালামের দাওয়াত

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

فَلَمَّا اَحَسَّ عِيْسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِىْٓ اِلَى اللّٰهِ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ○

অতঃপর যখন 'ঈসা তাদের কুফরী উপলব্ধি করলেন, তখন তিনি (তার অনুসারীদের লক্ষ করে) বললেন, কে কে আছে, যারা আল্লাহর পথে আমার সাহায্যকারী হবে? হাওয়ারীগণ বললেন, আমরা আল্লাহর (দীনের) সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি এবং আপনি সাক্ষী থাকুন, আমরা মুসলমান (অনুগত)। হে আমাদের প্রতিপালক, আপনি যা-কিছু নাযিল করেছেন, আমরা তাতে ঈমান এনেছি এবং আমরা রাসুলের অনুসরণ করেছি। সুতরাং আমাদের

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

সেসব লোকের মধ্যে লিখে নিন, যারা (সত্যের) সাক্ষ্যদাতা। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত:৫২)

নবুওয়্যাত লাভের পর হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম বনী ইসরাইলকে আল্লাহর শ্বাশত দীনের প্রতি দাওয়াত দিলেন। তার এ দাওয়াত কিছু লোক কবুল করলো আর অধিকাংশ লোক প্রত্যাখ্যান করলো। এদিকে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের জন্য তা আরো বেশি গাত্রদাহের কারণ হয়ে দাঁড়ালো। তাই তারা দাওয়াত কবুল করার পরিবর্তে হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডায় লিপ্ত হলো। এমনকি তারা তাকে দুনিয়া হতে চিরতরে বিদায় করার জন্য খড়গহস্ত হলো।

কিন্তু তিনি খোদাদ্রোহীদের এসব অহেতুক প্রচারণা ও বিরুদ্ধাচরণ সত্ত্বেও আপন দায়িত্ব পালনে দীনী দাওয়াতের কাজ অব্যাহত রাখলেন। দিন-রাত তিনি বনী ইসরাইলের গ্রামে গ্রামে গিয়ে আল্লাহর মধুর বাণী শুনাতেন। তিনি আলোকোজ্জ্বল দলীল ও হৃদয়গ্রাহী মর্মস্পর্শী বয়ান-বক্তৃতা এবং মনমুগ্ধকর চরিত্র-মাধুরী দিয়ে তাদেরকে সত্য দীন গ্রহণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন। ফলে খোদাদ্রোহী জাতির মধ্য থেকে কিছু পূতঃপবিত্র ব্যক্তি বেরিয়ে এলেন, যারা হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের দাওয়াত একনিষ্ঠভাবে কবুল করলেন।

এ পবিত্র ব্যক্তিদের মধ্য হতেই কিছু ব্যক্তি এমন ছিলেন, যারা আল্লাহর নবীর বরকতময় সুহবতে শুধু ঈমানই আনেনি, বরং আল্লাহর দীনের বুলন্দী ও কামিয়াবীর জন্য জান-মালের বাজি রেখে দীনের খেদমতের জন্য নিজেদের নিবেদিতপ্রাণরূপে সমর্পণ করেছেন। তারা সবসময় হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের সাথে থেকে দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব আনজাম দিতেন। এ বৈশিষ্ট্যের কারণে তারা ‘হাওয়ারী’ খেতাবে ভূষিত হয়েছিলেন।

হাওয়ারী শব্দের ব্যাখ্যা

হাওয়ারী حوارى শব্দটি হাওয়ার حوار থেকে উদগত। এর অর্থ শুভ্র। হযরত 'ঈসা 'আলাইহিস সালামের মুখলিস সঙ্গীদের 'হাওয়ারী' আখ্যা দেওয়ার কারণ হলো, তাদের অন্তর ইখলাসে পূর্ণ ছিলো এবং তাদের দিল পরিষ্কার ছিলো। পাশাপাশি তাদের পোশাকও থাকতো সাদা। এ ভাবেই তাদের নামের শুভ্রতার অর্থ সার্থক হয়।

আবার অপর অর্থে সাহায্যকারীকেও হাওয়ারী বলা হয়। এ দিক থেকে যেহেতু তারা সবসময় হযরত 'ঈসা 'আলাইহিস সালামের সহযোগিতা করতেন, তাই তাদের হাওয়ারী বলা হতো। এই অর্থেই এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إنه ابن عمتي وحواري من أمتي

সে (যুবাইর) আমার ফুপাতো ভাই এবং আমার উম্মতের মধ্য হতে বিশেষ সাহায্যকারী। (মুসনাদে আহমাদ, ৩:৩১৪; নাসায়ী কুবরা, ৫:৮২১২)

কোন কোন মুফাসসির স্বীয় তাফসিরে উক্ত হাওয়ারীর সংখ্যা বারোজন বলে উল্লেখ করেছেন। (তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন, ২:৭১)

'ঈসা 'আলাইহিস সালামের হাওয়ারী

পবিত্র কুরআনের বর্ণিত উক্ত আয়াতে এসব হাওয়ারীর কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে। তারাই হযরত 'ঈসা 'আলাইহিস সালামের আহ্বানে সাড়া দিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দীনের কাজে তার সাহায্যকারী হয়েছেন এবং এ কাজে সফলতার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করেছেন। উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে,

فَلَمَّآ اَحَسَّ عِيْسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِىْٓ اِلَى اللّٰهِ

অতঃপর যখন 'ঈসা তাদের কুফরী উপলব্ধি করলেন, তখন তিনি (তার অনুসারীদের লক্ষ করে) বললেন, কে কে আছে, যারা আল্লাহর পথে আমার সাহায্যকারী হবে?

এতে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, হযরত 'ঈসা 'আলাইহিস সালাম নবুওয়্যাতের শুরুতে একাই দাওয়াতের কাজ সম্পাদন করেছেন।

কোন জামা'আত গঠনের অপেক্ষায় থাকেন নি। এ কারণে পরবর্তীকালে দাওয়াতের পরিধি বিস্তৃত করার জন্য তিনি যখন জামা'আত গঠনের আহ্বান করলেন, তখন তার আহ্বানে অনায়াসেই তা গঠন হয়ে গেলো। সুতরাং যে কোন পরিস্থিতিতে অবস্থা অনুযায়ী দীনী দাওয়াতের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। আরো বুঝা যায়, দীনের দাওয়াতসহ প্রত্যেক কাজই এমন পাহাড়সম দৃঢ়তা ও হিম্মতের দাবি রাখে। (তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন, ২:৭১)

হাওয়ারীদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে ইরশাদ করেন,

وَاِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيّٖنَ اَنْ اٰمِنُوْا بِىْ وَبِرَسُوْلِىْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا وَاشْهَدْ بِاَنَّنَا مُسْلِمُوْنَ

স্মরণ করুন, যখন আমি হাওয়ারীদের নিকট আপনার মাধ্যমে এ প্রত্যাদেশ পাঠিয়েছি যে, তোমরা আমার প্রতি ও আমার প্রেরিত রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করো। তারা জবাবে বললেন, আমরা ঈমান এনেছি এবং (আয় আল্লাহ,) আপনি সাক্ষী থাকুন, আমরা পূর্ণ অনুগত। (সূরা মায়িদা, আয়াত:১১১)

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের অপর আয়াতে ইরশাদ করেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْٓا اَنْصَارَ اللّٰهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيّٖنَ مَنْ اَنْصَارِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ فَاٰمَنَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَكَفَرَتْ طَّآئِفَةٌ ۚ فَاَيَّدْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰى عَدُوِّهِمْ فَاَصْبَحُوْا ظٰهِرِيْنَ۝

হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর দীনের সাহায্যকারী হয়ে যাও, যেমন, মারিয়ম তনয় 'ঈসা হাওয়ারীদের বলেছেন, আল্লাহর পথে কে কে আমার সাহায্যকারী হবে? হাওয়ারীগণ বললেন, আমরা আল্লাহর দীনের সাহায্যকারী। তারপর বনী ইসরাইলের একদল ঈমান আনলো এবং একদল কুফর করলো। তখন যারা ঈমান এনেছিল, আমি তাদের তাদের শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য করলাম। ফলে তারা বিজয়ী হলো। (সূরা সফ, আয়াত:১৪)

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

উপর্যুক্ত আয়াতগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, হাওয়ারীগণের ঈমানের দৃঢ়তা এবং সত্যকে অকপটে মেনে নেওয়ার দৃষ্টান্ত ছিলো বেনজির। দীনে হকের বুলন্দী ও সুপ্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য তারা আমরণ ত্যাগ-তিতিক্ষা ও অপূর্ব কুরবানী দৃষ্টান্ত পেশ করেছিলো। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুসলিমার মুমিনদেরকে দীনের সাহায্যের জন্য আদেশ করে সেই হাওয়ারীদের কথা দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করেছেন।

এ হাওয়ারীগণ 'ঈসা 'আলাইহিস সালামের জীবদ্দশায় যেমন দীনের উন্নতি সাধনকল্পে মেহনত-মুজাহাদা করেছেন, তেমনি তার দুনিয়া হতে আসমানে চলে যাওয়ার পরও যথারীতি দীনের মেহনত-মুজাহাদা অব্যাহত রেখেছেন।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ اَنْ يُّنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ ؕ قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○ قَالُوْا نُرِيْدُ اَنْ نَّاْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُنَا وَنَعْلَمَ اَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُوْنَ عَلَيْهَا مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ○ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَآ اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِّاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَ اٰيَةً مِّنْكَ ۚ وَارْزُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ○ قَالَ اللّٰهُ اِنِّيْ مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَاِنِّيْٓ اُعَذِّبُهٗ عَذَابًا لَّآ اُعَذِّبُهٗٓ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ○

যখন হাওয়ারীগণ বললো, হে 'ঈসা ইবনে মারিয়াম, আপনার প্রভু কি আমাদের জন্য আসমান থেকে (খাদ্যের) একটা খাঞ্চা-মায়িদা অবতীর্ণ করতে পারেন না? 'ঈসা 'আলাইহিস সালাম বললেন, আল্লাহকে ভয় করো, যদি তোমরা মুমিন হও। তারা বললো, আমরা চাই, তা থেকে আমরা খাবো এবং আমাদের অন্তর পূর্ণ প্রশান্তি লাভ করবে আর আমরা (পূর্বের চেয়ে অধিক প্রত্যয়ের সাথে) জানতে পারবো, আপনি আমাদের যা-কিছু বলেছেন, তা সত্য এবং আমরা এ বিষয়ে সাক্ষ্যদাতাদের অন্তর্ভুক্ত হবো। তখন 'ঈসা ইবনে মারিয়াম

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

আল্লাহর দরবারে আবেদন করলেন, হে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, আমাদের জন্য আসমান থেকে একটি খাঞ্চা অবতীর্ণ করুন, যা আমাদের জন্য আনন্দ উদ্যাপনের কারণ হবে আমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য ও পরবর্তীদের জন্য এবং আপনার পক্ষ হতে একটি নিদর্শন হবে। আমাদের এ নিয়ামত প্রদান করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা। আল্লাহ বললেন, আমি নিঃসন্দেহে তোমাদের জন্য সে খাঞ্চা অবতীর্ণ করবো, কিন্তু তারপর তোমাদের মধ্যে যে কুফরী করবে, আমি তাকে এমন শাস্তি দিব, যে শাস্তি বিশ্বজগতের অন্যকাউকে দেব না। (সূরা মায়িদা, আয়াত:১১২-১১৫)

নুযুলে মায়িদার ঘটনা

হাওয়ারীগণ মজবুত ঈমানের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের অন্তরের প্রশান্তির জন্য হযরত 'ঈসা 'আলাইহিস সালামের নিকট দরখাস্ত করলেন, আল্লাহ তা'আলা যেন খাদ্যভর্তি একটি খাঞ্চা নাযিল করেন।

যেহেতু আল্লাহ তা'আলাকে মানতে হবে মৌলিকভাবে চাক্ষুষ নিদর্শন প্রত্যক্ষ করা ছাড়াই। ঈমান বিল গাইব বলতে এটাই বুঝানো হয়। সুতরাং এরপরও যদি কোন নিদর্শন প্রার্থনা করা হয় এবং আল্লাহ সে নিদর্শন প্রদান করেন, তাহলে সেটা প্রত্যক্ষ করার পর কোনরকম নাফরমানী মারাত্মক অপরাধ বলে বিবেচিত হয়। এ জন্য বর্ণিত আয়াতে উক্ত খাঞ্চা অবতরণের পর নাফরমানী করলে, তাদের সবচেয়ে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ার করে দেওয়া হয়েছিল।

উক্ত খাঞ্চা নাযিল হয়েছিল কি না পবিত্র কুরআনে তা বলা হয়নি। কোন মারফু হাদীসেও তার উল্লেখ নেই। তবে সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণের বক্তব্যে এর আলোচনা পাওয়া যায়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. ও হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসার রা.-এর বর্ণনামতে, খাঞ্চা নাযিল হয়েছিল। জমহুর আলেমের মত এটাই। খাঞ্চা চল্লিশদিন পর্যন্ত অবতীর্ণ হয়েছিল। সেই খাঞ্চায় ছিলো

TOP

সাতটি মাছ ও সাতটি রুটি। ফেরেশতাগণ সেই খাঞ্চা এনে তাদের সামনে রেখে দেন। সেই খাঞ্চার খাবার তাদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকল লোক আহার করেন।

তাদেরকে বলা হয়, এখান থেকে খাবে, কিন্তু পরবর্তী দিনের জন্য জমা করে রাখবে না এবং কোনরূপ খিয়ানত করবে না। কিন্তু কিছুদিন যেতেই তাদের অনেকে সে আদেশ অমান্য করলো। তখন সেই খাঞ্চা নাযিল হওয়া বন্ধ হয়ে গেলো এবং নাফরমানদের শাস্তিস্বরূপ শূকর ও বানরে পরিণত করা হলো। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, ৭:৯৫৩)

উল্লেখ্য, উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে, নাফরমান হাওয়ারীদের দুনিয়ার সবচেয়ে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে। আবার অন্য আয়াতে ফেরাউন ও তার অনুসারীদের সবচেয়ে কঠিন শাস্তিদানের কথা বর্ণনা করে ইরশাদ হয়েছে,

اَدۡخِلُوۡۤا اٰلَ فِرۡعَوۡنَ اَشَدَّ الۡعَذَابِ

কিয়ামতের দিন (ফেরেশতাদের বলা হবে) ফেরাউনের দলবলকে সবচেয়ে কঠিন আযাবের মধ্যে প্রবিষ্ট করো। (সূরা মুমিন, আয়াত:৪৬)

অপরদিকে মুনাফিকদের জাহান্নামের সবচেয়ে নিম্নগহ্বরে শাস্তিদানের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে,

اِنَّ الۡمُنٰفِقِيۡنَ فِى الدَّرۡكِ الۡاَسۡفَلِ مِنَ النَّارِ

নিশ্চয় মুনাফিকরা জাহান্নামের সবচেয়ে নিম্নগহ্বরে থাকবে। (সূরা নিসা, আয়াত:১৪৫)

এ ব্যাপারে ইবনে জারীর রহ. বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. বলেছেন, কিয়ামতের দিন তিন প্রকার লোককে কঠিনতম শাস্তি প্রদান করা হবে। ১. মুনাফিক; ২. খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা অবতরণের পর যারা কুফরী করেছিলো এবং ৩. ফেরাউনের দলবল। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, ৭:৯৫৩)

‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামকে হত্যার অপচেষ্টা

আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. বলেন, হযরত 'ঈসা 'আলাইহিস সালামের নবুওয়্যাত লাভের পর ইহুদীদের গাত্রদাহ শুরু হয়ে গেল। তারা হযরত 'ঈসা 'আলাইহিস সালামের মুজিযাসমূহ অস্বীকার তো করল-ই, সেই সাথে নানাভাবে তার বিরুদ্ধাচরণ করলো এবং তাকে কষ্ট দেওয়ার সম্ভাব্য সব পথ তারা অবলম্বন করলো। যার দরূন হযরত 'ঈসা 'আলাইহিস সালাম সেখানে থাকতে পারলেন না। তখন তিনি তার মাকে নিয়ে বিভিন্ন নগরী সফর করতে লাগলেন এবং সেখানকার মানুষদের দীনের দাওয়াত দিতে লাগলেন।

ইহুদীরা যখন সব প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে গেলো এবং হযরত 'ঈসা 'আলাইহিস সালামকে দীনের দাওয়াত থেকে নিবৃত্ত করতে পারলো না, তখন অন্যরকম প্রচেষ্টা হিসেবে তৎকালীন দামেশকের নক্ষত্রপূজারী মুশরিক বাদশার কাছে খবর পাঠালো যে, বায়তুল মুকাদ্দাস এলাকায় এক লোক মানুষকে ফেতনায় ফেলে বিভ্রান্ত করে। তিনি বাদশার বিরুদ্ধে জনগণকে উসকে দেন। তখন সেই মুশরিক বাদশা ক্ষুব্ধ হয়ে বায়তুল মুকাদ্দাসের গভর্নরের নিকট চিঠি লিখলেন। তাতে তিনি ফরমান পাঠালেন, উক্ত ব্যক্তিকে পাকড়াও করা হোক এবং তাকে ধরে শূলে চড়িয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হোক। যেন লোকেরা তার ফেতনা থেকে নিরাপদ থাকে।

ফরমান আসার সাথে সাথে বায়তুল মুকাদ্দাসের গভর্নর কিছু ইহুদীকে নিয়ে সেই ঘরটি ঘেরাও করে ফেললো, যেখানে হযরত 'ঈসা 'আলাইহিস সালাম তার হাওয়ারীদের নিয়ে অবস্থান করছিলেন। সেই হাওয়ারীদের সংখ্যা ছিলো বারজন। দিনটি ছিলো শুক্রবার বাদ আসর।

যখন 'ঈসা 'আলাইহিস সালাম অনুভব করলেন যে, তার পক্ষে বের হয়ে অন্য কোথাও যাওয়ার উপায় নেই, তখন তিনি হাওয়ারীগণকে উদ্দেশ্য করে ঘোষণা দিলেন, তোমাদের মধ্যে কে আছে, যাকে আমার মতো করে দেওয়া হবে এবং তাকে শহীদ করা হবে, বিনিময়ে সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে?

GET ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

সে সময় তাদের মধ্য হতে একজন যুবক ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের আহ্বানে সাড়া দিলেন। ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম তাকে মনে করলেন যে, তিনি এতে সক্ষম হবেন না। অতঃপর দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার উক্ত ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করলেন। কিন্তু প্রত্যেক বারই ঐ যুবকই সাড়া দিলেন। তার আবেগ দেখে পরিশেষে ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম তাকে নির্বাচিত করে বললেন, তুমিই সেই ব্যক্তি। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা সেই যুবকের আকৃতি হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের মতো করে দিলেন। ইতোমধ্যে ঘরের ছাদ ফেটে রাস্তা হয়ে গেলো। তখন সেখান দিয়ে হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তা‘আলা আসমানে উঠিয়ে নিলেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ ؕ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ○ اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسٰٓى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ○

তারা (কাফেররা হযরত ‘ঈসার বিরুদ্ধে) চক্রান্ত করলো এবং আল্লাহও কৌশল করলেন। বস্তুত আল্লাহ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কৌশলী। (আল্লাহ তা‘আলার কৌশল সে সময় প্রকাশ পেল) যখন তিনি বললেন, হে ‘ঈসা, আমি আপনাকে সহীহ-সালামতে ফিরিয়ে নিব এবং আমার কাছে তুলে নিব এবং যারা কুফরী অবলম্বন করেছে, তাদের (উৎপীড়ন) থেকে আপনাকে মুক্ত করবো। আর যারা আপনার অনুসরণ করছে তাদের কিয়ামত দিবস পর্যন্ত সে সকল লোকের উপর প্রবল রাখবো, যারা আপনাকে অস্বীকার করেছে। তারপর তোমাদের সকলকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তোমাদের মধ্যে সে বিষয়ে মীমাংসা করবো, যা নিয়ে তোমরা বিরোধ করতে। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ৫৪-৫৫)

ইহুদীরা যখন হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করতে তার ঘর ঘেরাও করে ফেলে, তখন আল্লাহ তা‘আলা হযরত

TOP

GET ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামকে সান্তনাবাণী শুনিয়ে পাঁচটি প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। উপর্যুক্ত আয়াতে সেই পাঁচটি প্রতিশ্রুতির কথা ব্যক্ত করা হয়েছে।

১. হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম কাফেরদের শূলে বিদ্ধ হয়ে নিহত হবেন না, কিয়ামতের পূর্বে তাকে দুনিয়ায় প্রেরণ করে স্বাভাবিক মৃত্যু দান করা হবে।

২. এখন তাকে কাফেরদের থেকে রক্ষা করে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হবে।

৩. তাকে কাফেরদের অপবাদ থেকে মুক্ত করা হবে।

৪. যারা তাকে অনুসরণ করবে, তাদের কিয়ামত পর্যন্ত কাফেরদের উপর বিজয়ী করে রাখা হবে।

৫. তার ব্যাপারে মতভেদকারীদের মধ্যে কিয়ামতের দিন ফায়সালা করা হবে এবং নাফরমানদের শাস্তি দেওয়া হবে।

বর্ণিত পাঁচটি বিষয়ের প্রথমটি হচ্ছে, হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের আসমান থেকে কিয়ামতের পূর্বে দুনিয়ায় অবতরণ এবং নির্দিষ্ট কাল দুনিয়ায় জীবনযাপন করে স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ।

এ প্রসঙ্গে উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে, اِنِّیْ مُتَوَفِّیْكَ আমি আপনাকে স্বাভাবিক ওফাত দান করবো। এর ব্যাখ্যায় রঈসুল মুফাসসিরীন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর তাফসীর হচ্ছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِیْ قَوْلِهٖ تَعَالٰی اِنِّیْ مُتَوَفِّیْكَ وَرَافِعُكَ اِلَیَّ یَعْنِیْ رَافِعُكَ ثُمَّ مُتَوَفِّیْكَ فِیْ اٰخِرِ الزَّمَانِ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, এখানে আল্লাহ তা‘আলা বলছেন, আপনাকে আসমানে উঠিয়ে নিবো এবং আখিরী যমানায় (কিয়ামতের পূর্বে) ওফাত দান করবো। (দুররে মানসূর ২:৩৬)

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

আল্লাহ তা‘আলা ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামকে আসমানে উঠিয়ে নেয়ার পর মুহূর্তে বাদশার লোকেরা কক্ষে প্রবেশ করে হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের সাদৃশ্য ঐ যুবকটিকে দেখে তাকেই ‘ঈসা মনে করে ধরে নিয়ে শূলে চড়ালো।

এ ব্যাপারে ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের ভ্রান্তি

এ ঘটনার কারণেই ইহুদীরা মনে করেছে, তারা ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামকে শূলে চড়িয়েছে। তেমনিভাবে সাধারণ খ্রিস্টানরা, যারা প্রকৃত অবস্থা প্রত্যক্ষ করেনি, তারাও ইহুদীদের এ মিথ্যা কথা বিশ্বাস করে তাদের সাথে একমত হয়ে গেছে। অথচ আসল ঘটনা সম্পূর্ণ ভিন্ন, যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। এ ঘটনার এমন বিবরণই কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। পবিত্র কুরআনের এ ব্যাপারে ইরশাদ হয়েছে,

وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللهِ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا، بَلْ رَّفَعَهُ اللهُ اِلَيْهِ وَكَانَ اللهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا○

“তারা ‘ঈসাকে হত্যা করেনি এবং শূলেও চড়াতে পারেনি। তবে তাদের বিভ্রম হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে যারা এ সম্পর্কে মতভেদ করেছে, তারা এ বিষয়ে সংশয়ে নিপতিত এবং এ বিষয়ে অনুমানের অনুসরণ ছাড়া তাদের প্রকৃত কোন জ্ঞান ছিলো না। সত্য কথা হচ্ছে, তারা ‘ঈসাকে হত্যা করেনি। বরং আল্লাহ তাকে নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন। বস্তুত আল্লাহ মহা ক্ষমতার অধিকারী ও অতি প্রজ্ঞাবান।” (সূরা নিসা, আয়াত:১৫৭-১৫৮)

উক্ত আয়াতে স্পষ্টভাবে প্রমাণ হয় যে, হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামকে ইহুদীরা হত্যা করতে পারেনি, বরং আল্লাহ তা‘আলা তাকে কুদরতীভাবে আসমানে তুলে নিয়েছেন। ইয়াহুদী-খ্রিস্টানরা এ ব্যাপারে ভুলে নিপতিত। সুতরাং হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের ব্যাপারে মুসলিমদের সঠিক বিশ্বাস রাখা কর্তব্য।

TOP

কিয়ামতের পূর্বে ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের অবতরণ

উক্ত আয়াতের একটি অংশে হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের ব্যাপারে কিয়ামতের পূর্বে দুনিয়ায় অবতরণের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। তিনি কিয়ামতের পূর্বে উম্মতে মুহাম্মদীর মাঝে অবস্থান করে তাদের নেতৃত্ব দান করবেন এবং দাজ্জালকে হত্যা করবেন। এ সম্পর্কে বহু মুতাওয়াতির হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যা এ ব্যাপারে অকাট্য বর্ণনা প্রদান করেছে। এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. স্বীয় তাফসীরগ্রন্থে লিখেছেন,

وَقَدْ تَوَا تَرَتِ الْاَحَادِيْثُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّه اَخْبَرَ بِنُزُوْلِ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِمَامًا عَادِلًا.

এ ব্যাপারে হাদীসসমূহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে মুতাওয়াতিরভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, কিয়ামতের পূর্বে হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের ন্যায়পরায়ণ নেতারূপে অবতরণের সংবাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন। (তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন, ২:৬৪)

কিয়ামতের পূর্বে হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের আসমান থেকে অবতরণ এবং তার তখনকার যাবতীয় অবস্থা প্রসঙ্গে হাদীস শরীফে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। নিম্নে এ সম্পর্কিত বিবরণ হাদীসের আলোকে পেশ করা হলো।

‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের অবতরণের প্রেক্ষাপট

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার ও ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের মাঝে কোন নবী আগমন করেননি। অবশ্যই তিনি দুনিয়ায় পুনরায় অবতরণ করবেন। তোমরা যখন তাকে দেখবে, তখন অনায়াসেই তোমরা তাকে চিনতে পারবে। তিনি মধ্যম গড়নের, গায়ের রং উজ্জ্বল, হালকা হলুদ রং-এর জোড়া পরিহিত থাকবেন। মনে হবে তার চুল থেকে পানি ঝরছে (গোসল করে বের হলে যেমন হয়)। অথচ তাকে

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

পানি স্পর্শ করেনি। তিনি ইসলামের পক্ষে কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করবেন। খ্রিস্টানদের ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন এবং শূকর হত্যা করবেন। তিনি জিযিয়া-কর উঠিয়ে দিবেন। তার সময়ে আল্লাহ তা'আলা ইসলাম ব্যতীত সব ধর্ম বিলীন করে দিবেন। আর 'ঈসা 'আলাইহিস সালাম দাজ্জালকে ধ্বংস করবেন। অতঃপর তার স্বাভাবিক ওফাত হবে। মুসলিমরা তার জানাযার নামায সম্পন্ন করে রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযার পার্শ্বে তাকে দাফন করবেন। (সুনানে আবু দাউদ, ৪:১১৭; মুসনাদে আহমাদ, ২:৪৩৭; ইবনে জারির, ৬:১৬; দুররে মানসুর, ২:২৪২; ফাতহুল বারী, ৬:৩৫৭)

হযরত আমর ইবনে সুফিয়ান সাকাফী রহ. বলেন, আমাকে জনৈক আনসারী একজন সাহাবীর সূত্রে জানিয়েছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, অতঃপর মুসলিমরা এমন অন্ধকারে পতিত হবে যে, কোন ব্যক্তি (যদি সে অন্ধকারে হাত প্রসারিত করে তা হলে সে) নিজে নিজের হাত দেখতে পাবে না। ঠিক তখনই হযরত 'ঈসা ইবনে মারিয়াম 'আলাইহিস সালাম অবতরণ করবেন। লোকদের সামনে তিনি আত্মপ্রকাশ করবেন। তারা তাদের সামনে এমন একজন ব্যক্তিকে দেখতে পাবে, যার পরনে থাকবে লৌহবর্ম এবং হাতে থাকবে (বর্শা বা বল্লমের মতো) যুদ্ধাস্ত্র। তারা তাকে জিজ্ঞাসা করবে, 'আপনি কে'? জবাবে তিনি বলবেন, আমি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল এবং (তার প্রেরিত) রুহ ও কালেমা 'ঈসা ইবনে মারিয়াম। (দুররে মানসুর, ২:২৪৩; তারীখে দিমাশক, ১:৬১৫)

'ঈসা 'আলাইহিস সালামের অবতরণের প্রকৃতি

হযরত নাওয়াস ইবনে সামআন রা. বলেন, 'ঈসা 'আলাইহিস সালাম দামেশকের পূর্বদিকে সাদা মিনারের নিকট অবতরণ করবেন। তিনি হালকা হলুদ রঙের জোড়া পরিহিত অবস্থায় দুজন ফেরেশতার কাঁধে ভর করে নামবেন। যখন তিনি মাথা নিচু করবেন, তখন মাথা থেকে পানির ফোঁটা টপকে পড়বে এবং মাথা উঁচু করলেও পানির ফোঁটা

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

পড়বে। যে পানির ফোঁটা মুক্তার ন্যায় রুপার টুকরার মতো স্বচ্ছ হবে। তার নিঃশ্বাসের বাতাস যেই কাফেরকেই স্পর্শ করবে, সে-ই মারা যাবে। তার নিঃশ্বাসের বাতাস তার দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত ছড়িয়ে যাবে। তিনি দাজ্জালকে বাবে লুদ্দ-এর নিকটে পাবেন এবং সেখানেই তাকে হত্যা করবেন। (মুসলিম শরীফ, ২:৪০২; সুনানে আবু দাউদ, ৪:১১৭; জামে তিরমিযী, ৯:৯২; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ১৩৫৬; মুসনাদে আহমাদ ৪:১৮১)

‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের অবতরণকালীন অবস্থা

হযরত উসমান ইবনে আবুল আস রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম ফজরের নামাযের সময় অবতরণ করবেন। তখন মুসলিমদের আমীর (মাহদী) তার নিকট আবেদন জানাবেন, হে আল্লাহর রুহ, আপনি নামায পড়ান। তিনি বলবেন, এ উম্মত, একে অন্যের উপর আমীর। তখন আমীর (ইমাম মাহদী) অগ্রসর হয়ে নামায পড়াবেন। (মুসনাদে আহমাদ, ৪:২১৬; মুসতাদরাকে হাকিম, ৪:৪৭৮)

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘ঈসা ইবনে মারিয়াম অবতরণ করবেন জমিনের শ্রেষ্ঠ ও নেক লোকদের নিকট। আর তাদের সংখ্যা হবে ৮শ পুরুষ ও ৪শ মহিলা। (কানযুল উম্মাল, ৭:২০৩)

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন মুসলিমরা কুসতুনতুনিয়া থেকে সিরিয়ার কুদসে প্রবেশ করবে, তখন দাজ্জালের প্রাদুর্ভাব হবে। তখন তার ও তার দলবলের মোকাবেলার জন্য মুসলিমরা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে কাতার সোজা করবে। ইতোমধ্যে ইকামত হয়ে যাবে। ঠিক তখনই ‘ঈসা ইবনে মারিয়াম অবতরণ করবেন। তিনি মুসলিমদের আমীরকে (ইমাম মাহদীকে) নামাযের আদেশ করবেন। যখন আল্লাহর দুশমন দাজ্জাল ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামকে দেখবে, তখন এমনভাবে গলে

TOP

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

যাবে, যেমন লবণ পানিতে গলে যায়। আল্লাহ তা'আলা দাজ্জালকে 'ঈসা 'আলাইহিস সালামের হাতে ধ্বংস করবেন। 'ঈসা 'আলাইহিস সালাম তাকে হত্যা করে তার রক্তমাখা অস্ত্র মুসলিমদের দেখাবেন। (মুসলিম শরীফ, ২:৪০৩)

মোল্লা আলী কারী রহ. মিশকাতের ব্যাখ্যাগ্রন্থ মিরকাতের ৫ম খণ্ডে ১৯৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, ইবনে কাসীর রহ. বলেন, এই রেওয়ায়েতে আছে, 'ঈসা 'আলাইহিস সালাম বায়তুল মুকাদ্দাসে অবতরণ করবেন। অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি জর্দানে অবতরণ করবেন। অপর বর্ণনামতে, তিনি মুসলিম-সেনাসদরে অবতরণ করবেন। মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন, বায়তুল মুকাদ্দাসে অবতরণ করার হাদীস ইবনে মাজাহ রহ. বর্ণনা করেছেন। সেটাই আমার নিকট অধিক গ্রহণযোগ্য। যদিও আজ বায়তুল মুকাদ্দাসে কোন মিনার নেই, তবু তার অবতরণের পূর্বে সেখানে মিনার নির্মিত হবে বলা যায়।

অবতরণের পর 'ঈসা 'আলাইহিস সালামের জীবনযাপন

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'ঈসা 'আলাইহিস সালাম পৃথিবীতে চল্লিশ বছর অবস্থান করবেন। (সুনানে আবু দাউদ ৪:১১৭; মুসনাদে আহমাদ ২:৪৩৭)

কিন্তু সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় আছে, অতঃপর লোকেরা সাত বছর অবস্থান করবে'। শায়েখ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দা রহ. বলেন, আমার দেখা সহীহ মুসলিমের সমস্ত নোসখায় এমনটি পেয়েছি। তেমনিভাবে মুসনাদে আহমদ, দুররে মানসুর ও মুসতাদরাকে এরূপই বর্ণিত হয়েছে। আর এটা সহীহ বর্ণনা। আমার মতে, এর অর্থ হলো, লোকজন দীর্ঘ অনেক বছর বসবাস করবে। আর এই দীর্ঘ বছরের বিশ্লেষণ হলো চল্লিশ বছর।

সুনানে আবু দাউদ ও মুসনাদে আহমদ-এর বর্ণনায় এর সমর্থন পাওয়া যায়। সেখানে বর্ণনা করা হয়েছে, 'ঈসা 'আলাইহিস সালাম

পৃথিবীতে দীর্ঘদিন এমন অবস্থায় বসবাস করবেন যে, তাদের মাঝে শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না, থাকবে শুধু ভ্রাতৃত্ব।

সুতরাং বুঝা গেলো, পূর্বোক্ত হাদীসে সাত বলে অধিকসংখ্যক বুঝানোই উদ্দেশ্য। যেমন, পবিত্র কুরআনের এক স্থানে বলা হয়েছে, যদি সাত সমুদ্রের পানি কালি হয় (এবং তা নিঃশেষ হয়ে যায়), তারপর আরো সাত সমুদ্র তার পরে যোগ করা হয়, তবু আল্লাহর গুণগান শেষ হবে না।

আল্লামা আলুসী রহ. এর ব্যাখ্যা বলেন, এখানে সাত সমুদ্র দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অধিক সংখ্যক সমুদ্র, যা হাজার ও লাখ সংখ্যাকেও শামিল করে। এখানে নির্দিষ্ট সাত উদ্দেশ্য নয়।

এ জন্য আল্লামা ইবনে হাজার রহ. বলেন, ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের পুরো অবস্থান অবতরণের পর চল্লিশ বছর হবে। আর তিনি সাত বছরের বর্ণনা উল্লেখ করার পর সহীহ রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন, যাতে চল্লিশ বছরের কথা আছে এবং রেওয়ায়েতগুলো উল্লেখ করার পর তিনি কোন মন্তব্য করেননি। (আত-তাসরীহ বিমা তাওয়াতারা ফি নুযূলিল মাসীহ, ১২৮ পৃষ্ঠা)

অবশ্য মিশকাত শরীফের এক হাদীস দ্বারা জানা যায়, তিনি আসমান থেকে অবতরণের পর ৪৫ বছর জীবিত থাকবেন।

‘ঈসা আ. এর বিবাহ ও দাম্পত্যজীবন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুযাম গোত্রের প্রতিনিধিদলকে সম্বোধন করে বলেছেন, মারহাবা শু‘আইব ‘আলাইহিস সালামের সম্প্রদায় এবং মুসা ‘আলাইহিস সালামের শ্বশুরালয়। কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না তোমাদের মাঝে হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম অবতরণ করেন এবং তার সন্তান হবে।

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

মুকরিযী রহ. খুতুবাতে উল্লেখ করেছেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'নিশ্চয় 'ঈসা 'আলাইহিস সালাম জমিনে এসে বিবাহ করবেন এবং তার সন্তান হবে। তিনি (বিয়ের পর) উনিশ বছর অবস্থান করবেন। (ফাতহুল বারী, ৬:৩৫৭)

পৃথিবীতে অবতরণের পর 'ঈসা আ. কী করবেন

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না 'ঈসা ইবনে মারিয়াম ন্যায়পরায়ণ বিচারক ও ইনসাফগার নেতা হিসেবে অবতরণ করবেন। তিনি ক্রুশ ধ্বংস করবেন এবং শূকর হত্যা করবেন। তিনি জিযিয়ার বিধান উঠিয়ে দিবেন। তিনি এত পরিমাণ মাল দান করবেন যে, তা গ্রহণ করার মতো লোক থাকবে না। (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ১৩৬৩; মুসনাদে আহমাদ, ২:৪৯৪)

'ঈসা 'আলাইহিস সালাম দাজ্জালকে হত্যা করা সম্পর্কে হযরত আবু উমামা বাহেলী রহ. হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ফজরের নামায শেষে 'ঈসা 'আলাইহিস সালাম বলবেন, (মসজিদের) দরজা খোল। তখন সে দরজা খোলা হবে। সে সময় দরজার পিছনে থাকবে দাজ্জাল ও তার সঙ্গী সত্তর হাজার ইহুদী, যারা সবাই চাদর পরিহিত এবং তলোয়ার হাতে ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত থাকবে। যখন দাজ্জাল 'ঈসা 'আলাইহিস সালামের দিকে তাকাবে, তখন এমনভাবে গলে যাবে যেমন পানিতে লবণ গলে যায়। অতঃপর সে পলায়ন করতে চাইবে। তখন 'ঈসা 'আলাইহিস সালাম বলবেন, আমি তোমাকে হত্যা করবো, তুমি আমার হাত থেকে রেহাই পাবে না। অতঃপর তার পিছনে ধাওয়া করে 'ঈসা 'আলাইহিস সালাম তাকে বাবে লুদ্দ-এর নিকট পাবেন এবং সেখানে তাকে হত্যা করবেন। তখন আল্লাহ তা'আলা ইহুদীদের পরাস্ত করবেন। এমনকি যে বস্তুর পিছনে কোন ইহুদী লুকিয়ে থাকবে,

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

আল্লাহ সে বস্তুকে কথা বলার ক্ষমতা দান করবেন, পাথর, গাছ, দেয়াল এবং প্রত্যেক বস্তুকে বাকশক্তি দান করবেন। তবে গারকাদ তথা ঝাউগাছকে বাকশক্তি দান করবেন না। কেননা, এটা ইহুদীদের বপনকৃত গাছ, তাই এ গাছ কথা বলবে না। এটা ছাড়া অন্য প্রত্যেক বস্তু এভাবে বলবে, হে আল্লাহর বান্দা, এই তো এক ইহুদী আমার পিছনে! এসো, তাকে হত্যা করো। তখন প্রত্যেকে এগিয়ে আসবে এবং বুকের উপর তলোয়ার দিয়ে আঘাত করে ইহুদীকে হত্যা করবে। (সহীহ বুখারী, ৬:৭৫; মুসনাদে আহমাদ, ৪:২১৬; দুররে মানসুর, ২:২৪৩)

‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম ইসলাম ছাড়া সব ধর্মকে বাতিল করে দিবেন মর্মে হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা‘আলা ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের যামানায় সব ধর্ম নিঃশেষ করে দিবেন। শুধু ইসলাম বাকি থাকবে। (ফাতহুল বারী, ৬৩৫৭)

তেমনি হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম ‘রাওহা’ নামক স্থানে অবতরণ করবেন। সেখান থেকে হজ্বের ইহরাম বাঁধবেন। এরপর আবু হুরায়রা রা. নিম্নের আয়াতখানা তিলাওয়াত করেন,

وَاِنۡ مِّنۡ اَهۡلِ الۡكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤۡمِنَنَّ بِهٖ قَبۡلَ مَوۡتِهٖ

আহলে কিতাবদের যারাই থাকবে, তারা তার মৃত্যুর পূর্বে অবশ্যই ঈমান আনবে।

দুররে মানসূরের বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম আমার কবরের নিকট তাশরীফ আনবেন এবং আমাকে সালাম দিবেন। আমি তার সালামের জবাব দিবো। (সহীহ মুসলিম, ২:২০৪; মুসনাদে আহমাদ, ২:২৯০)

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

অপর বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম কিতাবুল্লাহ এবং আমার সুন্নতের উপর আমল করবেন। যখন তার ইন্তেকালের সময় হবে, তখন তার হুকুমে বনী তামিরের এক ব্যক্তিকে খলীফা নিযুক্ত করা হবে। তার নাম হবে মুক‘আদ।

‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম যখন মারা যাবেন, তখন মানুষ তিন বছর সময় স্বাভাবিকভাবেই অতিবাহিত করবে। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা লোকদের সীনা হতে কুরআন ও মাসহাফ উঠিয়ে নিবেন। (ইশা‘আত, ২৪০ পৃষ্ঠা, হাবী, ২৮৯ পৃষ্ঠা)

‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের আবির্ভাবকালীন বরকত

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের সময় জমিনকে বলা হবে, তোমার সব ফল উৎপন্ন করো এবং বরকত ফিরিয়ে দাও। তখন একটা ডালিম একদল লোক খেয়ে শেষ করতে পারবে না এবং তার খোসার ছায়ায় অনেকে ছায়া গ্রহণ করতে পারবে।

আর দোহনকৃত দুধে এমন বরকত দান করা হবে, একটা দুগ্ধদানকারিণী উষ্ট্রীর দুধ একটা বড় জামাতের জন্য যথেষ্ট হবে এবং একটা গাভীর দুধ একটা গোত্রের লোকদের তৃপ্ত করে দিবে। আর একটা বকরির দুধ একটা পরিবারের পরিতৃপ্তির জন্য যথেষ্ট হবে। (সুনানে আবু দাউদ, ৪:১১৭)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, লোকেরা অনেক বছর এমনভাবে বসবাস করবে যে, তাদের মাঝে শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না। (মুসনাদে আহমাদ, ২:১৬৬)

ইয়াজুজ ও মাজুজের আবির্ভাব এবং ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের তুর পর্বতে অবস্থানগ্রহণ

TOP

হযরত নাওয়াস ইবনে সামআন রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, অতঃপর (যুদ্ধ শেষে) ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের নিকট এক বাহিনী আসবে, যাদের আল্লাহ তা‘আলা দাজ্জালের ফেতনা থেকে হেফাজত করবেন। ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম তাদের চেহারা থেকে যুদ্ধ-সফরের ধূলা-বালি মুছে দিবেন এবং জান্নাতে তাদের মর্যাদার বিষয়ে বয়ান করবেন।

এমন সময় আল্লাহ তা‘আলা হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের নিকট এই মর্মে ওহী পাঠাবেন যে, এখন আমি আমার এমন বিশেষ বান্দাদের দুনিয়াতে বিচরণের সুযোগ দেবো, যাদের সাথে যুদ্ধ করার ক্ষমতা ও সাহস কারো নেই। সুতরাং আপনি আমার নেকবান্দাদের নিয়ে তুর পাহাড়ে আশ্রয় নিন। এরপর আল্লাহ তা‘আলা ইয়াজুজ ও মাজুজকে ছেড়ে দিবেন। (তারা এত ক্ষিপ্রতার সাথে হামলা চালাবে, মনে হবে) তারা উঁচু ভূমি থেকে নেমে আসছে। তাদের সম্মুখবর্তীরা বুহাইরা তাবারিয়া সমুদ্র অতিক্রমকালে তার মধ্যে অবস্থিত সব পানি পান করে ফেলবে। তাদের পশ্চাদগামীরা সমুদ্র অতিক্রমকালে বলবে, ‘এখানে মনে হয় একসময় পানি ছিল’।

হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম ও তার সাথীরা তখন পাহাড়ে অবরুদ্ধ থাকবেন। সেসময় তাদের নিকট পাহাড়ের চূড়া দামি হবে যেমন তোমাদের নিকট আজ একশ দিনার দামি।

অতঃপর আল্লাহর নবী হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম ও তার সঙ্গীরা আল্লাহর নিকট কায়মনোবাক্যে দু‘আ করবেন। আল্লাহ তা‘আলা তাদের দু‘আ কবুল করবেন। ফলে আল্লাহ তা‘আলা ইয়াজুজ ও মাজুজের ঘাড়ে একপ্রকার কীট সৃষ্টি করে দিবেন। ফলে অল্প সময়ে খুব সহজে তারা মৃত্যুবরণ করবে, যেমন একজন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে। অতঃপর ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম ও তার সঙ্গীগণ জমিনে নেমে আসবেন। তখন পুরো জমিনে ইয়াজুজ ও মাজুজের লাশে পূর্ণ থাকবে

GET ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

এবং লাশের দুর্গন্ধে পরিবেশ দূষিত হয়ে যাবে। তারা জমিনের এক বিঘত জায়গাও ফাঁকা পাবেন না।

পুনরায় ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম ও তার সাথী মুমিনগণ আল্লাহর দরবারে দু‘আ করবেন। তখন আল্লাহ তা‘আলা লম্বা গরদানবিশিষ্ট একপ্রকার পাখি পাঠাবেন। পাখিগুলো সেসব লাশ বহন করে নিয়ে এমন স্থানে ফেলবে, যেখানে ফেলা আল্লাহর হুকুম হবে। (মুসনাদে আহমাদ, ৪:১৮১)

‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের পুনরায় আগমনের হেকমত

আল্লাহ তা‘আলা বিশেষ কিছু হেকমতের কারণে কিয়ামতের পূর্বে হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামকে আসমান থেকে দুনিয়ায় পাঠাবেন। সেই হেকমতগুলো নিম্নরূপ।

১. ইহুদীদের ধারণা, তারা ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামকে হত্যা করেছে। ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম এসে সেই ধারণা মিথ্যাপ্রতিপন্ন করবেন এবং নিজে ইহুদীদের মোকাবেলা করে তাদের হত্যা করবেন এবং তাদের গুরু দাজ্জালকে হত্যা করবেন।

২. খ্রিস্টানরা ভ্রান্ত আকীদা পোষণ করে যে, তাদের পাপ মোচনের জন্য ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম শূলীবিদ্ধ হয়ে মারা গিয়েছেন। এজন্য তারা ক্রুশ ব্যবহার করে। তাদের এ মিথ্যা দাবি খণ্ডন করার জন্য হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম দুনিয়াতে পুনরায় আগমন করবেন এবং ক্রুশ ধ্বংস করবেন।

৩. হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম পৃথিবীতে অবতরণ করবেন এই কারণে, যেন তাঁর ইন্তেকালের সময় ঘনিয়ে এলে তাঁকে জমিনে দাফন দেওয়া যায়। কেননা, মাটির সৃষ্টি মানুষের জন্য মাটিই মানানশীল।

৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণাবলীতে এ উম্মতের ফযিলত দেখে হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম এ উম্মতের

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

সাথে শামিল হওয়ার জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তার দু'আ কবুল করেছেন এবং কিয়ামতের পূর্বে তাকে এ উম্মতের মাঝে প্রেরণ করবেন। তবে তার নবুওয়্যাত তখনও বহাল থাকবে, তার নবুওয়্যাত রহিত করা হবে না। কিন্তু তার নবুওয়্যাতের উপর আমল হবে না, তখনও সবাই এবং তিনি নিজে আমল করবেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত দীন তথা পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ এবং ইসলামের উপর। এভাবে তখন তার উদাহরণ হবে নির্দিষ্ট প্রদেশের সেই প্রশাসকের মতো, যিনি কোন প্রয়োজনে অপর প্রশাসকের প্রদেশে গিয়েছেন। এক্ষেত্রেও তিনি নিজ প্রদেশের প্রশাসকরূপেই বহাল থাকেন, তার প্রশাসকের পদ বাতিল হয়ে যায় না। (আত-তাসরীহ, ৯৪ পৃষ্ঠা; কাসাসুল আম্বিয়া, ৬৭৪-৬৭৫ পৃষ্ঠা)

'ঈসা 'আলাইহিস সালামের ইন্তেকাল এবং রাসূলুল্লাহর রওযার পাশে তার দাফন

হযরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমার মনে হয়, আপনার পরে জীবনযাপন করতে পারবো। আপনি কি আমাকে আপনার নিকট সমাহিত হওয়ার অনুমতি দিবেন? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সেই জায়গা তুমি কি করে পাবে, সেখানে আমার, আবুবকর, উমর এবং 'ঈসা ইবনে মারিয়ামের কবরের জায়গা ছাড়া কোন জায়গা নেই? (কানযুল উম্মাল, ৭:২৬৮)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রা. বলেন, 'ঈসা ইবনে মারিয়াম 'আলাইহিস সালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার পাশে দাফনকৃত দু'সাহাবীর পাশে দাফন হবেন। সেখানে তার কবর হবে চতুর্থ। (দুররে মানসুর, ২:২৪৫)

এ সকল বর্ণনা দ্বারা কিয়ামতের পূর্বে হযরত 'ঈসা 'আলাইহিস সালামের আসমান থেকে অবতরণের বিস্তারিত বিবরণ জানা গেলো।

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

মুতাওয়াতির রেওয়ায়েতের কারণে এসব বিষয় ইয়াকিনের মর্যাদায় পৌঁছে। তাই এ ব্যাপারে প্রত্যেক মুসলমানের ঈমান রাখা কর্তব্য।

পরিশিষ্ট

হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম সম্পর্কে খ্রিস্টানরা যে বিশ্বাস পোষণ করে, তার সারমর্ম হলো, খোদার কালাম (অর্থাৎ পবিত্র সত্তা) মানুষের মুক্তির জন্য হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের মানবীয় দেহ ধারণ করেছিলেন। হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম যতদিন ইহজগতে ছিলেন, এ খোদায়ী সত্তা তার দেহে অধিষ্ঠিত ছিল। পরিশেষে যখন ইহুদীরা তাকে শূলে চড়ালো, তখন এ খোদায়ী সত্তা তার দেহ থেকে পৃথক হয়ে গেল। কবরে সমাহিত হওয়ার তিনদিন পর তিনি পুনরায় জীবিত হয়ে শিষ্যদের দেখা দিলেন। তারপর তাদের কিছু উপদেশ দিয়ে তিনি আসমানে চলে গেলেন। তাকে শূলে চড়ানোর ফলে খ্রিস্টধর্মে বিশ্বাসী সকলের পাপ মোচন হয়ে যায়, যা তারা হযরত আদমের ভুলের কারণে জন্মগতভাবে বহন করে আসছিল। (নাউযুবিল্লাহ)

জানা গেল তাদের বিশ্বাসের মৌলিক ধারা চারটি।

১. পবিত্র সত্তার অবতারত্ব ও মনুষ্য দেহধারণের বিশ্বাস।
২. ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার বিশ্বাস।
৩. পুনর্জীবন লাভ করার বিশ্বাস।
৪. পাপ মোচনের বিশ্বাস।

‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের জীবনের বাস্তব দিকগুলো আলোচনার মাধ্যমেই আশা করি খ্রিস্টানদের এ বিশ্বাসগুলোর ভ্রান্তি পাঠকের সামনে স্পষ্ট হয়ে গেছে।

হযরত ‘ঈসা আ.এর হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হঠকারী ইয়াহুদী জাতি

অপরাধ ও চিরস্থায়ী লাঞ্ছনার ইতিহাস

কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা‘আলা ইয়াহুদী জাতি সম্পর্কে বলেন,

TOP

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَ مَا ثُقِفُوْٓا اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ؕ

তাদেরকে (ইয়াহুদীদেরকে) যেখানেই পাওয়া যাক, তাদের উপর লাঞ্ছনার ছাপ লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। অবশ্য আল্লাহর তরফ হতে যদি কোনো উপায় সৃষ্টি হয়ে যায় কিংবা মানুষের পক্ষ হতে কেনো অবলম্বন বের হয়ে আসে (যা তাদেরকে পোষকতা দান করবে) তবে ভিন্ন কথা। এবং তারা আল্লাহর ক্রোধ নিয়ে ফিরেছে, আর তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে অভাবগ্রস্ততা। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত:১১২)

আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. এর ব্যাখ্যায় বলেন,

لَا يَزَالُوْنَ مُسْتَذَلِّينَ، مَنْ وَجَدَهُمْ اسْتَذَلَّهُمْ وَأَهَانَهُمْ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمُ الصَّغَارَ، وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ فِي أَنْفُسِهِمْ أَذِلَّاءُ مُتَمَسْكِنُونَ

“অর্থাৎ ইয়াহুদী জাতি সবসময় লাঞ্ছনার জীবন যাপন করবে। প্রত্যেক শাসকই তাদেরকে অপদস্থ ও অপমানিত করবে এবং তাদের উপর লাঞ্ছনার ইতিহাস রচনা করবে! এর পাশাপাশি তারা নিজেরাও অন্তরের দিকে থেকে অত্যন্ত দারিদ্রের শিকার!!” (তাফসীরে ইবনে কাসীর; সূরা বাকারা আয়াত; ৬১)

কুরআনে কারীমের এ আয়াত দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করছে যে, ইয়াহুদীদের উপর লাঞ্ছনা অবধারিত। তারা পৃথিবীর যে ভূখণ্ডেই থাকুক না কেনো। তবে হ্যাঁ, তাদের মধ্য হতে দু'শ্রেণি প্রকৃত অর্থে লাঞ্ছিত হলেও বাহ্যিকভাবে এ অপদস্থতা থেকে সাময়িক মুক্তি পেতে পারে,

১. যারা আল্লাহর আশ্রয় লাভ করেছে (অর্থাৎ যাদেরকে হত্যা করতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন) তথা নারী, শিশু এবং এমন ইবাদতগুজার ইয়াহুদী, যে মুসলমানদের শত্রুতা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকে।

TOP

২. যারা কোনো মুসলিম কিংবা অমুসলিম রাষ্ট্রের বশ্যতা মেনে নিয়ে কর আদায়ের শর্তে তাদের পোষকতা গ্রহণ করে নেয়। (তাফসীরে মাআরিফুল; সূরা বাকারা আয়াত; ৬১)

ইয়াহুদীদের নামকরণ

প্রসিদ্ধ নবী হযরত ইয়াকুব আ. এর অপর নাম ছিলো 'ইসরাইল'। তাঁর এ 'ইসরাইল' নামের দিকে সম্পৃক্ত করেই তাঁর বংশধরদেরকে পবিত্র কুরআনে কারীমে 'বনী ইসরাইল নামে (ইসরাঈলের বংশধর) নামে সম্বোধন করা হয়েছে।

অপরদিকে ইয়াকুব আ. এর এক সন্তানের নাম ছিলো 'ইয়াহুজা' (আরবীতে যার পরিবর্তিত রূপ হলো 'ইয়াহুদা') । তার দিকে সম্পৃক্ত করে বনী ইসরাঈলকে ইয়াহুদা বলা হয়। তবে ইসরাঈলী জাতি ইয়াহুদী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে খৃষ্টপূর্ব ৫৩৬ অব্দের পরবর্তী সময়ে। খৃষ্টপূর্ব ৫৯৭ এবং ৫৮৭ অব্দে ফিলিস্তিন ভূখণ্ড সম্রাট দ্বিতীয় বুখতে নাস্সার (Nebuchadnezzar II) এর আগ্রাসনের শিকার হয়। ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের পর অবশিষ্ট ইয়াহুদীরকে সম্রাট ব্যাবিলনে বন্দি করে নিয়ে যান। খৃষ্টপূর্ব ৫৩৬ অব্দে পারসিকরা ব্যবিলন দখল করলে ইয়াহুদীরা বন্দিদশা থেকে মুক্তি লাভ করে। তখন যে সকল ইয়াহুদী ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে ফিরে এসেছিলো, তাদের অধিকাংশই ছিলো বিনইয়ামীন ও ইয়াহুযা এর বংশধর। ইয়াহুদী ঐতিহাসিক শাহীন ম্যাকারিয়াস বলেন,

ومن ذلك الزمان يختفي ذكر الاسباط العشرة الاخرى , فمن عاد منهم الي فلسطين اختلط بسبطي يهوذا وبنيامين, وفي ذلك الحين سمي الاسرائليون باليهود و دعيت بلادهم اليهودية

বন্দিদশা থেকে ফিরে আসার পর অন্যান্য দশ গোত্রের আলোচনা ঢাকা পড়ে যায়। উক্ত দশ গোত্রের মধ্য হতে যারা ফিলিস্তিনে ফিরে এসেছিলো, তারাও ইয়াহুযা ও বিনইয়ামীনের বংশধরদের সাথে একীভূত হয়ে যায়। তখন থেকেই ইসরাঈলীদেরকে ইয়াহুদ এবং

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

তাদের ভূখণ্ডকে ইয়াহুদিয়া বলা হয়ে থাকে। [ইয়াহুদী ঐতিহাসিক শাহীন ম্যাকারিয়াস কৃত "তারীখুল ইসরাইলিয়্যিন" (মিসর ১৯০৯):৩১-৩২]

তবে কোনো কোনো উলামায়ে কেরামের মতে ইয়াহুদী শব্দটি আরবী 'হুদ' শব্দ হতে উদ্ভূত। যার অর্থ হলো, 'তওবা করা, প্রত্যাবর্তন করা'। হযরত মূসা আ. এর যামানায় বনী ইসরাঈল সম্প্রদায় তাদের কৃত অন্যায় থেকে এই 'হুদ' শব্দমূল দ্বারা আল্লাহর দরবারে তওবা করেছিলো। এ কারণেই তাদেরকে ইয়াহুদী বলা হয়ে থাকে। তাদের তওবার এ ঘটনা আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে কারীমে সূরা আরাফে:১৫৭ আয়াতে বর্ণনা করেছেন। (আল মুসতাওত্বনাতুল ইয়াহুদিয়্যাহ আলা আহর্দি রসূল, পৃ.২৩; দিরাসাত ফি আদইয়ানিল ইয়াহুদিয়্যাহ ওয়ান্ নাসরানিয়্যাহ, ১:৪৫)

মৌলিকভাবে হযরত ইয়াকুব আ. এর বংশধরগণকে বনী ইসরাইল বা ইয়াহুদী নামকরণের প্রেক্ষাপট এটাই। তাদের মাঝেই একসময় নবী হিসেবে আগমন করেছিলেন হযরত মূসা আ.। যার উপর আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেছিলেন আসমানী গ্রন্থ তাওরাত। কিন্তু লক্ষণীয় হলো, যুগ পরম্পরায় বনী ইসরাইলের উত্তরপুরুষরা তাদের পূর্বপুরুষগণের প্রকৃত আদর্শ এবং শিক্ষাকে বিকৃত করতে কোনো ধরণের কার্পণ্য করেনি। ফলে তাওরাতে যেমন বিকৃতি ঘটেছে, তেমনি ধর্মগ্রন্থের নামে তাদের পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গের হাতে ধর্মআইন হিসেবে রচিত হয়েছে 'মিশনাহ' এবং তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'তালমূদ'। বর্তমান সময়ে যে বা যারা তাদের এই বিকৃত তাওরাত ও মানব রচিত তালমূদের মতবাদ গ্রহণ করে তাদেরকেই 'ইয়াহুদী' নামে আখ্যায়িত করা হয়।

কাজেই প্রকৃত বনী ইসরাইল মৌলিকভাবে ইয়াকুব আ. এর বংশধর হলেও "বর্তমানের ইয়াহুদীরা নবীগণের বংশধর" এ কথা যেমন বলার সুযোগ নেই, তেমনি তারা যে ধর্মের নামে একটি মতবাদের

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

এবং আসমানী গ্রন্থের নামে বিকৃত এবং মানবরচিত পুস্তকের অনুসারী, তাও অস্বীকার করার অবকাশ নেই।

ইয়াহুদীরা কেনো লাঞ্ছনা এবং নির্যাতনের উপযুক্ত?!

ইয়াহুদীরা এমন একটি জাতি, পবিত্র কুরআনে কারীমে সূরা ফাতিহায় আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে ‘আল্লাহর গযবে নিপতিত জাতি’ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইয়াহুদীদের চেয়ে হঠকারী, সংকীর্ণমনা, প্রতিহিংসাপরায়ণ, কৃপণ, বিশ্বাসঘাতক, দুষ্কৃতিকারী আর কোনো জাতি নেই। এ কারণেই পবিত্র কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা‘আলা ইয়াহুদী জাতির দুশ্চরিত্রের কথা যতটা সুস্পষ্টরূপে উদ্ধৃত করেছেন, অন্য কোনো জাতির ক্ষেত্রে তেমনটি করেননি। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা‘আলা ইয়াহুদী জাতির অনেক মন্দ স্বভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ,

১. মিথ্যাবাদিতা

আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

اُنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ ؕ وَكَفٰى بِهٖۤ اِثْمًا مُّبِيْنًا۝

দেখ, তারা (ইয়াহুদীরা) আল্লাহর প্রতি কি রকমের মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে। প্রকাশ্য গুনাহের জন্য এটাই যথেষ্ট। (সূরা নিসা, আয়াত:৫০)

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, একবার দুই ইয়াহুদী নর-নারী ব্যভিচারে লিপ্ত হলে নবীজী ইয়াহুদদেরকে জিজ্ঞেস করলেন যে, ‘তাওরাতে এ অপরাধের কী শাস্তি রয়েছে?’ তারা (মিথ্যা) বললো যে, এ অপরাধের শাস্তি হলো, অপরাধীর চেহারা কালো করে দেওয়া এবং তাকে শহরময় ঘোরানো। নবীজি বললেন যে, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো, তবে তাওরাত নিয়ে এসো (কেননা তাওরাতেও ব্যভিচারের শাস্তি ছিলো পাথর মেরে হত্যা করা)।

তাওরাত আনা হলে এক ইয়াহুদী তা পাঠ আরম্ভ করলো এবং ব্যভিচারের শাস্তি ‘পাথর মেরে হত্যা’ এর আয়াতটি যখন এলো, তখন সে তার উপর হাত রেখে পড়ে যেতে লাগলো, যেন নবীজী তা দেখতে না পান। সঙ্গী সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে সালামের কথায় বুঝতে পেরে নবীজী যখন পাঠকারীকে হাত সরানোর নির্দেশ দিলেন তো দেখা গেলো যে, ব্যভিচারের শাস্তি ‘পাথর মেরে হত্যার বিধান’ লেখাটাকেই সে তার হাতের নীচে লুকাচ্ছিলো। (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬৯৯)

২. আল্লাহর শানে বেয়াদবী!

আল্লাহ তা‘আলার শানে মিথ্যা বলার পাশাপাশি তার শানে বেয়াদবী করাও ছিলো ইয়াহুদীদের স্বভাব-চরিত্র। কুরআনে তাদের বেয়াদবীমূলক বক্তব্যের বর্ণনা এভাবে এসেছে-

اِنَّ اللّٰهَ فَقِيۡرٌ وَّنَحۡنُ اَغۡنِيَآءُ ‌ۘ

নিশ্চয় আল্লাহ গরীব এবং আমরা ধনী। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত:১৮১)

৩.হিংসা

হিংসা তথা অন্যের কল্যাণ দেখতে না পারা এবং তার অনিষ্ট কামনা করা ইয়াহুদীদের স্বভাবজাত চরিত্র। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

وَدَّ كَثِيۡرٌ مِّنۡ اَهۡلِ الۡكِتٰبِ لَوۡ يَرُدُّوۡنَـكُمۡ مِّنۡۢ بَعۡدِ اِيۡمَانِكُمۡ كُفَّارًا ۖۚ حَسَدًا مِّنۡ عِنۡدِ اَنۡفُسِهِمۡ مِّنۡۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الۡحَـقُّ ۚ

(হে মুসলিমগণ!) কিতাবীদের অনেকেই তাদের কাছে সত্য পরিস্ফুট হওয়ার পরও তাদের অন্তরের হিংসাবশত কামনা করে, যদি তোমাদেরকে তোমাদের ঈমান আনার পর পুনরায় কাফির বানিয়ে দিতে পারতো...! (সূরা বাকারা, আয়াত:১০৯)

হিংসার এ স্বভাব ইয়াহুদী জাতির পুরনো স্বভাব। হযরত ইউসুফ আ. তার পিতা ইয়াকুব আ. এর প্রিয় পাত্র ছিলেন। যার কারণে অন্য ভাইয়েরা (বিনইয়ামীন ব্যতিত) তার প্রতি হিংসাবশত খেলতে যাওয়ার

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

নাম করে গভীর কূপে নিক্ষেপ করে। আর তার কাপড়ে মিথ্যা রক্ত লাগিয়ে পিতা ইয়াকুব আ. কে 'ইউসুফ কে নেকড়ে খেয়ে ফেলেছে' বলে মিথ্যা গল্প বানিয়ে শুনায়। এ ঘটনা আল্লাহ তা'আলা সূরা ইউসুফে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।

৪. অত্যাধিক দুনিয়াপ্রীতি

হাদিসে পাকে নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়াপ্রীতিকে সকল গুনাহের মূল আখ্যা দিয়েছেন। অন্যান্য জাতির তুলনায় ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের মধ্যে এ মন্দ গুণের উপস্থিতি বেশী। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেন,

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ

সুতরাং ধ্বংস ঐ সকল লোকের জন্য, যারা নিজ হাতে কিতাব লেখে, তারপর মানুষকে বলে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে, যাতে তার মাধ্যমে কিঞ্চিত আয় রোজগার করতে পারে। (সূরা বাকারা, আয়াত:৭৯)

অত্যাধিক দুনিয়াপ্রীতির কারণেই তারা তাওরাতের প্রকৃত হুকুম- যা অনেক ক্ষেত্রেই কঠিন ছিলো- গোপন করে মানব প্রবৃত্তির চাহিদা মতে শরী'আতের হুকুম বয়ান করতো এবং হুকুম জানতে আসা লোকদের থেকে মোটা অংকের 'হাদিয়া(?) ' গ্রহণ করতো!

৫. অত্যাধিক কৃপণতা

সম্পদ উপার্জন এবং বিনা প্রয়োজনে তা কুক্ষিগতকরণের পাশাপাশি কৃপণতার ক্ষেত্রে ইয়াহুদীদের বৈশিষ্ট্য ছিলো যে, তারা অন্যদেরকেও কৃপণতার নির্দেশ প্রদান করতো। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَاۤ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ۝

যারা নিজেরা কৃপণতা করে এবং মানুষকেও কৃপণতার নির্দেশ দেয়, আর আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দান করেছেন তা গোপন করে।

TOP

আমি (এরূপ) অকৃতজ্ঞদের জন্য লাঞ্ছনাকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। (সূরা নিসা, আয়াত:৩৭)

৬. বিশ্বাসঘাতক

বিশ্বাসঘাতক ইয়াহুদীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচিত। ধন-সম্পদ, দীন-ধর্ম, অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি- সবক্ষেত্রেই তাদের খিয়ানত এবং বিশ্বাসঘাতক স্বীকৃত। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা তাদের এ স্বভাব প্রসঙ্গে বলেন,

وَمِنۡهُمۡ مَّنۡ اِنۡ تَاۡمَنۡهُ بِدِيۡنَارٍ لَّا يُؤَدِّهٖۤ اِلَيۡكَ اِلَّا مَا دُمۡتَ عَلَيۡهِ قَآئِمًا ؕ

আবার তাদের (কিতাবীদের) এমন লোকও আছে, যার কাছে একটি দীনারও আমানত রাখলে সে তোমাকে তা ফেরত দেবে না- যদি না তুমি তার মাথার উপর দাঁড়িয়ে থাকো। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত:৭৫)

فَبِمَا نَقۡضِهِمۡ مِّيۡثَاقَهُمۡ لَعَنّٰهُمۡ وَجَعَلۡنَا قُلُوۡبَهُمۡ قٰسِيَةً ۚ يُحَرِّفُوۡنَ الۡكَلِمَ عَنۡ مَّوَاضِعِهٖ ۙ وَنَسُوۡا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوۡا بِهٖ ۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلٰى خَآئِنَةٍ مِّنۡهُمۡ اِلَّا قَلِيۡلًا مِّنۡهُمۡ

আর তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণেই তো আমি তাদেরকে আমার রহমত হতে বিতাড়িত করি এবং তাদের অন্তর কঠিন করে দিই। তারা কথাসমূহকে তার আপন স্থান হতে সরিয়ে দেয় এবং তাদেরকে যে বিষয়ের উপদেশ দেয়া হয়েছিলো তার বড় একটি অংশ ভুলে যায়। (আগামীতে) আপনি (হে নবী!) তাদের অল্পসংখ্যক ব্যতীত সকলেরই কোনো না কোনো বিশ্বাসঘাতকর কথা জানতে পারবেন...! (সূরা মায়িদা, আয়াত:১৩)

৭. দুষ্কৃতি এবং নৈরাজ্যসৃষ্টি

হঠকারিতাবশত দুষ্কৃতি এবং নৈরাজ্য সৃষ্টি করা ইয়াহুদী জাতির স্বভাবজাত বিষয়। কুরআনের ভাষায়,

وَقَضَيۡنَاۤ اِلٰى بَنِىۡۤ اِسۡرَآءِيۡلَ فِى الۡكِتٰبِ لَتُفۡسِدُنَّ فِى الۡاَرۡضِ مَرَّتَيۡنِ وَلَتَعۡلُنَّ عُلُوًّا كَبِيۡرًا ○

আমি মিমাংসা দান করে বনী ইসরাঈলকে অবহিত করেছিলাম, তোমরা পৃথিবীতে দু'বার বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং ঘোর অহংকার প্রদর্শন করবে। (সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত:৪)

TOP

GET IT ON Google Play
Download From App Store

বিপর্যয় দ্বারা উদ্দেশ্য, প্রথমবার হযরত মূসা আ. এর ইন্তেকালের পর তার শরী'আতের বিরোধীতা করা, আর দ্বিতীয়বার হযরত 'ঈসা আ. এর শরী'আতের বিরোধীতা করে। (মাআরিফুল কুরআন, সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত:৪)

যদি বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি বিচার করা হয়, তবে দেখা যাবে যে, পৃথিবীব্যাপী সৃষ্ট নৈরাজ্য এবং সামাজিক ও ধর্মীয় বিশৃংখলার পিছনে কোনো না কোনোভাবে এই হঠকারী সম্প্রদায়ের গোপন বা প্রকাশ্য উপস্থিতি রয়েছে।

তাওরাতের বিকৃতি সাধন

এই ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের মাঝে আল্লাহ তা'আলা অনেক নবী প্রেরণ করেছেন। যাদের মধ্যে হযরত মূসা আ. অন্যতম। বনী ইসরাঈলীদের পালনীয় শরী'আত গ্রন্থ হিসেবে আল্লাহ তা'আলা মূসা আ. এর উপর অবতীর্ণ করেছিলেন আসমানী গ্রন্থ 'তাওরাত'। কিন্তু হঠকারী ইয়াহুদী সম্প্রদায় ধর্মীয় স্বার্থসিদ্ধির হীন উদ্দেশ্যে যুগ পরম্পরায় তা বিকৃত করে ফেলে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন আয়াতে তাদের এ হঠকারিতার বিশদ বিবরণ তুলে ধরেছেন! (সূরা বাকারা, আয়াত:৭৫)

৮. আল্লাহর নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা

ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের প্রতি আল্লাহ তা'আলা অসংখ্য নেয়ামত দান করেছিলেন। কিন্তু এ অকৃতজ্ঞ সম্প্রদায় তার কোনো মূল্যায়ন করেনি। বরং অকৃতজ্ঞতাই ছিলো তাদের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। আল্লাহর হুকুমের অবাধ্যতার দরুন যখন তাদেরকে চল্লিশ বছরের জন্য 'তীহ' প্রান্তরে আটকে দেয়া হয়, তখন তাদের জন্য আসমান হতে 'মান্না ও সালওয়া' খাদ্যের নেয়ামত পাঠানো হতো। কিন্তু হঠকারী এ সম্প্রদায় তাতেও সন্তুষ্ট হয়নি। কুরআনের ভাষায়-

وَاِذۡ قُلۡتُمۡ یٰمُوۡسٰی لَنۡ نَّصۡبِرَ عَلٰی طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَادۡعُ لَنَا رَبَّکَ یُخۡرِجۡ لَنَا مِمَّا تُنۡۢبِتُ الۡاَرۡضُ مِنۡۢ بَقۡلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُوۡمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ؕ قَالَ اَتَسۡتَبۡدِلُوۡنَ الَّذِیۡ هُوَ اَدۡنٰی بِالَّذِیۡ هُوَ خَیۡرٌ ○

এবং (সে সময়ে কথা স্বরণ করো) যখন তোমরা বলেছিলে, হে মূসা! আমরা একই খাবারে সবর করতে পারবো না। সুতরাং স্বীয় প্রতিপালকের কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা করুন, তিনি যেন আমাদের জন্য ভূমিজাত দ্রব্য হতে কিছু উৎপন্ন করেন অর্থাৎ জমির তরকারি, কাঁকড়, গম, ডাল ও পেঁয়াজ। মূসা আ. বললেন, তোমরা কি উৎকৃষ্টতর বস্তুকে নিকৃষ্টতর বস্তু দ্বারা পরিবর্তন করতে চাও? (সূরা বাকারা, আয়াত:৬১)

৯. মিথ্যা এবং অন্যায় দাবি

তারা নিজেদেরকে আল্লাহর পুত্র এবং প্রিয়পাত্ররূপে মিথ্যা দাবি করে থাকে। এবং এ অযৌক্তিক দাবিও করে থাকে যে, আখেরাতের সফলতা কেবল ইয়াহুদী জাতির জন্য এবং তারাই কেবল জান্নাতে প্রবেশ করবে।

وَقَالَتِ الۡیَهُوۡدُ وَالنَّصٰرٰی نَحۡنُ اَبۡنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّآؤُهٗ ؕ قُلۡ فَلِمَ یُعَذِّبُکُمۡ بِذُنُوۡبِکُمۡ ؕ

আর ইয়াহুদী এবং খৃষ্টানরা বলে থাকে, আমরা আল্লাহর সন্তান এবং তার প্রিয়পাত্র। (তাদেরকে) বলে দিন, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের পাপের কারণে শাস্তি দেন কেন? (সূরা মায়িদা, আয়াত:১৮)

وَقَالُوۡا لَنۡ یَّدۡخُلَ الۡجَنَّةَ اِلَّا مَنۡ کَانَ هُوۡدًا اَوۡ نَصٰرٰی ؕ تِلۡکَ اَمَانِیُّهُمۡ ؕ قُلۡ هَاتُوۡا بُرۡهَانَکُمۡ اِنۡ کُنۡتُمۡ صٰدِقِیۡنَ ○

এবং তারা (ইয়াহুদী এবং নাসারারা) বলে, জান্নাতে ইয়াহুদী এবং নাসারাগণ ছাড়া অন্য কেউ আর কখনো প্রবেশ করবে না। এসব তাদের মিছে আশামাত্র। (সূরা বাকারা, আয়াত:১১১)

১০. সত্যগ্রহণে হঠকারিতা

TOP

GET ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের মাঝে অনেক নবী প্রেরণ করেছেন। কিন্তু হঠকারী এ সম্প্রদায় যথাযথভাবে এ নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করেনি। বরং নবীগণের অবাধ্যতা আর বিরোধিতাই ছিলো তাদের নিত্যচরিত্র। দৃষ্টান্তস্বরূপ, হযরত মূসা আ. বনী ইসরাইল সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত অন্যতম নবী। যিনি তাদেরকে ফেরাউনের জুলুম নির্যাতন থেকে বাঁচিয়ে মিসর থেকে বের করে নিয়েছিলেন। কিন্তু ইয়াহুদীরা এতটাই অকৃতজ্ঞ যে, লোহিত সাগর পার হওয়া মাত্রই এক মূর্তিপূজক জাতিকে দেখে মূসা আ. এর একত্ববাদের শিক্ষা ভুলে গিয়ে তারা পূজার নিমিত্তে মূর্তি বানিয়ে দেওয়ার জন্য মূসা আ. এর কাছে বায়না ধরলো!! (সূরা আ'রাফ, আয়াত:১৩৮-১৪১)

এরপর মূসা আ. যখন আল্লাহ তা'আলার আদেশে তূর পর্বতে গেলেন, তখন ইয়াহুদীরা তার অনুপস্থিতিতে গো-বাছুরের মূর্তি বানিয়ে তার পূজা করতে শুরু করলো। (সূরা বাকারা, আয়াত:৫১)

মূসা আ.তাদেরকে ফিরআউনের অত্যাচার থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর তারা এ বলে হঠকারিতা করলো যে, "আমরা আপনার উপর ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমান আনয়ন করবো না, যতক্ষণ না আল্লাহকে আমরা স্বচক্ষে দেখবো! (সূরা বাকারা, আয়াত:৫৫)

মূসা আ. যখন আল্লাহর পক্ষ হতে আসমানী কিতাব তাওরাত প্রাপ্ত হয়ে বনী ইসরাঈলকে তদানুযায়ী আমল করতে বললেন, তখন এ হঠকারী সম্প্রদায় ততক্ষণ পর্যন্ত আমল করতে সম্মত হলো না, যতক্ষণ না তাদের উপর পাহাড় উঠিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়ার ভয় দেখানো হলো!! (সূরা আ'রাফ, আয়াত:১৭১)

এরপর যখন মূসা আ. তাদেরকে তাদের পূর্বআবাসভূমি ফিলিস্তিন ভূখণ্ড, যা শক্তিশালী আমালেকা সম্প্রদায় দখল করে রেখেছিলো, বিজয় করার জন্য জিহাদের নির্দেশ প্রদান করলেন, তখন তারা এ বলে জিহাদ করা থেকে বিরত থাকে-

TOP

يٰمُوْسٰٓى اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَآ اَبَدًا مَّا دَامُوْا فِيْهَا فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَآ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ ○

হে মূসা! তারা যতক্ষণ পর্যন্ত সেখানে অবস্থানরত থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা কিছুতেই সেখানে প্রবেশ করবো না। আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে হলে তুমি ও তোমার রব চলে যাও এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করো। আমরা তো এখানেই বসে থাকবো। (সূরা মায়িদা, আয়াত:২৪)

১১. নবীগণের সত্যের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান এবং হত্যা প্রচেষ্টা

বনী ইসরাইলের মাঝে আল্লাহ তা'আলা অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। কিন্তু এ জাতি অনেক নবীর ক্ষেত্রেই তার দাওয়াতকে কেবল অস্বীকারই করেনি; বরং তাদেরকে হত্যাও করে ফেলেছে। অথচ তারা নিজেরাও জানতো যে, নবীগণকে হত্যা করা কিংবা অস্বীকার করা জঘন্যতম গুনাহ। নবীগণকে হত্যা করা এটা একমাত্র ইয়াহুদী জাতির বৈশিষ্ট্য হিসেবে কুরআনে কারীমে উদ্ধৃত হয়েছে। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত:১১২)

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন,

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَقْتُلُ فِي الْيَوْمِ ثَلَاثَمِائَةِ نَبِيٍّ،

বনী ইসরাঈল দিনে তিনশত নবীকে হত্যা করেছে...! (তাফসীরে ইবনে আবী হাতেম, সূরা আলে ইমরান, আয়াত:১১২)

এখানে আমরা দৃষ্টান্ত হিসেবে কয়েকজন নবীর কথা উল্লেখ করছি।

হযরত 'ঈসা আ. এর ব্যাপারে ইয়াহুদীদের হঠকারীতা

হযরত 'ঈসা আ. ছিলেন বনী ইসরাইল তথা ইয়াহুদীদের মাঝে আগমনকারী সর্বশেষ নবী। কিন্তু ইয়াহুদীরা কয়েকজন ব্যতিত কেউ তাকে নবী হিসেবে স্বীকার করলো না, বরং তাকে হত্যা প্রচেষ্টায় লিপ্ত হলো। আল্লাহ তা'আলা তার নবীকে ইয়াহুদীদের এ ঘৃণ্য চক্রান্ত থেকে হেফাজত করলেন এবং 'ঈসা আ. কে আসমানে উঠিয়ে নিলেন। শেষ যামানায় তিনি পুনরায় দুনিয়াতে আগমন করবেন এবং আখেরী নবী

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরী‘আত মোতাবেক আমল করবেন। (সূরা নিসা, আয়াত:১৫৭)

হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যাপারে ইয়াহুদীদের হঠকারীতা

আখেরী নবীর সকল নিদর্শন আল্লাহ তা‘আলা তাওরাতে উদ্ধৃত করেছিলেন। যদ্দরুন প্রথমত ইয়াহুদীরা শেষ নবীর আগমন প্রতীক্ষায় ছিলো। অবশেষে যখন নবীজীর আগমন ঘটলো এবং তারা তাকে ভালোভাবেই চিনতেও পারলো। কিন্তু যেহেতু নবীজী তাদের ইসরাঈল বংশে ছিলেন না, বরং ইসমাইল বংশে ছিলেন, এ হঠকারিতা এবং হিংসাবশত তারা ঈমান আনা থেকে বিরত থাকলো। শুধু তাই নয়, পাশাপাশি তারা নবীজীর হত্যা প্রচেষ্টায় বিভিন্ন ধরণের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত নবীজী হলো। দৃষ্টান্তস্বরূপ-

১. একবার এক ইয়াহুদী নবীজীকে ﷺ জাদু করে। জাদুক্রিয়ায় নবীজী ﷺ মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েন। আল্লাহ তা‘আলা ফেরেশতার মাধ্যমে নবীজীকে ﷺ অবগত করেন। এরপর জাদুক্রিয়া নষ্ট করে ফেলা হয়। (মুসনাদে আহমাদ, হা.নং ১৯২৬৭)

২. খাইবারের যুদ্ধে এক ইয়াহুদী নারী বিষ মিশ্রিত বকরীর গোশত খাইয়ে নবীজীকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। নবীজীর সঙ্গী সাহাবী হযরত বিশর রা. গোশত গলধঃকরণ করে ফেলায় শহীদ হয়ে যান। আল্লাহ তা‘আলা নবীজীকে রক্ষা করেন। (বুখারী শরীফ, হা. নং ৪৪২৮)

৩. একবার নবীজী কোনো এক কারণে ইয়াহুদী গোত্র বনু কাইনুকা এর বসতিতে যান। এ সময় তিনি একটি দেয়ালের পাশে বসেন। ইয়াহুদীরা সুযোগ মনে করে দেয়ালের উপর থেকে পাথর ফেলে দিয়ে নবীজীকে হত্যা করতে চায়। আল্লাহ তা‘আলা ওহীর মাধ্যমে নবীজীকে অবগত করে রক্ষা করেন।

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

কুরআনে কারীমে উল্লিখিত বিষয়গুলো ছাড়াও ইয়াহুদীদের আরো অনেক মন্দ স্বভাব রয়েছে, যা তাদেরকে লাঞ্ছনা, অপদস্থতা আর অপমান ও নির্যাতনের জীবন যাপনের উপযুক্ত প্রমাণ করেছে। সার্বিক দিকে বিবেচনায় ইয়াহুদীদের ইতিহাস এ কথা প্রমাণ করে যে, তিনটি মন্দ স্বভাব তাদের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিলো। যেমনটি বলেছেন হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-

১. বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণ না করা।
২. নিয়ামত প্রাপ্তিতে কৃতজ্ঞ না হওয়া।
৩. আল্লাহ তা'আলার সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না থাকা। (তাফসীরে মাজেদী, সূরা আলে ইমরান, আয়াত:১১২)

ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের এ নৈতিক অবক্ষয় এবং দুশ্চরিত্রের কারণেই আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে তাদেরকে 'অভিশপ্ত' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন,

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ○

বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফরী করেছিলো, তাদের উপর দাউদ ও 'ঈসা ইবনে মারইয়ামের যবানিতে লানত বর্ষিত হয়েছিলো। (সূরা মায়িদা, আয়াত:৭৮)

অবাধ্য ও হঠকারী ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের শাস্তি

নবীগণের তাওহীদের দাওয়াতকে অস্বীকার, তাদেরকে হত্যা করা সহ যুগ পরম্পরায় ইয়াহুদী জাতির অসংখ্য অপরাধের দরুন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বিভিন্ন শাস্তির সম্মুখীন করেছেন। পাশাপাশি দুনিয়াতে অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠির মাধ্যমে নির্যাতিত ও লাঞ্ছিত হওয়া এবং আখেরাতে কঠিন আযাবে নিপতিত হওয়ার সংবাদও সুস্পষ্টভাবে প্রদান করেছেন।

ইয়াহুদীদের শাস্তি ১: বানর এবং শুকরে পরিণত হওয়া

হযরত ইবরাহীম আ. এর তাওহীদ ও একত্ববাদের সত্য ধর্ম তার দু' পুত্র হযরত ইসহাক ও ইসমাঈল আ. এর মাধ্যমে বিস্তৃতি লাভ করে। ইবরাহীম আ. এর ধর্মে সাপ্তাহিক দিনসমূহের মধ্য হতে ইবাদাতের জন্য জুমু'আর দিন নির্ধারিত ছিলো। পরবর্তীতে ইসহাক আ. এর পুত্র হযরত ইয়াকুব আ. এর বংশধর বনী ইসরাইল হঠকারিতাবশত মূসা আ. এর কাছে আবেদন করলো যে, তিনি যেন সাপ্তাহিক ইবাদাতের দিবস হিসেবে শনিবার দিন নির্ধারণ করেন। তাদের পীড়াপীড়ি এবং আবেদনের প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা তাদের আবেদন মঞ্জুর করেন এবং শনিবার দিন ইবাদাত ছাড়া সবধরনের ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয় এবং শিকার করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

কিন্তু বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের একটি গোষ্ঠি- যাদেরকে 'আসহাবুস সাবত' বলা হতো- এ নির্দেশ উপেক্ষা করে শনিবার দিন মাছ শিকার করে। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের অপরাধীদেরকে শুকর এবং বানরে পরিণত করে দেন। (সূরা বাকারা, আয়াত:৬৫, সূরা নিসা, আয়াত:৪৭, সূরা মায়িদা, আয়াত:৬০, সূরা আ'রাফ, আয়াত:১৬৩)

ইয়াহুদীদের শাস্তি ২: তীহ প্রান্তরে আটকে থাকা

হযরত মূসা আ. যখন বনী ইসরাঈলকে নিয়ে লোহিত সাগর পার হয়ে মিসর থেকে বের হয়ে গেলেন, তখন বনী ইসরাইল সম্প্রদায়ের পূর্ব আবাসভূমি ফিলিস্তিনে 'আমালেকা' নামক এক শক্তিশালী সম্প্রদায়ের বসবাস ছিলো। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে মূসা আ. বনী ইসরাঈলকে তাদের সাথে যুদ্ধ করে পূর্বআবাসভূমিতে প্রবেশের আদেশ প্রদান করেন। কিন্তু অবাধ্য সম্প্রদায় জিহাদ করা থেকে বিরত থাকায় আল্লাহ তা'আলা এ অপরাধের শাস্তি স্বরূপ তাদেরকে সীনাই পর্বতের তীহ প্রান্তরে চল্লিশ বছরের জন্য আটকে রাখেন। এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তারা এ ময়দান থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে। কিন্তু তারা সক্ষম হয়নি। (সূরা মায়িদা, আয়াত:২৬)

ইয়াহুদীদের শাস্তি ৩: অন্তরের কঠোরতা

TOP

অন্তরের নম্রতা আল্লাহ তা'আলার অনেক বড় একটি নেয়ামত। কিন্তু ইয়াহুদীদের অপরাধের শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এ নেয়ামত থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছেন।

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيْثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً

আর তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণেই আমি তাদেরকে আমার রহমত হতে বিতাড়িত করি এবং তাদের অন্তরকে কঠিন করে দেই। (সূরা মায়িদা, আয়াত:১৩)

ইয়াহুদীদের শাস্তি ৪ : শতধাবিভক্ত ইয়াহুদী জাতি

অবাধ্যতা এবং হঠকারিতার দরুন আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদী জাতিকে শতধাবিভক্ত করে দিয়েছেন। এবং তাদেরকে বিভিন্ন বালা মুসিবতে আপতিত করে দিয়েছেন। (সূরা আ'রাফ, আয়াত:১৬৮)

ফলে জাতিগতভাবে আত্মপ্রকাশের পর থেকে খৃষ্ট্রীয় ১৯ শতক পর্যন্ত ভৌগলিক দিক থেকে তাদের কোনো রাষ্ট্রীয় পরিচয় ছিলো না। আর বর্তমানে যে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, সেটা মূলত তাদের কোনো রাষ্ট্রীয় পরিচয় নয়; বরং এ ভূখণ্ড মূলত মধ্যপ্রাচ্যে আগ্রাসন পরিচালনার নিমিত্তে আমেরিকা, বৃটেন তথা পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর সেনা ছাউনি। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে।

ইয়াহুদীদের শাস্তি ৫ : লাঞ্ছিত, নির্যাতিত এবং নিপীড়িত হওয়া

এটি একটি ঐতিহাসিক বাস্তবতা যে, পৃথিবীর নেতৃত্ব এবং ক্ষমতার ক্ষেত্রে একদিকে যখন অন্যান্য জাতিগোষ্ঠির মাঝে পালা বদল ঘটেছে, তখন জাতি হিসেবে আবির্ভাবের পর থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত প্রায় তিন সহস্রাধিক বছরের ইতিহাসে ইয়াহুদীরা কোনো একটি ভূখণ্ডে ধর্মীয় স্বকীয়তা বজায় রেখে একক শাসন টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়নি। সবসময় তারা কোনো না কেনো জাতিগোষ্ঠির দ্বারা শাসিত হয়ে গোলামীর লাঞ্ছনার জীবন যাপন করেছে।

Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com App Store

আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো- ইয়াহুদী জাতি কেবল শাসিতই হয়নি; বরং প্রত্যেক শাসক দ্বারা তারা শোষিত এবং নির্যাতিতও হয়েছে। তাদের জীবনেতিহাসে এমন রাত খুব কমই অতিবাহিত হয়েছে যে, তারা নিশ্চিন্তে, নির্বিঘ্নে জাগতিক জীবনের সুখ নিদ্রায় বিভোর হতে পেরেছে। তাদের জীবনে আলোকিত দিবস শেষে বিভিষিকাময় ভয়াল রজনীর আগমন এত দ্রুত ঘটেছে যে, দিবসের উজ্জ্বল সূর্যটিকে দু'চোখ মেলে দেখারও সুযোগ হয়নি। তার আগেই রাতের অমানিষায় তা হারিয়ে গেছে! রাতের অন্ধকার ক্রমেই এতটা গাঢ় থেকে প্রগাঢ় হয়েছে এবং ভয়াল রজনীর অমানিষা এতটাই দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়েছে, যেন এ রাত্রির শেষে আর কোনো দিবসেরই আর আগমন ঘটবে না..!

এ কথা ঠিক যে, নেতৃত্ব এবং ক্ষমতা হারানোর সময় প্রত্যেক জাতিই -জয়ী পক্ষের মাধ্যমে নির্যাতন এবং লাঞ্ছনার শিকার হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়টিও অনস্বীকার্য যে, অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠির ক্ষেত্রে এ পরাজয়ের পূর্বে ছিলো নেতৃত্ব ও শাসনের এক একটি দীর্ঘ অধ্যায়, যাতে তারা নির্দিষ্ট একটি ভৌগলিক সীমারেখার মধ্যে হলেও এককভাবে রাষ্ট্রীয়শক্তির ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পেরেছিলো। তাছাড়া বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পরাজয়ের রণাঙ্গনেও ছিলো তাদের রাষ্ট্রীয় ও সম্মিলিত শক্তির বীরত্বপূর্ণ প্রদর্শনী।

পক্ষান্তরে ইয়াহুদী জাতি কখনোই এ দু বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেনি। তাদের না ছিলো কোনো ভৌগলিক সীমায় ধর্মীয় স্বকীয়তায় একক শাসনের গৌরবজ্জ্বল ইতিহাস, আর না ছিলো পরাজয়ের রণাঙ্গনে বীরত্বপূর্ণ কোনো রাষ্টীয়শক্তি প্রদর্শনীর সম্মানজনক অতীত। বরং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এ জাতি সংশ্লিষ্ট ভূখণ্ডে সবসময়ই ছিলো সংখ্যালঘু। যদ্দরুন ধর্মীয় দাঙ্গা আর নির্যাতনের সম্মুখে তাদের প্রতিরোধ ছিলো নিতান্তই হেরে

TOP
GET ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

যাওয়া লড়াই। প্রতিরোধ কিংবা বিদ্রোহ কখনোই তাদের ললাটে বীরত্বের ছিটেফোঁটাও এনে দিতে পারেনি।!

ইয়াহুদী জাতির লাঞ্ছনার ইতিহাসের সূচনা খৃষ্টপূর্ব সময়কাল থেকেই। আশুরী, মিসরী, ব্যবিলনী, পারসিক, ইউনানী, রোমক সহ বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠি দ্বারা নির্যাতন ও লাঞ্ছনার শিকার হয়। লাঞ্ছনার এ ধারা অব্যাহত ছিলো হযরত 'ঈসা আ.এর উর্ধ্বারোহনের পরেও।

হযরত 'ঈসা আ. কে হত্যার জঘন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ইয়াহুদী সম্প্রদায় লাঞ্ছনার বন্ধন থেকে কখনই মুক্ত হতে পারেনি। এ সময়ে বেশ কয়েক পর্বে তারা লাঞ্ছনার শিকার হয় । কিছু চিত্র আমরা পাঠক সমীপে তুলে ধরছি।

'ঈসা আ.এর উর্ধ্বারোহনের পর
ইয়াহুদী জাতির লাঞ্ছনার প্রথম পর্ব ৭০-১৩৫ খৃষ্টাব্দ

➢ **রোমান সম্রাট টাইটাস (Titus) এর ধ্বংসলীলা: ৭০ খৃষ্টাব্দ।**

হযরত 'ঈসা আ.এর উর্ধ্বারোহনের পর ইয়াহুদীদের ভাগ্যাকাশে লাঞ্ছনার নতুন মেঘ ছায়াপাত করতে শুরু করে। ৭০ খৃষ্টাব্দে রোমান সম্রাট টাইটাস (Titus) এর পক্ষ হতে তারা ভয়াবহ হামলার শিকার হয়। হাজার হাজার ইয়াহুদীকে এ সময় সে হত্যা করে এবং তাদের বড় একটি অংশকে বন্দী করে। (Encyclopedia Brittanica (15th Edition; U.S.A. 1990) 22/416)

➢ **রোমান সম্রাট হেডরিয়ান Hadrian (117-138 CE) এর আগ্রাসন: ১৩৫ খৃষ্টাব্দ।**

সম্রাট Hadrian এর আগ্রাসন ছিলো অত্যন্ত ভয়াবহ। এ সময় তিনি ব্যাপকভাবে ইয়াহুদী নিধন করার পাশাপাশি Jerusalem (জেরুজালেম) শহরকে ধ্বংস করে দিয়ে ইয়াহুদীদেরকে ফিলিস্তিনের ভূখণ্ড হতে তাড়িয়ে দেন এবং এ শহরে তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেন। ইয়াহুদী মুক্ত করে তিনি এখানে রোমান দেবতা 'জুপিটার' এর

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

উপাসনালয় তৈরি করেন। *(ড. মাহমূদ আব্দুর রহমান কৃত ‘‘মুযিযু তারীখিল ইয়াহুদ ওর্য়া রদ্দি আলা মাযায়িমিহিমিল বাতিলাহ, পৃ.২৬০)*

ইয়াহুদী ঐতিহাসিক শাহীন ম্যাকরিয়াস বলেন-
এ সময়েই (তথা জেরুজালেম ধ্বংসের পর) ইসরাইলীদের ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটে। জেরুজালেমের ধ্বংসের পর ইয়াহুদীরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। পরবর্তী সময়ে সে সকল দেশেই তাদের ইতিহাস রচিত হয়, যেখানে তারা আবাস গড়েছিলো। নির্বাসিত সময়ে তারা বিভিন্ন নির্যাতন এবং নিপীড়নের সম্মুখীন হয়। কেননা, (ফিলিস্তিনের দখলদার) রোমানরা তাদেরকে জেরুজালেমে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলো। [তারীখুল ইসরাইলিয়্যীন (মিসর ১৯০৯) পৃ.৭৭]

ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে বিভিন্ন বাদশাহর উপর্যুপরি আক্রমণ এবং আগ্রাসনের দরুন ইয়াহুদীদের সহাবস্থান অনেক আগেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো। পারসিকদের শাসনামলে ব্যবিলনের বন্দিদশা থেকে মুক্ত হওয়ার পর সহাবস্থানের আংশিক পরিবেশ তৈরি হলেও এ পর্যায়ে এসে তা পুরোপুরি ধ্বসে পরে। ফলে ইয়াহুদীরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। কিছু তো রয়ে গিয়েছিলো ব্যবিলনে, আর বাকীরা আরব, ইংল্যান্ড, জার্মানী, স্পেন, ইতালী, হল্যান্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, লাঞ্ছনা এবং অপদস্থতার ছায়া এসব দেশেও তাদের পিছু ছাড়েনি। (তারীখুল ইসরাইলিয়্যীন, ৮১-৯৫)

সে সব দেশে ইয়াহুদীদের লাঞ্ছনার ইতিহাসের আলোচনা Pogrom শিরোনামের অধীনে সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ!

ইয়াহুদীদের ব্যর্থ স্বাধীনতা প্রচেষ্টা

খৃষ্টপূর্ব সময়কাল থেকে শুরু হওয়া দীর্ঘ জুলুম, নির্যাতন এবং নিপীড়নের সময়কালে ইয়াহুদীরা যে স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করেনি, বিষয়টি এমন নয়। কিন্তু সম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে তাদের সে বিদ্রোহ

কোনো বড় ধরনের কোনো প্রতিরোধ ছিলো না, বরং সেগুলো ছিলো নিতান্তই ব্যর্থ প্রচেষ্টা। ৬৬-৭৩ খৃষ্টাব্দে ইয়াহুদীদের একটি বিদ্রোহ সংঘঠিত হয়, যা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ১১৫-১১৭ সালে মিসর, সাইপ্রাস প্রভৃতি অঞ্চলের ইয়াহুদীরা বিদ্রোহ করে, কিন্তু এ বিদ্রোহও কোনো সফলতার মুখ দেখতে পারেনি। ১৩২-১৩৫ সালে Simon bar Kokhba নামক এক ব্যক্তির নেতৃত্বে বিদ্রোহ সংঘঠিত হয়, কিন্তু এ বিদ্রোহও তাদের পরাধীনতার শিকল ভাঙতে সক্ষম হয়নি। উপর্যুপরি ব্যর্থতায় এক সময় ইয়াহুদীদের স্বাধীনতা আন্দোলনের আগ্রহও স্তিমিত হয়ে পড়ে। ফলে তারা ধর্মীয় বিষয়াদিতে আত্মনিয়োগ করে। এ সময় তাদের ধর্মনেতারা তৈরি করে ধর্মগ্রন্থ Mishnah (মিশানহ) এবং তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ Talmud (তালমূদ)। পরবর্তী সময়ের ইয়াহুদীরা এগুলোকেই তাদের পথনির্দেশ মনে করে থাকে। *[Encyclopedia Brittanica (15th Edition; U.S.A. 1990) 22/416-417]*

➢ লাঞ্ছনার দ্বিতীয় পর্ব : ২য় হিজরী-২৩ হিজরী

ফিলিস্তিন ভূখণ্ড হতে বহিস্কৃত হওয়ার পর ইয়াহুদীদের বেশ কিছু গোত্র হেজাজে এসে বসবাস শুরু করে। ইয়াসরিব (মদীনা), তাইমা, তাবুক, ফাদাক প্রভৃতি অঞ্চলে তাদের বাস ছিলো। (আল মুসতাওত্বনাতুল ইয়াহুদিয়্যাহ আলা আহর্দি রসূল, ৪৯-৬৮)

মদিনায় বসবাসকারী ইয়াহুদী গোত্রসমূহের মধ্যে বনু কাইনুকা', বনু নাযীর ও বনু কুরাইযা ছিলো অন্যতম। ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইয়াহুদীদের লাগাতার চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের কারণে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে নবীজী মদীনায় অবস্থানকারী সকল ইয়াহুদীরকে ক্রমান্বয়ে মদীনা হতে বহিস্কার করেন। নবীজীর পর তারই ওসিয়ত বাস্তবায়নার্থে দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর রাযি. ইযাহুদীরকে হেজাজের পবিত্র ভূখণ্ড হতেই বহিস্কার করে দেন।

➢ বনু কাইনুকা'র বহিস্কৃতি: শাওয়াল, দ্বিতীয় হিজরী

পর্দাবৃত এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম নারীকে লম্পট চরিত্রের ইয়াহুদীরা অনাবৃত করার চেষ্টা করলে এক আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন মুসলিম ঘটনায় জড়িত ইয়াহুদীকে হত্যা করে ফেলে। উপস্থিত ইয়াহুদীরাও মুসলমান সাহাবীকে হত্যা করে ফেলে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং ইয়াহুদীরা মুসলিম সাহাবাকে হত্যার মাধ্যমে প্রতিশোধ নেওয়ার পরও নবীজীর কাছে সমাধানের জন্য যাওয়ার পরিবর্তে তাদের দূর্গসমূহে গিয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি আরম্ভ করে দেয়, যা সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হয়। যদ্দরুন নবীজী তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন এবং পনের দিন তাদের দূর্গসমূহ অবরোধ করে রাখেন। অবশেষে তারা আত্মসমর্পণ করে। নবীজী মোনাফেক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল এর সুপারিশে ইয়াহুদীরকে হত্যা করা হতে বিরত থাকেন। তবে তাদেরকে মদীনা হতে বহিস্কার করে দেন। (সীরাতে ইবনে হিশাম, ২:৪৮)

➢ **বনু নাযীরের বহিস্কৃতি: চতুর্থ হিজরী, (গাযওয়ায়ে বীরে মাউনার পরে)**

বীরে মাউনার যুদ্ধে কাফেরদের গাদ্দারীর শিকার হয়ে ৭০ জন সাহাবীর শহীদ হওয়ার মর্মান্তিক ঘটনার পর শহীদের ময়দান থেকে আহত হয়ে কোনক্রমে ফিরে আসেন সাহাবী আমর ইবনে উমাইয়া রাযি.। পথিমধ্যে প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে বনু আমের গোত্রের দু’ ব্যক্তিকে তিনি হত্যা করে ফেলেন। বনু আমেরের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধবিরতি চুক্তি থাকায় নবীজী এ দু’ব্যক্তির রক্তপণ আদায়ের জন্য বনু কুরাইজার বসতিতে গমণ করেন। কেননা, বনু কুরাইজা বনু আমেরের মিত্র ছিলো। বনু কুরাইজার বসতিতে নবীজী একটি দেয়ালের পাশে বসলে ইয়াহুদীরা উপর থেকে পাথর ফেলে নবীজীকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। ওহীর মাধ্যমে অবগত হয়ে নবীজী দ্রুত বসতি ত্যাগ করেন। এ বিশ্বাসঘাতক আর সন্ধিচুক্তি ভঙ্গের কারণে নবীজী তাদের বসতিতে আক্রমণ করেন এবং তাদের খেজুর বাগান কেটে জ্বালিয়ে ভষ্ম করে

TOP

দেন এবং তাদেরকে মদীনা থেকে বহিস্কার করেন। তাদের কেউ খাইবারে আর কেউ শাম অঞ্চলে চলে যায়। (আবু দাউদ, হা.নং ৩০০৪; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪:৮২)

বনু কুরাইযার এর বহিস্কৃতি: পঞ্চম হিজরী (গযওয়ায়ে আহযাবের পরে)

গযওয়ায়ে আহযাব (খন্দকের যুদ্ধ) থেকে ফিরে আসার পর আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাঈল আ. -এর মাধ্যমে নবীজীকে বনু কুরাইযায় হামলা চালানোর আদেশ করেন। আহযাবের যুদ্ধ সংঘঠিত করার পেছনে বনু কুরাইযার হস্তক্ষেপ ছিলো। নবীজী আক্রমণ পরিচালনা করেন। পঁচিশ দিন ইয়াহুদীদের দূর্গগুলো অবরোধ করে রাখেন। ইয়াহুদীরা বাধ্য হয়ে সাহাবী হযরত সাদ বিন মুআজ রাযি. এর সিদ্ধান্তে দূর্গ থেকে বেরিয়ে আত্মসমর্পণে সম্মত হয়। সাদ বিন মুআজ রাযি. তাদের মধ্য থেকে পুরুষদেরকে হত্যা এবং নারী ও শিশুদেরকে গোলাম বাঁদিতে পরিণত করতে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। এ সিদ্ধান্ত মোতাবেক নবীজীর আদেশে ইয়াহুদীদের সকল প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষকে একটা ঘরে একত্র করা হয়। এরপর বাইরে গর্ত খনন করে ইয়াহুদীদেরকে ঘর থেকে বের করে দলে দলে গর্দান কেটে সে গর্তগুলো পূরণ করা হয়। তাদের সম্পদসমূহের এক পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রের জন্য রেখে বাকীগুলো মুসলমানদের মাঝে বণ্টন করে দেয়া হয়। তাদের নারী ও শিশুদেরকে গোলাম বাঁদিতে পরিণত করা হয়। নিহত ইয়াহুদীদের সংখ্যা ছিলো ৪০০। এক বর্ণনামতে ৯০০। এ সময় বিশেষ অপরাধের কারণে একজন নারীকে হত্যা করা হয়। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪:১২৫-১৩৬)

➢ **ইয়াহুদীমুক্ত মদীনা: সপ্তম হিজরীর পর**

বনু কাইনুকা, বনু নাযীর, বনু কুরাইযকে মদীনা থেকে বহিস্কার করার পরও মদীনায় কিছু ইয়াহুদী রয়ে গিয়েছিলো। সপ্তম হিজরীর পর নবীজী অবশিষ্ট সকল ইয়াহুদীকে মদীনা থেকে বের করে দেন এবং

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

এর মাধ্যমে মদীনা সম্পূর্ণরূপে ইয়াহুদী মুক্ত হয়ে যায়। (তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম, হা.নং ১৭৬৫, ১৭৬৬)

➢ ইয়াহুদীমুক্ত হিজাযের পবিত্র ভূমি

হযরত উমর রা. এর খেলাফতকালে মদীনা হতে বহিস্কৃত হয়ে ইয়াহুদীদের কিছু অংশ খাইবারে গিয়ে বসতি স্থাপন করে। খাইবার ছাড়াও নাযরান প্রভৃতি অঞ্চলে তখনও ইয়াহুদীদের বসবাস ছিলো। সাহাবী হযরত উমর ফারুক রা. এর যামানায় তিনি হিজাযের অবস্থানগ্রহণকারী সকল ইয়াহুদীরকে হিজায থেকে বের করে দেন। (মুয়াত্তায়ে মালেক, ৮৭৩)

একাধিক কারণে তিনি এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন-

১. নবীজী সাহাবায়ে কেরামকে এ নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন যে,

أخرجوا يهود أهل الحجاز، وأهل نجران من جزيرة العرب.

তোমরা হিজাযের ইয়াহুদীরকে এবং ‘নাযরানের’ ইয়াহুদীরকে আরব ভূখণ্ড থেকে বের করে দিও’। (মুসনাদে আহমাদ, হা. নং ১৬৯১)

২. চাষাবাদের জন্য এখন আর ইয়াহুদীদের সহযোগিতার কোনো প্রয়োজন ছিল না। কেননা, বিভিন্ন জিহাদের মাধ্যমে অনেক গোলাম বাঁদি মুসলমানদের হস্তগত হয়েছিলো।

৩. মদীনা থেকে বহিস্কৃত হয়েও মুসলমানদের শত্রুতায় তারা লিপ্ত ছিলো। এ শত্রুতার অংশ হিসেবে তারা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. কে রাতের বেলায় সুযোগ পেয়ে আক্রমণ করে আহত করছিলো। (ফাতহুল বারী, হা.নং ২৭৩০)

হযরত উমর রা. এর এ পদক্ষেপের ফলে জাযীরাতুল আরব সম্পূর্ণরূপে ইয়াহুদীমুক্ত হয়ে যায়, মুসলমানরা ইয়াহুদীদের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা পায় এবং নবীজীর ওসীয়তবাণী বাস্তবায়িত হয় এবং ইসলাম তার নিজ দেশে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও অস্থিরতা থেকে মুক্ত হয়ে বিশ্ব দরবারে দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে যায়।

TOP
GET ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

➢ **লাঞ্ছনার তৃতীয় পর্ব: খৃষ্ট্রীয় দ্বিতীয় সহস্রাব্দ**

আধুনিক যুগে Anti Semitism এবং Pogrom: ইয়াহুদী নিধনের ভয়াল চিত্র!

ইয়াহুদীদের অপরাধ ও হঠকারিতার কারণে আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদীদের উপর লাঞ্ছনা এবং অপদস্থতার সিলমোহর লাগিয়ে দিয়েছেন। নবীজীর ইন্তেকালের পরও তাদের জন্য এ বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হয়নি ; বরং নির্যাতন এবং নিপীড়নের প্রবল ঢেউ ক্রমেই তাদের জন্য ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে। যদ্দরুন ক্রমেই তারা লাঞ্ছনা এবং অপদস্থতার গভীর অতলে হারিয়ে গেছে..!

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সম্রাট হেডরিয়ান Hadrian (117-138 CE) এর আগ্রাসনের মাধ্যমে যখন জেরুজালেমের চূড়ান্ত পতন ঘটে, তখন ইয়াহুদীরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু সে সকল দেশেও জুলুম-নির্যাতন আর লাঞ্ছনা তাদের জীবনকে দূর্বিষহ করে তুলছিলো। খৃষ্ট্রীয় দ্বিতীয় সহস্রাব্দে যা চরম আকার ধারণ করে। সভ্য (?) আধুনিক পৃথিবীতে-যেখানে নীতিগতভাবে হলেও মানবতাকে সমাজের আবশ্যকীয় অনুষঙ্গ মনে করা হতো সে সভ্য পৃথিবীতেও এ সময়ে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠির পক্ষ হতে Anti Semitism (ইয়াহুদী বিদ্বেষ) এর স্লোগানে ইয়াহুদী জাতিবিরোধী Pogrom (উগ্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা) এর ফলে যে পরিমাণ নির্যাতন, নিপীড়ন এবং নিধনের আয়োজন সম্পন্ন করা হয়েছে, তা ভাবলেও গা শিউরে উঠবে! কুরআনে কারীমের নিম্নোক্ত আয়াতে এ ঘটনাগুলোর দিকেই ঈঙ্গিত করা হয়েছে...

وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ يَّسُوْمُهُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ ؕ اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيْعُ الْعِقَابِ ۚۖ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

এবং (সে সময়ের কথা স্বরণ করুন) যখন আপনার প্রতিপালক ঘোষণা করলেন, তিনি কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তাদের (ইয়াহুদীদের) উপর

এমন লোকদেরকে কর্তৃত্ব দান করতে থাকবেন, যারা তাদেরকে নিকৃষ্ট রকমের শাস্তি দিবে! (সূরা আ'রাফ, আয়াত:১৬৭)

আল্লাহর এ বাণীর সত্যতা প্রমাণে আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাসে খৃষ্ট্রীয় দ্বিতীয় সহস্রাব্দে Anti Semitism এবং Pogrom এর শিকার হয়ে হাজার হাজার শুধু নয়; বরং লাখ লাখ ইয়াহুদী নিহত হয়। এক কথায় তা ছিলো ধারাবাহিক ইয়াহুদী নিধন প্রক্রিয়া। পৃথিবীর যে ভূখণ্ডেই তারা গিয়েছে, নির্যাতন-নিপীড়ন এবং লাঞ্ছনা ও অপদস্থতার ছাঁয়া তাদের পিছু ছাড়েনি। আল্লাহ'র এ বাণী সন্দেহাতীতভাবে সত্য প্রমাণিত হয়েছে যে, "তাদেরকে (ইয়াহুদীদেরকে) যেখানেই পাওয়া যাক, তাদের উপর লাঞ্ছনার ছাপ মেরে দেয়া হয়েছে"

খৃষ্ট্রীয় দ্বিতীয় সহস্রাব্দের নিকট অতীতে Pogrom এর সংখ্যা অসংখ্য। যেগুলোর বিস্তৃত ইতিহাসের আলোচনার জন্য বৃহৎ কলেবরের স্বতন্ত্র গ্রন্থের প্রয়োজন হবে। নিবন্ধের এ ছোট পরিসরে আমরা পাঠক সমীপে প্রসিদ্ধ কিছু Pogrom এর চিত্র সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরতে চেষ্টা করব। বিস্তারিত তথ্যের জন্য আগ্রহী পাঠক সংশ্লিষ্ট উদ্ধৃতিগ্রন্থ ও মূল উৎসসমূহ পাঠ করতে পারেন।

বিভিন্ন দেশে এ Pogrom সংঘঠিত হয়। যেমনঃ

- এরফার্ট (জার্মানি) ১৩৪৯ সালে, বাসেল (সুইজারল্যান্ড), এরাগন (স্পেন) ফ্লান্ডার্স (বেলজিয়াম)-এর Pogrom–এ অসংখ্য ইয়াহুদী নিহত হয়। পাঠক এ Pogrom এর বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখতে পারেন *John Marshall: John Locke, Toleration and Early Enlightment Culture (2006); p. 376*

- স্ট্রাসবার্গ (ফ্রান্স) ১৩৪৯ সালে Pogrom সংঘঠিত হয়। পাঠক এ Pogrom এর বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখতে পারেন *Stéphane Barry and Norbert Gualde: «La plus grande épidémie de l'histoire» ("The greatest epidemic in history"), in L'Histoire magazine, n° 310, June 2006 p. 47 (French)*

www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com

- তোলন (ফ্রান্স) ১৩৪৮ সালে Pogrom সংঘঠিত হয়। পাঠক এ Pogrom এর বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখতে পারেন *The Jews of Europe and the Black Death (2000) p. 13*

- প্রাগ (চেক রিপাবলিক) ১৩৯৯ সালে Pogrom সংঘঠিত হয়। প্রাগের এই Pogrom -এ চার থেকে পাঁচশত ইয়াহুদীকে হত্যা করা হয়। পাঠক এ Pogrom এর বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখতে পারেন *Barbara Newman: The Passion of the Jews of Prague: The Pogrom of 1389 and the Lessons of Medieval Parody, Church History 81:1 (March 2012), 1-26*

- ইউক্রেনে ১৬৪৮-১৬৫৭ সালে Pogrom সংঘঠিত হয়। এ Pogrom এর বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখা যেতে পারে *Anna Reid: Borderland: A Journey Through the History of Ukraine. (Westview Press) p. 35*

- রাশিয়া ১৮৫৯ (এবং ১৮৭১, ১৮৮১) ও ১৯০৫ সালে Pogrom সংঘঠিত হয়। ১৯০৫ সালের Pogrom -এ ৪০০ ইয়াহুদীকে হত্যা করা হয় এবং ১৬০০ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়) পাঠক এ Pogrom গুলোর বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখতে পারেন *(“Odessa”, Jewish Encyclopedia, 1906), Ges (Richard S. Levy: Antisemitism: A Historical Encyclopedia of Prejudice and Persecution, Volume 2, L-Z, s.v. “Odessa Pogroms”)*

উল্লিখিত Pogrom ছাড়াও আরো বিভিন্ন অঞ্চলে- যেখানে ইয়াহুদীদের বসবাস ছিলো- Pogrom সংঘঠিত হয়। যেমন- ফ্রান্সে ১৩০৬, ১৩২১ এবং ১৫৮২ সালে। ১৫৮২ সালের Pogrom -এ ইয়াহুদীদেরকে ফ্রান্স থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। ১৫৪০ সালে

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

ইতালীতে Pogrom হয় এবং ইয়াহুদীরকে ইতালী থেকে বের করে দেওয়া হয়। (মুযিয়ু তারীখিল ইয়াহুদ, পৃ. ২৬২)

এ ব্যপারে বিস্তারিত জানার জন্য পাঠক দেখতে পারেন ইয়াহুদী ঐতিহাসিক শাহীন ম্যাকারিয়াস কৃত (তারীখুল ইসরাইলিয়্যীন : ৮১-৯৫)

➢ **লাঞ্ছনার চতুর্থ পর্ব: ২য় বিশ্বযুদ্ধ**

Holocaust: এর মর্মান্তিক ঘটনা!

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইয়াহুদী জাতি ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়ংকর গণহত্যার শিকার হয়। Holocaust এর সেই গা শিউরে ওঠা গণহত্যার নায়ক হিটলার একসঙ্গে ৬০, ০০, ০০০ (ষাট লক্ষ) ইয়াহুদীকে গ্যাস চেম্বারে ঢুকিয়ে হত্যা করেছিলো! লাঞ্ছনার এত বড় চিত্র ইয়াহুদী জাতি হয়তো ইতোপূর্বে আর কখনোই অবলোকন করেনি। ইতিহাসের সে স্মরণীয় গণহত্যার কথা তো সবাই জানে। তদুপরি আগ্রহী পাঠক সে গণহত্যার বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখতে পারেন-

Timothy Snyder: Bloodlands: Europe between Hitler and Stalin. (The Bodley Head: London 2010) p. 389, 413, chpt. Numbers and Terms

➢ **লাঞ্ছনার আরো একটি পর্ব: কেয়ামতের পূর্বে ইয়াহুদী জাতি আরো একটি গণহত্যার অপেক্ষায়!!**

এই ছিলো ইয়াহুদী জাতির লাঞ্ছনা আর অপদস্থতার ইতিহাস। আল্লাহর শাশ্বত বাণীর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের সংক্ষিপ্ত চিত্রায়ন, যা এ যাবত সংঘঠিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন এ দূর্ভাগা জাতির ভাগ্যকুলে আরো কত লাঞ্ছনার ঢেউ আছড়ে পড়বে। নির্যাতন আর নিপীড়নের কালো মেঘ আরো কতবার তাদের জীবনাকাশে অপদস্থতার ছায়াপাত করবে। তবে হ্যাঁ, কুরআন-হাদীসে বিশ্বাসী একজন মুমিন যেমন এ বিশ্বাস স্থাপন করে যে, শেষ যামানায় হযরত 'ঈসা আ. ও দাজ্জালের আগমন ঘটবে, তেমনি এ বিশ্বাসও সে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে যে, ইয়াহুদীদের জন্য কমপক্ষে আরো একটি

TOP

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

গণহত্যা অপেক্ষা করছে, আর সে গণহত্যার মাধ্যমেই পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে তাদের বিলুপ্তি সাধিত হবে। কেননা, হাদীসে এসেছে, শেষ যামানায় ইয়াহুদীরা দাজ্জালের সহযোগী হবে এবং 'ঈসা আ. মুসলমানদের সাথে নিয়ে দাজ্জালকে হত্যা করার পাশাপাশি সমস্ত ইয়াহুদীকে হত্যা করবেন...!!

বর্তমান সময়ে প্রতিষ্ঠিত 'ইসরাইল রাষ্ট্র'

একটি বিষয় এখানে স্পষ্ট করা দরকার যে, বর্তমান সময়ে প্রতিষ্ঠিত ইসরাইল রাষ্ট্র ইয়াহুদী জাতির জন্য সম্মানজনক নাকি অপমানজনক? এবং তাদের এ নতুন সহাবস্থান তাদের উজ্জল ভবিষ্যতের জন্য নাকি এ সহাবস্থানের মাধ্যমে তারা আরো সহজেই গণহত্যার শিকার হয়ে পৃথিবী হতে বিলুপ্ত হতে চলেছে? বিষয়টা বুঝতে হলে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে কিছুটা ধারণা লাভ করা আবশ্যক।

দু' হাজার বছর যাবত জুলুম নির্যাতন আর উদ্বাস্তুর জীবন যাপনের পর একটি স্বাধীন ইয়াহুদী ভূখণ্ড লাভের মাধ্যমে লাঞ্ছনার জীবন অবসানের লক্ষ্যে ইয়াহুদীদের মাঝে Zionism (যায়োনিযম) প্রতিষ্ঠা লাভ করে। *(সূত্র: Zionism. যায়োনিযম। ইয়াহুদীদের একটি পরিভাষা, যা জেরুজালেমের 'যায়োন' নামক টিলা থেকে এসেছে। পৃথক ইয়াহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সৃষ্ট ইয়াহুদীদের জাতীয় আন্দোলনকে যায়োনিযম বলা হয়। Encyclopedia Brittanica. 15th Edition; U.S.A. 1990| 22/139)*

সর্বপ্রথম প্রসিদ্ধ যায়োনিস্ট (পৃথক ইয়াহুদী রাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টা) হচ্ছে একজন অস্ট্রিয়ান সাংবাদিক Theodor Herzl (থিয়েডার হারযাল, মৃত্যু ১৯০৪ খৃ.)। উসমানী খেলাফত আমলে হারযাল ফিলিস্তিন ভূখন্ডকে স্বায়ত্তশাসনের ফরমান জারি করার দাবি জানায়। কিন্তু খেলাফতের পক্ষ্য হতে এ দাবি প্রত্যাক্ষাত হয়। ঘটনার পরিক্রমায় এক পর্যায়ে হারযাল তার আন্দোলনকে লন্ডনেও প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় এবং সেখানে সে তার অন্দোলনের ব্যাপারে সমর্থন লাভ করে।

TOP

GET ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

সূত্র: ১২৯৯ সাল থেকে নিয়ে ১৯২২ সাল পর্যন্ত উসমানী খেলাফত প্রতিষ্ঠিত ছিলো। ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত সংঘঠিত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ই মূলত উসমানী খেলাফতের পতন হয়ে যায়। ছিটেফোটা যতটুকু অবশিষ্ট ছিলো, মোস্তফা কামাল ১৯১৯ থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত সময়ে তুরস্কের স্বাধীনতা আন্দোলনের নামে তাও শেষ করে দেয়। সর্বশেষ ১৭ নভেম্বর ১৯২২ সালে চূড়ান্তরূপে উসমানী খেলাফতের পতন ঘটে। উল্লেখ্য, পশ্চিমারা এই উসমানী খেলাফতকে 'অটোমান সম্রাজ্য' বলে থাকে।

প্রথমদিকে যায়োনিযমের কেন্দ্র ছিলো জার্মানিতে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তা লন্ডনে স্থানান্তরিত করা হয় এবং এরপর থেকে যায়োনিযমের আর্থিক চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে আমেরিকা এবং পোল্যান্ডের ইয়াহুদীরা। ১৯১৮ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে উসমানী খেলাফতের পতনের পর জুলাই ২৪/১৯২২ সালে League of Nations (লীগ আভ নেশন্স) *[সূত্র: ১৯১৯ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর গঠিত 'সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ', যা ১৯৪৬ সালে অবলুপ্ত হয় এবং তার বিলুপ্তির পরপরই গঠিত হয় বর্তমানের 'জাতিসংঘ']*

এর পরিষদমণ্ডলী বৃটেনকে ফিলিস্তিন ভূখন্ডের দখলস্বত্ত্বের আনুষ্ঠানিক অনুমোদন প্রদান করে। মে ১৪/১৯৪৮ সালে বৃটিশদের চাতুরতায় এবং পশ্চিমা শক্তির সহযোগিতায় ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডের এক অংশে ইসরাইল রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং সাথে সাথে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্র তাকে স্বীকৃত দেয়। ২ হাজার বছরের মধ্যে এটাই সর্বপ্রথম ইয়াহুদী রাষ্ট্র, যা কায়েম করা হয়ছে। যা সম্পূর্ণরূপে বৃটিশ এবং পশ্চিমা চাতুরতার আশ্রয়ে অন্যায় দখলদারিত্বের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। *(Encyclopedia Brittanica (15th Edition; U.S.A. 1990) 22/133-141)*

Zionism বা স্বাধীন ইয়াহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন লন্ডনে জনসমর্থন লাভ করার বিষয়টি প্রমাণ করে যে, এ আন্দোলন প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে পশ্চিমা খৃষ্টানদের সহযোগিতায় এবং প্রতিষ্ঠার মূহুর্ত পরেই রাশিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন প্রমাণ করে যে, লীগ অভ নেশন্সের শিরোনামে ইসরাইল প্রতিষ্ঠা ছিলো মূলত একটি চাতুরতা

এবং এর পেছনে কাজ করেছে সম্পূর্ণরূপে আমেরিকা, বৃটেন, রাশিয়া এবং অন্যান্য পশ্চিমা শক্তি।

কাজেই সারকথা হলো যে, রাষ্ট্র হিসেবে ইসরাইলের প্রতিষ্ঠা এবং টিকে থাকা- সবকিছুই মূলত পশ্চিমাদের কৃপাদান বৈ কিছুই নয়। আর যেহেতু ফিলিস্তিন ভূখণ্ড এশিয়া, ইউরোপ এবং আফ্রিকা- তিন মহাদেশের সঙ্গমস্থলে এবং সুয়েজ খালের অববাহিকায় গড়ে উঠেছে, কাজেই এ ভূখণ্ডে ইসরাইল প্রতিষ্ঠার দ্বারা পশ্চিমাদের উদ্দেশ্য হলো,

- ✓ মধ্যপ্রাচ্যের আরবদেশগুলোতে আগ্রাসন চালানোর নিমিত্তে একটি সেনাছাউনি তৈরি করা।
- ✓ তিন মহাদেশের মাঝে বিশ্ব বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ লাভ করা।
- ✓ পাশাপাশি এতদ্বাঞ্চলের দুর্বল জাতিগোষ্ঠির উপর আগ্রাসন চালিয়ে এ সকল ভূখণ্ডের মাটির নীচে থাকা প্রাকৃতিক মূল্যবান খনিজ সম্পদের উপর ক্ষমতা লাভ করা।

কাজেই এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, ইয়াহুদীরা মূলত স্বাধীনতা লাভ করেনি; বরং পশ্চিমাদের স্বার্থ রক্ষার্থে গোলামীর জীবন গ্রহণ করেছে। যখন পশ্চিমাদের প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে যাবে, তখন Pogrom এর মাধ্যমে ইয়াহুদীরকে গণহত্যা করতে তারা মোটেও কুণ্ঠিত হবে না। অতীত ইতিহাস অন্তত সেটাই আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয়।

এরপরও অন্যের স্বার্থরক্ষার্থে কোন ভূখণ্ড পাহারা দেওয়া যদি সম্মানজনক মেনেও নেওয়া হয়, তবে সেক্ষেত্রেও পবিত্র কুরআনে কারীমের বক্তব্যের সাথে কোনো বৈপরীত্ব সৃষ্টি হয় না। কেননা, কুরআনে কারীমে যেখানে ইয়াহুদীদের উপর লাঞ্ছনার কথা বলা হয়েছে, সেখানে এটাও বলা হয়েছে যে, “অবশ্য যদি আল্লাহর তরফ হতে কোনো উপায় সৃষ্টি হয়ে যায় কিংবা মানুষের পক্ষ হতে কোনো অবলম্বন বের হয়ে আসে” (যা তাদেরকে পোষকতা দান করবে, তবে সাময়িকভাবে তারা লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি পাবে)। সুতরাং বাহ্যিকভাবে ইয়াহুদীদের লাঞ্ছনা থেকে এ বাহ্যিক মুক্তি মূলত

পশ্চিমাদের পোষকতার কারণে সম্ভব হয়েছে। তদুপরি বিবেচনার বিষয় হলো- দু'হাজার বছরের লাঞ্ছনার ইতিহাসের পর বিশাল পৃথিবীর সামান্য একটু অংশের অন্যায় দখলদারিত্ব, তাও আবার অন্যের সহযোগিতায়, এটা দু' হাজার বছরের লাঞ্ছনার তুলনায় একটি জাতির জন্য কতটুকু সম্মানপ্রাপ্তি ধরা যেতে পারে ?

প্রকৃত সত্য হলো, দু'হাজার বছরের লাঞ্ছনার পর ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে ইয়াহুদীদের এই সহাবস্থানের সুযোগ মূলত তাদেরকে সম্মানিত করার জন্য নয়; বরং চূড়ান্তরূপে লাঞ্ছিত করার উদ্দেশ্যে সহজ প্রেক্ষাপট তৈরির উদ্দেশ্যে দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেমে দীন মুফতীয়ে আজম মুফতী শফী রহ. এর উদ্ধৃতির মাধ্যমেই আমরা আমাদের বক্তব্যের ইতি টানবো। তিনি তার অনবদ্য তাফসীর গ্রন্থ 'তাফসীরে মাআরিফুল কুরআনে সূরা আরাফের ১৬৮ নং আয়াতে তাফসীর করতে গিয়ে বলেন-

چند سال سے فلسطین کے ایک حصہ میں انکے اجتماع اور مصنوعی اقتدار سے دھوکہ نہ کھایا جاے، اجتماع تو انکا اس جگہ میں آخری زمانہ میں ہونا ہی چاہیے تھا کیونکہ صادق مصدوق رسول کریم ﷺ کی احادیث صحیحہ میں قرب قیامت کیلیے یہ خبر دی گی ہے کہ آخر زمانہ میں حضرت عیسی علیہ السلام نازل ہونگے نصاری سب مسلمان ہو جائیں گے اور یہود سے جہاد کرکے انکو قتل کرینگے، خدا کا مجرم وارنٹ اور پولیس کے ذریعہ پکڑ کر نہیں بلایا جاتا بلکہ وہ تکوینی اسباب ایسے جمع کر دیتے ہیں کہ مجرم اپنے پاووں چل کر ہزاروں کوششیں کرکے اپنے قتل گاہ پر پہنچ جاتا ہے حضرت عیسی علیہ السلام کا نزول ملک شام میں ہونے والا ہے، یہودیوں کے ساتھ معرکہ بھی یہیں بننا ہے تاکہ حضرت عیسی علیہ السلام کیلیے انکا قلع قمع کر دینا سہل ہو، قدرت نے دنیا کی پوری عمر میں تو یہودیوں کو مختلف ملکوں میں منتشر رکھ کر محکومیت اور بے قدری کا عذاب چکھلایا اور آخر زمانہ میں حضرت عیسی علیہ السلام کی آسانی کیلیے انکو انکے مقتل میں جمع فرمایا، اسلیے یہ اجتماع اس عذاب کے منافی نہیں.

কয়েক বছর যাবত ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের একটি অংশে ইয়াহুদীদের সহাবস্থান এবং কৃত্রিম ক্ষমতাপ্রাপ্তির কারণে (এটা ভেবে) ধোঁকা খাওয়া উচিত হবে না (যে, তারা সম্মানপ্রাপ্ত হয়েছে!), যেহেতু শেষ যামানায় এই ভূখণ্ডে ইয়াহুদীদের সহাবস্থান তো হওয়ারই কথা ছিলো। কেননা,

TOP

Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com App Store

কেয়ামতের ব্যাপারে সহীহ হাদীসসমূহে নবীজীর এ বাণী উদ্ধৃত হয়েছে যে, শেষ যামানায় হযরত ‘ঈসা আ. অবতীর্ণ হবেন। সকল খৃষ্টান তখন মুসলমান হয়ে যাবে এবং তিনি ইয়াহুদীদের সাথে জিহাদ করে তাদেরকে হত্যা করবেন।

আল্লাহ দরবারে অপরাধী ব্যক্তিকে (দুনিয়াবী অপরাধীর মতো) ‘ওয়ারেন্ট’ এবং পুলিশের মাধ্যমে ধরে আনা হয় না, বরং পর্দার আড়াল থেকে এমন সব প্রেক্ষাপট তৈরি করা হয় যে, অপরাধী সহস্র বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে নিজ পায়ে হেঁটে হেঁটে নিজের নিহত হওয়ার স্থানে এসে উপস্থিত হয়! (শেষ যামানায়) ‘ঈসা আ. শাম অঞ্চলের দামেশকে অবতীর্ণ হবেন। ইয়াহুদীদের সাথে লড়াইও এখানেই হবে। যাতে ‘ঈসা আ.এর জন্য লড়াই করা সহজ হয়।

আল্লাহ তা‘আলা তো ইয়াহুদী জাতিকে সারাজীবন বিভিন্ন দেশে লাঞ্ছনা এবং শোষণের তিক্ত স্বাদ আস্বাদন করিয়েছেন। শেষ যামানায় হযরত ‘ঈসা আ. এর সহজতার জন্য তাদেরকে তাদের নিহত হওয়ার স্থানে একত্র করে দিয়েছেন। সুতরাং কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা‘আলা কেয়ামত পর্যন্ত ‘তাদের উপর যে লাঞ্ছনার শাস্তি’ আরোপিত হওয়ার কথা বলেছেন, তার সাথে এ সহাবস্থানের কোনো বিরোধ নেই।

কওমে সাবার প্রতি আল্লাহর নাফরমানীর ভয়াবহ শাস্তি

আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِيْ مَسْكَنِهِمْ اٰيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَّمِيْنٍ وَشِمَالٍ كُلُوْا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوْا لَه بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَّرَبٌّ غَفُوْرٌ ○ فَاَعْرَضُوْا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ اُكُلٍ خَمْطٍ وَّاَثْلٍ وَّشَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيْلٍ○

সাবার অধিবাসীদের জন্য তাদের বাসভূমিতে রয়েছে এক নিদর্শন। দু’টি উদ্যান, একটি ডানদিকে এবং অপরটি বামদিকে অবস্থিত। (তাদের বলা হল,) তোমরা তোমাদের পালনকর্তার রিযিক খাও এবং তার শোকর আদায় কর। উত্তম এই শহর এবং মহান ক্ষমাশীল

তোমাদের প্রতিপালক। কিন্তু তারা অবাধ্যতা করলো। ফলে আমি তাদের উপর বাঁধভাঙা ঢল প্রবাহিত করলাম। আর তাদের উদ্যান দু'টি পরিবর্তন করে দিলাম এমন দু'টি উদ্যানে যাতে উদগত হয় বিস্বাদ ফলমূল, ঝাউগাছ এবং কিছু কুলবৃক্ষ। (সূরা সাবা, আয়াত:১৫-১৬)

কওমে সাবার পরিচয়

ইয়ামানের সম্রাট ও সেদেশের অধিবাসীদের উপাধি ছিল সাবা। তাবাবিয়া সম্প্রদায়ও সাবা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পবিত্র কুরআনের সূরা নামলে হযরত সুলাইমান 'আলাইহিস সালামের সাথে যে রাণী বিলকিসের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তিনিও এ সম্প্রদায়েরই ছিলেন।

অন্য বর্ণনামতে, সাবা কাহতানী কবিলার একটি প্রসিদ্ধ শাখা। আরবের ঐতিহাসিকগণ তাদের বংশপরম্পরা এভাবে বর্ণনা করেছেন, সাবা ইবনে ইয়াশজাব ইবনে ইয়ারব ইবনে কাহতান।

ইমাম আহমাদ রহ. বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে আব্দুর রহমান রহ. বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, কুরআনে কারীমে উল্লেখকৃত 'সাবা' কোন পুরুষের নাম না নারীর নাম, নাকি কোন ভূখণ্ডের নাম? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

بَلْ هُوَ رَجُلٌ وُلِدَ لَه عَشَرَةٌ فَسَكَنَ الْيَمَنَ مِنْهُمْ سِتَّةٌ وَالشَّامَ مِنْهُمْ اَرْبَعَةٌ فَاَمَّا الْيَمَانِيُّوْنَ فَمُذْحَجٌ وَكِنْدَةٌ وَالْاَزْدُ وَالْاَشْعَرِيُّوْنَ وَالْاَنْمَارُ وَ حِمْيَرُ وَاَمَّا الشَّامِيَّةُ فَلَخْمٌ وَجُذَامٌ وَعَامِلَةٌ وَغَسَّانُ.

সাবা একজন পুরুষের নাম, যার দশজন পুত্রসন্তান ছিল। তার মধ্যে ছয়জন ইয়ামানে এবং চারজন শামদেশে বসতি স্থাপন করে। ইয়ামানে বসবাসকারী ছয় পুত্রের নাম হচ্ছে, মুযহাজ, কিন্দাহ, আযদ, আশআরী, আনমার ও হিমইয়ার। (তাদের থেকে ছয়টি গোত্র জন্মলাভ করে।) আর শামদেশে বসবাসকারীদের নাম হচ্ছে, লাখম,

www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com

জুযাম, আমিলাহ ও গাসসান। (তাদের গোত্রসমূহ এই নামেই পরিচিত।) (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

বংশতালিকা বিশেষজ্ঞ আলেমগণের বরাত দিয়ে বিশিষ্ট তাফসীরবিদ আল্লামা ইসমাঈল ইবনে কাসীর রহ. বলেন, এই দশজন সাবার ঔরসজাত ও প্রত্যক্ষ পুত্র ছিল না। বরং তার দ্বিতীয়, তৃতীয় কিংবা চতুর্থপুরুষে এরা জন্মগ্রহণ করেছিল। অতঃপর তাদের গোত্রসমূহ শাম ও ইয়ামানে বিস্তার লাভ করে এবং তাদেরই নামে পরিচিত হয়।

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক রহ. বর্ণনা করেন, ‘সাবা’- এর আসল নাম হলো আবদে শামস ইবনে ইয়াশজাব ইবনে কাহতান। ইতিহাসবিদগণ লেখেন, সাবা আবদে শামস তার আমলে শেষনবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের সুসংবাদ মানুষকে শুনিয়েছিল। সম্ভবত তাওরাত ও ইঞ্জিল শরীফ থেকে সে এ বিষয়ে অবগত হয়েছিল বা জ্যোতিষীদের মাধ্যমে জানতে পেরেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে সে কয়েক লাইন আরবি কবিতাও বলেছিল। এসব কবিতায় তার আবির্ভাবের কথা উল্লেখ করে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিল যে, আমি তার সময়ে থাকলে, তাকে সাহায্য-সহযোগিতা করতাম এবং আমার সম্প্রদায়কেও তার প্রতি ঈমান আনতে বলতাম।

ইয়ামানের রাজধানী সান‘আ থেকে তিন মনযিল দূরে মাআরিব নগরী অবস্থিত ছিল। এখানে ছিল সাবা সম্প্রদায়ের বসতি। দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী উপত্যকায় শহরটি অবস্থিত ছিল বিধায় উভয় পাহাড়ের উপর থেকে বৃষ্টির পানি বন্যার আকারে নেমে আসত। ফলে শহরের জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ত। তখন সে দেশের সম্রাটগণ (তাদের মধ্যে রাণী বিলকিসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়) উভয় পাহাড়ের পাদদেশে শক্ত ও মজবুত বাঁধ নির্মাণ করেন। এ বাঁধ পাহাড় থেকে নেমে আসা বন্যার পানি রোধ করে পানির একটি বিরাট ভাণ্ডার তৈরি করে দেয়। পাহাড়ী ঢলের পানিও এতে সঞ্চিত হতে থাকে।

Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com App Store

বাঁধের উপরে-নিচে ও মাঝখানে পানি বের করার জন্য তিনটি দরজা নির্মাণ করা হয়, যাতে সঞ্চিত পানি শহরের লোকদের ক্ষেতে ও বাগানে পৌঁছানো যায়। প্রথমে উপরের দরজা খুলে পানি ছাড়া হত। উপরের পানি শেষ হয়ে গেলে মাঝখানের এবং সবশেষে নিচের তৃতীয় দরজা খুলে দেওয়া হত। পরবর্তী বছর বৃষ্টির মওসুমে বাঁধের তিনটি স্তরই আবার পানিতে পূর্ণ হয়ে যেত।

অপরদিকে বাধের নিচে পানি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে একটি সুবৃহৎ আধার নির্মাণ করা হয়েছিল। এতে পানির বারোটি খাল তৈরি করে শহরের বিভিন্ন দিকে পৌঁছানো হয়েছিল। সবখানে একই গতিতে পানি প্রবাহিত হত এবং নাগরিকদের প্রয়োজন মেটাত।

শহরের ডান ও বাম পার্শ্বে অবস্থিত পাহাড় দু'টির কিনারায় ফল-মূলের বাগান করা হয়েছিল। এসব বাগ-বাগিচায় খালের পানি প্রবাহিত হত। এ সকল বাগান পরস্পর সংলগ্ন অবস্থায় দুই পাহাড়ের কিনারায় সারিবদ্ধভাবে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এসব বাগানের রকমারি ফলমূলের মাধ্যমে তারা প্রাচুর্যের অধিকারী হয়েছিল। নিচের এই আয়াতে এসব বাগানের কথাই বর্ণনা করা হয়েছে,

لَقَدْ كَانَ لِسَبَاٍ فِيْ مَسْكَنِهِمْ اٰيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَّمِيْنٍ وَّشِمَالٍ

সাবার অধিবাসীদের জন্য তাদের বাসভূমিতে রয়েছে এক নিদর্শন। দু'টি উদ্যান, একটি ডান দিকে এবং অপরটি বাম দিকে অবস্থিত। (সূরা সাবা, আয়াত:১৫)

সাবাবাসীদের বাগান অনেকগুলো হওয়া সত্ত্বেও তাদের বাগানগুলোকে উপরোক্ত আয়াতে جَنَّتَانِ বা দু'টি বাগান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, এক সারির সমস্ত বাগান পরস্পর সংলগ্ন হওয়ার কারণে এক বাগান এবং অপর সারির সমস্ত বাগানকে একই কারণে দ্বিতীয় বাগান বলে অভিহিত করা হয়েছে।

এসব বাগানে সবরকম বৃক্ষ ও ফল-মূল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হতো। হযরত কাতাদা রহ. প্রমুখের বর্ণনা অনুযায়ী, একজন লোক মাথায়

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

খালি ঝুড়ি নিয়ে বাগানে গমন করলে, গাছ থেকে পতিত ফল-মূল দ্বারা তা আপনা-আপনি ভরে যেত; গাছ থেকে পেড়ে নেয়ার প্রয়োজন হত না।

আল্লাহ তা‘আলা সাবাবাসীদের প্রতি অনুগ্রহ করে তাদের শহর মাআরিব থেকে নিয়ে শাম পর্যন্ত এলাকায় অল্প অল্প দূরত্বে জনবসতি প্রতিষ্ঠিত করে দেন। নিচের এই আয়াতে এ কথারই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে,

وَ جَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْقُرَى الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَّ قَدَّرْنَا فِيْهَا السَّيْرَ ؕ سِيْرُوْا فِيْهَا لَيَالِيَ وَ اَيَّامًا اٰمِنِيْنَ○

তাদের জনপদ এবং সেসব জনপদ, যেখানে আমি বরকত দিয়ে রেখেছি, সেগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে অনেক দৃশ্যমান জনপদ স্থাপন করেছি এবং সেগুলোতে ভ্রমণের যথাযথ ব্যবস্থা করে রেখেছি। তোমরা এসব জনপদে রাতে ও দিনে নিরাপদে ভ্রমণ করো। (সূরা সাবা, আয়াত:১৮)

পবিত্র কুরআনের এই আয়াতে সাবার অধিবাসীদের প্রতি আল্লাহ তা‘আলার আরো দু’টি নিয়ামতের কথা আলোচনা করা হয়েছে। এখানে اَلْقُرٰى الَّتِيْ بَارَكْنَا فِيْهَا (সেসব জনপদ, যেখানে আমি বরকত দিয়ে রেখেছি) বলে শামদেশের গ্রামাঞ্চলকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে রহমত ও বরকত নাযিল হওয়ার কথা একাধিক আয়াতে শামদেশের কথা স্পষ্টরূপে বর্ণিত আছে।

আয়াতের উদ্দেশ্য হলো, যেসব জনপদে আল্লাহ তা‘আলা বরকত দান করেছেন, সাবার অধিবাসীদের ব্যবসার উদ্দেশ্যে প্রায়ই সেসব জনপদে তাদের সফর করতে হতো। মাআরিব শহর থেকে শামের দূরত্ব ছিল অনেক। রাস্তাও সহজসাধ্য ছিল না। আল্লাহ তা‘আলা সাবা সম্প্রদায়ের প্রতি অনুগ্রহ করে তাদের শহর মাআরিব থেকে শাম পর্যন্ত অল্প অল্প দূরত্বে জনবসতি প্রতিষ্ঠিত করে দেন। এসব জনবসতি সড়কের কিনারায় অবস্থিত ছিল। তাই উল্লিখিত আয়াতে قُرًى ظَاهِرَةً

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

‘দৃশ্যমান জনপদ’ বলা হয়েছে, যা সকল মুসাফিরই চেনে। এ সকল জনবসতির ফলে কোন ভ্রমণকারী নিজ গৃহ থেকে বেরিয়ে দ্বিপ্রহরে বিশ্রাম অথবা খাদ্যগ্রহণ করতে চাইলে অনায়াসেই কোন জনপদে পৌঁছে নিয়মিত খাদ্যগ্রহণ করে আরাম করতে পারত। অতঃপর যুহরের পর রওয়ানা হয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অন্য এলাকায় পৌঁছে রাত্রিযাপন করতে পারত। তাই তো আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ

(সেই এলাকাগুলোতে ভ্রমণের উপযুক্ত ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম।) অর্থাৎ সেই জনপদগুলো এমন সুষম ও সমান দূরত্বে গড়ে উঠেছিল যে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এক জনবসতি থেকে অন্য জনবসতিতে পৌঁছা যেত এবং ভ্রমণ করতে অত্যন্ত সুবিধা হত। তাই এরপর উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে,

سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ

(তোমরা এসব জনপদে রাতে ও দিনে নিরাপদে ভ্রমণ কর।)

বস্তুত এটা সাবা সম্প্রদায়ের প্রতি আল্লাহ তা‘আলার প্রদত্ত আরেকটি নিয়ামত। অর্থাৎ উক্ত বসতিগুলোর সমান দূরত্বের কারণে সমানতালে পথ অতিক্রম করা যেত। রাস্তাও সবটুকু নিরাপদ ছিল। চোর-ডাকাতের উপদ্রব ছিল না। এ কারণে দিবা-রাত্রি সর্বক্ষণ নিশ্চিন্ত মনে এসব এলাকা দিয়ে সফর করা যেত।

কিন্তু জালিম নাফরমান সম্প্রদায় আল্লাহ তা‘আলার উপরোক্ত নিয়ামাতের কদর বুঝলো না। তাই তারা নাশোকরি করে বলতে লাগলো,

رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا

হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের ভ্রমণের পরিসর বাড়িয়ে দিন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ

তারা এভাবে নিজেদের উপর জুলুম করেছিল। (সূরা সাবা, আয়াত:১৯)

TOP

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

কত আশ্চর্যের কথা! সেই সম্প্রদায়ের লোকেরা আল্লাহ তা'আলার নিকট বিরূপ অবস্থার জন্য আবদার জানালো, আমাদের জন্য ভ্রমণের দূরত্ব সৃষ্টি করে দিন, যাতে কাছাকাছি কোন জনপদ না থাকে। মাঝখানে জঙ্গল ও জনমানবহীন প্রান্তর থাকুক। যাতে কিছু কষ্ট সহ্য করতে হয়। তাতে আমরা সফর ও বাড়িতে অবস্থানের মাঝে পার্থক্য অনুভব করতে পারবো।

বস্তুত এক্ষেত্রে তাদের অবস্থা ছিল বনী ইসরাইলের অনুরূপ, যারা কোনরূপ কষ্ট ও শ্রম ব্যতিরেকেই আসমানি খাদ্য মান্না-সালওয়া কুদরতীভাবে পেয়েছিল। কিন্তু তা পেয়ে শোকর 'আদায়ের পরিবর্তে উল্টো তারা আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করছিল, হে আল্লাহ, এর পরিবর্তে আমাদের ভূমিতে উৎপন্ন সবজি ও তরকারি দান করুন। (কাসাসুল কুরআন)

সাবাবাসীর প্রতি দীনের দাওয়াত

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক রহ. ওহহাব ইবনে মুনাব্বিহ রহ. থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা সাবাবাসীদের নিকট তেরজন নবী প্রেরণ করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা এসকল নবীর মাধ্যমে তাদের আদেশ দিয়েছিলেন, তোমরা আল্লাহপ্রদত্ত রকমারি ফল-ফলাদি ভক্ষণ কর এবং তারই দেওয়া অফুরন্ত জীবনোপকরণ ব্যবহার করো। আর কৃতজ্ঞতা হিসেবে সৎকর্ম ও আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করো। এই দিকেই ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

كُلُوا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهٗ ؕ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَّرَبٌّ غَفُوْرٌ ۝

তোমরা তোমাদের পালনকর্তার রিযিক খাও এবং তার শোকর 'আদায় কর। উত্তম এই শহর এবং মহান ক্ষমাশীল (তোমাদের) প্রতিপালক। (সূরা সাবা, আয়াত:১৫)

বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা তাদের এ শহরকে পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর শহর করেছিলেন। শহরটি ছিল নাতিশীতোষ্ণ। আবহাওয়া স্বাস্থ্যকর ও বিশুদ্ধ ছিল। সমগ্র শহরে মশা-মাছি, ছারপোকা ও সাপ-

বিচ্ছুর মতো প্রাণীর নাম-গন্ধও ছিল না। বাইরে থেকে কেউ শরীরে ও কাপড়-চোপড়ে উকুন ইত্যাদি নিয়ে প্রবেশ করলে, তা আপনা-আপনি মরে সাফ হয়ে যেত। এজন্যই উক্ত আয়াতে সেই জনপদকে

بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ

'উত্তম শহর' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

এরপর উক্ত আয়াতে

وَرَبٌّ غَفُوْرٌ

বলে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এসব নিয়ামত ও ভোগ-বিলাস কেবল ইহজগত পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়, বরং মহান প্রতিপালকের শোকর আদায় করলে পরকালে আরও বৃহৎ ও স্থায়ী নিয়ামতের ব্যবস্থা রয়েছে। এজন্য অতীত অন্যায় ও অপরাধের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে সংশোধন হও এবং তোমাদের প্রতিপালকের আনুগত্য করো। তা হলে তোমরা প্রতিপালকের ক্ষমা ও অনুগ্রহ লাভ করতে পারবে। কারণ, এসব নিয়ামতের স্রষ্টা ও তোমাদের পালনকর্তা মহা ক্ষমাশীল।

সাবাবাসীর দীনবিমুখতা

فَاَعْرَضُوْا কিন্তু সাবা সম্প্রদায় নবীদের এই দাওয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। তারা তাওহীদের আকীদা, আল্লাহর ইবাদত ও তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা থেকে বিমুখ হলো এবং সূর্যের পূজা করতে আরম্ভ করলো। এদিকে ইঙ্গিত করেই হুদহুদ পাখি হযরত সুলাইমান 'আলাইহিস সালামকে বলেছিল,

وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَاٍۭ بِنَبَاٍ يَّقِيْنٍ ○ اِنِّيْ وَجَدْتُّ امْرَاَةً تَمْلِكُهُمْ وَاُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَّلَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ ○وَجَدْتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُوْنَ○

আমি আপনার কাছে সাবা থেকে নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে আগমন করেছি। আমি এক নারীকে সাবাবাসীদের উপর রাজত্ব করতে দেখেছি। তাকে সবকিছুই দেওয়া হয়েছে এবং তার একটা বিরাট সিংহাসন আছে। আমি তাকে ও তার কওমকে দেখলাম তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে

TOP

সিজদা করে। বস্তুত শয়তান তাদের কার্যাবলিকে তাদের জন্য সুশোভিত করে রেখেছে এবং তাদের সৎপথ থেকে ফিরিয়ে রেখেছে। তাই তারা সৎপথ পাচ্ছে না। (সূরা নামল, আয়াত:২২-২৪)

সাবাবাসীর উপর আল্লাহর আযাব

আল্লাহ তা'আলার সুবিস্তৃত নিয়ামত ও নবীগণের হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও যখন সাবা সম্প্রদায় আল্লাহ তা'আলার আদেশ অমান্য করলো, তখন তিনি তাদের উপর বাঁধভাঙা বন্যারূপে গজব নাযিল করলেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ

অতঃপর আমি তাদের উপর বাঁধভাঙা ঢল প্রবাহিত করলাম। (সূরা সাবা, আয়াত:১৬)

বন্যাকে বাঁধের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করার কারণ হলো যে বাঁধ তাদের সংরক্ষণ ও স্বাচ্ছন্দ্যের উপায় ছিল, আল্লাহ তা'আলা তাকেই তাদের ধ্বংস ও বিপর্যয়ের কারণ বানিয়ে দিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা., ওয়াহহাব ইবনে মুনাব্বিহ রহ., কাতাদা রহ., যাহহাক রহ. প্রমুখ তাফসীরবিদ বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা যখন এ সম্প্রদায়কে বাঁধভাঙা বন্যা দ্বারা ধ্বংস করার ইচ্ছা করলেন, তখন এই সুবৃহৎ বাঁধের গোড়ায় অন্ধ ইঁদুর প্রেরণ করলেন। তারা এর ভিত্তি দুর্বল করে দিল। ফলে বৃষ্টির মওসুমে পানির প্রচন্ড চাপে দুর্বল ভিতের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি হলো। অবশেষে বাঁধ ধসে তার পেছনে সঞ্চিত পানি সমগ্র উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়লো। ফলে শহরের সমস্ত ঘর-বাড়ি বিধ্বস্ত হয়ে গেল এবং গাছপালা উজাড় হয়ে গেল। আর পাহাড়ের কিনারায় সারিবদ্ধ উদ্যানের জন্য সংরক্ষিত পানি নিঃশেষ হয়ে গেল।

ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ রহ. বর্ণনা করেন, তাদের কিতাবে লেখা ছিল, এই বাঁধটি ইঁদুরের দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। সেমতে বাঁধের কাছে ইঁদুর

TOP
Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com App Store

দেখে তারা বিপদ সংকেত বুঝতে পারলো। তখন ইঁদুর নিধনের জন্য তারা বাঁধের নিচে অনেক বিড়াল ছেড়ে দিলো, যাতে বাঁধের কাছে ইঁদুর আসতে না পারে। কিন্তু আল্লাহর তাকদীর রোধ করার সাধ্য কারো নেই। তাই তাদের বিড়ালগুলো গযবের ইঁদুরের কাছে হার মানলো এবং ইঁদুর বাঁধের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়ে গেল।

ঐতিহাসিক বর্ণনায় আরো বলা হয়েছে, কিছুসংখ্যক বিচক্ষণ ও দূরদর্শী লোক ইঁদুর দেখামাত্র সে এলাকা ত্যাগ করে আস্তে আস্তে অন্যত্র চলে গেল। অবশিষ্টরা সেখানেই রয়ে গেল। কিন্তু বন্যা শুরু হলে, তারাও চলে যেতে লাগলো। তবে তাদের অধিকাংশই বন্যায় প্রাণ হারালো এবং খুব কম সংখ্যক লোক বেঁচে রইলো। মোটকথা সমস্ত শহর জনশূন্য হয়ে গেল।

সেইসব অধিবাসী অন্যত্র চলে গিয়েছিল, তাদের ছয়টি গোত্র ইয়ামানে এবং চারটি শামদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। মদীনার বসতিও তাদের কতক গোত্র থেকে শুরু হয়।

বন্যার ফলে শহর ধ্বংস হওয়ার পর তাদের সারিবদ্ধ দুই উদ্যানের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ

আমি তাদের উদ্যান দু'টি পরিবর্তন করে দিলাম এমন দু'টি উদ্যানে, যাতে উদগত হয় বিস্বাদ ফলমূল, ঝাউগাছ ও কিছু কুলবৃক্ষ। (সূরা সাবা, আয়াত:১৬)

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদের মূল্যবান ফলমূলের বৃক্ষের পরিবর্তে এমন বৃক্ষ উৎপন্ন করলেন, যার ফল ছিল বিস্বাদ। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা., মুজাহিদ রহ., ইকরীমা রহ. প্রমুখ বলেন, خَمْطٍ অর্থ বাবলা গাছ। তবে অনেক তাফসীরবিদের মতে, خَمْطٍ এর অর্থ এরাফ বৃক্ষ। জাওহারি রহ. লিখেছেন, একপ্রকার এরাফ বৃক্ষে কিছু ফল ধরে এবং তা খাওয়াও হয়। কিন্তু তাদের এই বৃক্ষের ফল বিস্বাদ

ছিল। অপরদিকে হযরত আবু উবায়দা রহ. বলেন, তিক্ত ও কাঁটাযুক্ত বৃক্ষকে خَمْطٍ বলা হয়।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে হযরত আওফী রহ. বলেন, اَثْلٍ অর্থ ঝাউগাছ। কেউ কেউ বলেন, ঝাউগাছের মতোই দেখতে এক প্রকার বৃক্ষ। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

سِدْر অর্থ কুলগাছ। এক প্রকার কুল বা বরই বাগানে যত্নসহকারে লাগানো হয় এবং তার ফল হয় সুস্বাদু। এ ধরনের গাছে কাঁটা কম এবং ফল বেশি হয়। আরেক প্রকার হয় জংলি কুলগাছ। এটা জঙ্গলে উদগত ও কাঁটাযুক্ত ঝাড় হয়ে থাকে এবং ফল কম হয়ে থাকে। আয়াতে سِدْر শব্দের সাথে قَلِيْلٍ যুক্ত করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সেই বাগানের কুলগাছও জংলি ও স্বউদগত ছিল, যাতে ফল কম এবং কাঁটা বেশি ও খুব টক ছিল, যা মোটেই খাওয়ার উপযোগী ছিল না।

তাদের কুফরীর কারণেই আল্লাহ তা'আলা তাদের এ শাস্তি দিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

ذٰلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوْا وَهَلْ نُجَازِىْ اِلَّا الْكَفُوْرَ○

আমি তাদের এ শাস্তি দিয়েছিলাম তাদের কুফরীর দরুন। আমি অতিশয় অকৃতজ্ঞ নাফরমান ব্যতীত কাউকে এমন শাস্তি দিই না। (সূরা সাবা, আয়াত:১৭)

كَفُوْر শব্দের অর্থ অতিশয় কুফরকারী। আয়াতের অর্থ হল, আমি অতিশয় কুফরকারী ব্যতীত কাউকে শাস্তি দিই না। এটা বাহ্যত সেসব আয়াত ও সহীহ হাদীসের পরিপন্থী মনে হয়, যেগুলো দ্বারা প্রমাণিত আছে, গুনাহগার মুসলমানকেও তাদের কর্ম অনুযায়ী জাহান্নামের শাস্তি দেওয়া হবে, যদিও পরিণামের শাস্তি ভোগ করার পর তাদের জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। এর জবাবে কেউ কেউ বলেন, এই আয়াতে যেকোনো শাস্তি উদ্দেশ্য নয়। বরং সাবা সম্প্রদায়ের অনুরূপ ব্যাপক গজব-আযাব বুঝানো হয়েছে। এ

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

ধরনের আযাব-গজব বিশেষভাবে কাফেরদের জন্য নির্দিষ্ট। মুসলিমদের উপর এরূপ আযাব আসে না। হযরত হাসান বসরী রহ. বলেন,

صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ لَا يُعَاقَبُ بِمِثْلِ فِعْلِهٖ إِلَّا الْكَفُوْرُ

আল্লাহ তা'আলা সত্য বলেছেন, মন্দ কাজের যথাযোগ্য শাস্তি কাফের ছাড়া কাউকে দেওয়া হয় না। পক্ষান্তরে মুমিনকে তার গুনাহর ব্যাপারেও কিছু অবকাশ দেওয়া হয় সংশোধন হওয়ার জন্য।

কোন কোন তাফসীরবিদ বলেন, এই আয়াতের আক্ষরিক অর্থই উদ্দেশ্য। শাস্তি হিসেবে শাস্তি কেবল কাফেরদেরই দেওয়া হয়। মুসলমান পাপীকে যে শাস্তি দেওয়া হয়, তা কেবল বাহ্যিক দৃষ্টিতে শাস্তি হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে উদ্দেশ্য থাকে তাকে গুনাহ থেকে পবিত্র করা। স্বর্ণকে আগুনে পোড়ানোর উদ্দেশ্য হলো তার ময়লা ও খাদ দূর করা। কোন মুমিনকে তার পাপের কারণে দোযখে নিক্ষেপ করা হলে, এর উদ্দেশ্য হবে তার দেহের সেই অংশ জ্বালিয়ে দেওয়া, যা হারাম দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। পরবর্তীকালে সে যখন জান্নাতে যাওয়ার যোগ্য হবে, তখন তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। (রুহুল মা'আনী)

ঘটনা থেকে শিক্ষা

সাবা সম্প্রদায়ের শাস্তি সম্পর্কে কুরআনে কারীমে আরো ইরশাদ হয়েছে,

فَجَعَلْنَاهُمْ اَحَادِيْثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ○

আমি তাদেরকে কাহিনীর বিষয়ে পরিণত করলাম এবং সম্পূর্ণরূপে ছিন্নভিন্ন করে দিলাম। নিশ্চয় এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (সূরা সাবা, আয়াত:১৯)

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সাবাবাসীদের নাশুকরির কারণে তাদের সম্পূর্ণ ধ্বংস ও বিপর্যস্ত করে দেন। ফলে পৃথিবীর বুকে তাদের ভোগ-বিলাস

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

ও ঐশ্বর্যের কথা কাহিনী হিসেবেই রয়ে গেছে এবং তারা উপাখ্যানে পরিণত হয়েছে।

مَزَّقْنَاهُمْ শব্দটি تمزيق থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করা। অর্থাৎ মাআরিব শহরের কিছু অধিবাসী ধ্বংস হয়ে গিয়েছে এবং কিছু বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে গিয়েছে। অথচ তারা সকলে এক স্থানে সম্মিলিতভাবে আন্তরিকতা ও ভালোবাসার সাথে বসবাস করতো। আরবে তাদের ধ্বংস ও ছত্রভঙ্গ হওয়ার ঘটনা প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছিল। তাদের মতো কারো বিচ্ছিন্ন অবস্থা প্রত্যক্ষ করলে প্রবাদরূপে আরবরা বলত, 'তারা সাবা সম্প্রদায়ের ঐশ্বর্যে পালিত লোকদের মতো বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।'

কওমে সাবার ধ্বংসের ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের নসীহত হাসিল করা এবং সবধরনের পাপাচার ও নাফরমানী ছেড়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুম-আহকাম যথাযথভাবে পালন করা অপরিহার্য। তাহলে আল্লাহ আমাদের নিয়ামত বৃদ্ধি করবেন এবং আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতে অফুরন্ত সুখ-শান্তি দান করবেন।

আসহাবুল উখদুদের ঘটনা

وَ السَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ ۙ وَ الْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ ۙ وَ شَاهِدٍ وَّ مَشْهُوْدٍ ؕ قُتِلَ اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ ۙ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ ۙ اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ ۙ وَّ هُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ ؕ وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّاۤ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۙ الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ ۝

শপথ বুরুজ-বিশিষ্ট আকাশের, এবং সেই দিনের, যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। এবং যে উপস্থিত হয় তার এবং যার নিকট উপস্থিত হয় তার। ধ্বংস হয়েছে গর্তওয়ালারা, যে গর্ত বহু ইন্ধন বিশিষ্ট ছিল। যখন তারা সেখানে উপবিষ্ট ছিল এবং তারা মুমিনদের সাথে যা করছিল, তা নিরীক্ষণ করছিল। তারা মুমিনদের শাস্তি দিয়েছিল শুধু

TOP

এই কারণে যে, তারা সর্বময় প্রশংসার অধিকারী পরাক্রান্ত আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব যার মুঠোয় এবং আল্লাহ সমস্ত কিছু দেখছেন। নিশ্চয় যারা মুমিন পুরুষ ও নারীদের নিপীড়ন করেছে, অতঃপর তাওবা করেনি, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আযাব আর রয়েছে অগ্নির দহন শাস্তি। (সূরা বুরুজ, আয়াত:১-১০)

এই সূরার শানে নুযুল সম্বন্ধে তাফসীর গ্রন্থসমূহে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ আছে, যা মুফাসসির ও ঐতিহাসিকগণের নিকট ‘আসহাবে উখদুদের ঘটনা’ নামে পরিচিত। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ।

- أُخْدُوْد এর শাব্দিক অর্থ গর্ত বা পরিখা। যেহেতু আলোচ্য ঘটনায় কাফের বাদশা ও তার সভাসদরা গর্ত ও পরিখা খনন করে তাতে অগ্নি প্রজ্বলিত করে তৎকালীন আহলে কিতাব মুমিনদের ঐ লেলিহান অগ্নিকুন্ডে জীবন্ত দগ্ধ করে নির্মমভাবে শহীদ করেছে, এদিকে ইঙ্গিত করেই এই কাফেরদের ‘আসহাবে উখদুদ’ বলা হয়েছে।

তখন ইয়ামানের বাদশা ছিল ইউসুফ যু-নাওয়াস। সে ছিল কাফের। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মের পূর্বে সত্তর বছর ছিল তার শাসনকাল।

তার দরবারে এক জ্যোতিষী থাকতো। যখন সে বৃদ্ধ হয়ে গেল, তখন সে বাদশার কাছে আবেদন করলো, আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি। আমার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে। এজন্য আমার মন চাচ্ছে, আপনি আমাকে মেধাবী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন একটি ছেলে দিবেন। তাকে আমি আমার এই শাস্ত্র তথা জ্যোতিষবিদ্যা শিক্ষা দিয়ে আমার জীবদ্দশায়ই একজন বিজ্ঞ জ্যোতিষী হিসেবে গড়ে তুলে যাব।

এই প্রস্তাবমতে ঐ কাফের-বাদশা আবদুল্লাহ ইবনে তামির নামক একটি তুখোর মেধাবী ছেলেকে জ্যোতিষীর হাওলা করে দিল। সে তার কাছ থেকে জ্যোতিষবিদ্যার দীক্ষা নিতে শুরু করলো।

TOP

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

ছেলেটির বাড়ি ও গণকের বাড়ির মধ্যখানে একজন রাহেবের (খ্রিস্টান ধর্মযাজকের) খানকা ছিল। সেটা ছিল হযরত 'ঈসা 'আলাইহিস সালামের নবুওয়্যাতের যুগ। তার প্রদর্শিত দীন-ই সেসময় দীনে হক ছিল। ঐ রাহেব 'ঈসায়ী ধর্ম মতে একজন সাচ্চা মুমিন ও বুযুর্গ ছিলেন।

ছেলেটি একবার রাহেবের দরবারে গিয়ে তার কথা শুনে ও তার কাজ-কর্ম দেখে বেশ প্রভাবিত হলো এবং মাঝে মধ্যেই তার খানকায় আসা-যাওয়া করতে থাকলো। এমনকি এক পর্যায়ে সে গোপনে রাহেবের হাতে আল্লাহর দীন গ্রহণ করলো।

আল্লাহ তা'আলা তাকে মজবুত ঈমান দান করলেন। সে প্রতিদিন রাহেবের কাছে যাওয়া আসা করতে লাগলো। জ্যোতিষীর কাছে যাওয়ার সময় পথে রাহেবের কাছে কিছুক্ষণ সময় কাটাতো। ফলে জ্যোতিষীর কাছে পৌঁছতে দেরি হয়ে যেত। এ কারণে জ্যোতিষী তাকে শাসন করতো। ঠিক তেমনিভাবে গণকের কাছ থেকে বাড়িতে ফেরার সময়ও পথে রাহেবের মজলিসে কিছুক্ষণ কাটাতো। ফলে নিজ বাড়িতে পৌঁছতে দেরি হতো। এ জন্য বাড়ির লোকজনও তাকে মারধর করতো। কিন্তু সে এগুলোর কোন পরোয়া না করে রাহেবের মজলিসে যাওয়া-আসাসহ তার সংশ্রব বজায় রাখলো।

একদিন ছেলেটি দেখলো, রাস্তার মধ্যে একটি বাঘ শুয়ে আছে। ফলে লোকজনের যাতায়াত বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং জনসাধারণ বাঘের ভয়ে ভীত। ছেলেটি একখণ্ড পাথর হাতে নিয়ে দু'আ করলো, 'আয় আল্লাহ, যদি রাহেবের ধর্ম সঠিক হয়ে থাকে, তবে যেন আমার এই প্রস্তরখণ্ডের আঘাতে বাঘটি মরে যায়। পক্ষান্তরে গণক যদি সত্যপন্থী হয়ে থাকে, তবে যেন না মরে।' এই দু'আ করে সে বাঘটি লক্ষ্য করে একখণ্ড প্রস্তর নিক্ষেপ করলো। আল্লাহ তা'আলার কী কুদরত, প্রস্তরের আঘাত লাগামাত্র বাঘটি মরে গেল।

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

এই ঘটনার পর থেকে দেশময় এই আলোচনা শুরু হয়ে গেল, একটি বালক কোন গুপ্তবিদ্যা অর্জন করেছে, যার দ্বারা সে এত বড় বাঘ মেরে ফেলেছে।

এ খবর শুনে এক অন্ধ লোক বালকটির নিকট উপস্থিত হয়ে তার চক্ষু ভালো করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলো। বালক বললো, তুমি যদি দীনে হক কবুল করো, তবে তোমার চক্ষু ভালো হওয়ার জন্য দু'আ করতে পারি। অন্ধ রাজি হলো এবং উক্ত ছেলের দু'আয় সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিশক্তি লাভ করলো। সঙ্গে সঙ্গে সে দীনে হক গ্রহণ করে নিজেকে ধন্য করলো।

অত্যাচারী বাদশা ইউসুফ যু-নাওয়াসের কাছে এই খবর পৌঁছলে সে সেই রাহেব, বালক ও অন্ধ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিয়ে নিজ দরবারে হাজির করলো। জিজ্ঞাসাবাদে তারা সব খুলে বললেন। সব শুনে সে বুঝলো, এরা সবাই দীনে হক গ্রহণ করেছে। এরা যদি এভাবে ইসলামের প্রচার করতে থাকে, তা হলে দেশের সবাই তাদের ভক্ত হবে। তখন বাদশার বড়ত্ব খর্ব হবে। তাই সে আল্লাহর দীনের বিরুদ্ধাচরণে লেগে তাদের আল্লাহর দীন ত্যাগ করতে বললো।

তারা তার নির্দেশ সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করলেন। বাদশা সঙ্গে সঙ্গে রাহেব ও অন্ধকে হত্যা করলো। আর বালকটি সম্বন্ধে এই আদেশ দিল যে, তাকে যেন পাহাড়ের চূড়া থেকে নিচে ফেলে দিয়ে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির মাধ্যমে হত্যা করা হয়।

কিন্তু আল্লাহ তা'আলার কী অসীম কুদরত, ছেলেটিকে পাহাড়ে চড়ামাত্র তাতে কঠিন কম্পন শুরু হলো। ফলে যারা তাকে নিয়ে গেল, তারা সবাই পাহাড় থেকে পড়ে ধ্বংস হলো। আর ছেলেটি অক্ষত অবস্থায় সম্পূর্ণ সুস্থভাবে ফিরে এলো।

অতঃপর বাদশা তাকে সমুদ্রে ডুবিয়ে মারার জন্য আদেশ দিল। আল্লাহ তা'আলার দয়া ও রহমতে এবারও সে বেঁচে এলো। আর যারা তাকে

TOP
Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com App Store

ডুবিয়ে হত্যা করার জন্য গিয়েছিল, তারা সবাই জাহাজ ডুবে সমুদ্রে নিমজ্জিত হলো।

ইউসুফ যু-নাওয়াস সামান্য একটি বালককে বধ করতে বারবার ব্যর্থ হয়ে অত্যন্ত বিব্রতকর অবস্থায় পড়লো। তখন ছেলেটি বললো, হে বাদশা, আপনি এভাবে কখনোই আমার ব্যাপারে সফল হতে পারবেন না। তবে হ্যাঁ, আপনি আমার বলে দেয়া পন্থা এখতিয়ার করলে সফল হতে পারবেন। আমাকে হত্যা করতে চাইলে একটি বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। বাদশা ছেলেটির কাছে সেই পদ্ধতি জানতে চাইলো। সে বললো, আপনি শহরের সমস্ত জনগণকে একটি উঁচু স্থানে সমবেত করুন। যখন সকলে একত্র হবে, তখন আমাকে শূলিকাষ্ঠে চড়াবেন। অতঃপর আমার তীরদানি থেকে একটি তীর নিয়ে 'আল্লাহ তা'আলার নামে নিক্ষেপ করছি, যিনি এই বালকের রব' বলে আমার বুকে তীর নিক্ষেপ করবেন। তা হলেই আমি ইন্তেকাল করবো।

ইউসুফ যু-নাওয়াস বালকের কথা বাস্তবায়ন করে শহরের সমস্ত জনসাধারণকে সমবেত করলো। অতঃপর তাদের সামনে ছেলেটিকে শূলিতে চড়িয়ে তার তীরদানি থেকে একটি তীর নিয়ে 'আল্লাহ তা'আলার নামে নিক্ষেপ করছি, যিনি এই বালকের রব' বলে তীর নিক্ষেপ করলো। তখন বালকটি সেই তীরের আঘাতে শাহাদাত বরণ করলো।

এই অত্যাশ্চর্য দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে উপস্থিত জনসাধারণের মধ্যে ঈমানী চেতনা জাগ্রত হলো। সঙ্গে সঙ্গে তারা ঈমান এনে সমস্বরে বলে উঠলো,

اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

আমরা সকলেই জগতসমূহের রবের উপর ঈমান আনলাম।

তখন ইউসুফ যু-নাওয়াসের পরিষদবৃন্দ তাকে উদ্দেশ্য করে বললো, মহারাজ, আপনি যার আশঙ্কা করছিলেন শেষ পর্যন্ত তা-ই ঘটে গেল এবং প্রজারা মুসলমান হয়ে গেল!

তখন বাদশা অগ্নিশর্মা হয়ে রাজমহল থেকে বের হলো এবং নিজ বাহিনীকে হুকুম দিল, শহরের প্রত্যেক মহল্লা ও অলি-গলিতে পরিখা খনন করে তাতে ভয়ানক অগ্নিপ্রজ্বলিত করে মহল্লার লোকদের সেখানে একত্র করে তাদের মাঝে ঘোষণা করো, যারা ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ না করবে, তাদের এই জ্বলন্ত অগ্নিতে ফেলে দেওয়া হবে।

আল্লাহ তা'আলা এই মুমিনদের এমন দৃঢ়তা দান করেছিলেন যে, তারা সকলেই একযোগে ঈমান পরিত্যাগ না করার ঘোষণা দিয়ে দিলেন এবং খুশির সাথে নিজেদের জন্য অগ্নি-শাস্তি বরণ করে নিলেন।

তাদের কেবল আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান আনার কারণেই এই কঠিন আযাব দেওয়া হয়েছিল। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَمَا نَقَمُوۡا مِنۡهُمۡ اِلَّاۤ اَنۡ یُّؤۡمِنُوۡا بِاللّٰهِ الۡعَزِیۡزِ الۡحَمِیۡدِ ۙ

তারা মুমিনদের শাস্তি দিয়েছিল শুধু এই কারণে যে, তারা সর্বময় প্রশংসার অধিকারী পরাক্রান্ত আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। (সূরা বুরুজ, আয়াত:৮)

তখন স্বৈরশাসক ইউসুফ যু-নাওয়াস ও তার পরিষদবর্গ এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য আনন্দ-উল্লাসের সাথে উপভোগ করছিল। ইরশাদ হয়েছে,

اِذۡ هُمۡ عَلَیۡهَا قُعُوۡدٌ ۙ وَّ هُمۡ عَلٰی مَا یَفۡعَلُوۡنَ بِالۡمُؤۡمِنِیۡنَ شُهُوۡدٌ ؕ

যখন তারা সেখানে উপবিষ্ট ছিল এবং তারা মুমিনদের সাথে যা করছিল, তা নিরীক্ষণ করছিল। (সূরা বুরুজ, আয়াত:৬-৭)

ইতোমধ্যে একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটলো। প্রজ্বলিত অগ্নি-পরিখার কিনারায় একটি দুধের শিশুসহ এক মহিলাকে হাজির করা হলো। সে

তার বাচ্চার মুহাব্বতের কারণে আগুনে পড়তে ইতস্তত করছিল। সঙ্গে সঙ্গে সেই ছোট্ট শিশু বলে উঠলো, আম্মা, ধৈর্য ধরুন এবং নির্ভয়ে অগ্নি-পরিখায় ঝাঁপ দিন। কারণ, নিঃসন্দেহে আপনি হকের উপরে আছেন।

নিম্নবর্ণিত হাদীসে এ কথারই বর্ণনা রয়েছে, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লা রা. হযরত সুহাইব রা. থেকে দীর্ঘ এক হাদীস বর্ণনা করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, . . . তারপর অগ্নিপরিখার পাশে এমন একজন মহিলা উপস্থিত হলেন, যার সাথে তার ছোট বাচ্চা ছিল। তিনি যখন আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ার ইচ্ছা করলেন, তখন প্রখর অগ্নিতাপ অনুভব করতে লাগলেন, যার কারণে তিনি (তার বাচ্চার মুহাব্বতে) আগুনে পড়তে ইতস্তত করছিলেন। এই মুহূর্তে তার দুগ্ধপায়ী শিশু বলে উঠলো, আম্মা, আপনি আপনার কাজ করে যান। কারণ, আপনি হকের উপর আছেন। অতঃপর তিনি আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। (তিরমিযী)

এই অত্যাচারী শাসক যে মুমিনগণকে জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ করেছে, তাদের সংখ্যার ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনায় বার হাজারের কথা এসেছে। কোন কোন রেওয়ায়েতে এর চেয়েও অধিক সংখ্যার কথা উল্লেখ রয়েছে।

বিভিন্ন রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, যে সমস্ত মুমিনকে ইউসুফ যু-নাওয়াস ও তার পরিষদবর্গ অগ্নি-খন্দকে ফেলেছিল, আল্লাহ তা‘আলা তার কুদরতের মাধ্যমে তাদের অগ্নিদগ্ধ হওয়ার কষ্ট থেকে এভাবে হেফাজত করেছিলেন যে, আগুন স্পর্শ করার পূর্বেই তিনি তাদের প্রত্যেকের জান কবজ করে নিয়েছিলেন। ফলে আগুনে কেবল তাদের মৃত শরীরই বিদ্যমান ছিল এবং তাই দগ্ধ হয়েছিল।

পক্ষান্তরে সেই জালিম পাষন্ডদের এই পরিণতি হলো, ঈমানদার জনগণকে ঐ অগ্নি-খন্দকে ফেলে হত্যা করার পর আল্লাহ তা‘আলার কুদরতে এই আগুন পর্যায়ক্রমে উত্তপ্ত হয়ে এত পরিমাণে বিস্তৃত হলো,

তার লেলিহান শিখা সংশ্লিষ্ট গণ্ডি অতিক্রম করে গোটা শহরে ছড়িয়ে পড়লো এবং যারা মুসলিমদের অগ্নিদগ্ধ করে এই করুণ দৃশ্য তামাশা হিসেবে উপভোগ করছিল, তাদের সকলকে এই আগুন জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ভষ্ম করে দিল।

তবে খোদ ইউসুফ যু-নাওয়াস সেই আগুন থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে নিজেকে দরিয়ায় নিক্ষেপ করলো। তখন আল্লাহর হুকুমে সেখানেই সে নিমজ্জিত হয়ে ধ্বংস হয়ে গেল। (তাফসীরে মাযহারী)

পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে,

قُتِلَ اَصۡحٰبُ الۡاُخۡدُوۡدِ ۝ النَّارِ ذَاتِ الۡوَقُوۡدِ ۝

ধ্বংস হয়েছে গর্তওয়ালারা, যে গর্ত বহু ইন্ধন বিশিষ্ট ছিল। (সূরা বুরুজ, আয়াত:৪-৫)

এ হচ্ছে তাদের দুনিয়ার শাস্তি। আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী মর্মন্তুদ কঠিন আযাব। এ সম্পর্কে কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

اِنَّ الَّذِيۡنَ فَتَنُوا الۡمُؤۡمِنِيۡنَ وَالۡمُؤۡمِنٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَتُوۡبُوۡا فَلَهُمۡ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمۡ عَذَابُ الۡحَرِيۡقِ ۝

নিশ্চয় যারা মুমিন পুরুষ ও নারীদের নিপীড়ন করেছে, অতঃপর তাওবা করেনি, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আযাব আর রয়েছে অগ্নির দহন শাস্তি। (সূরা বুরুজ, আয়াত:১০)

উক্ত আয়াতে সেই পাপিষ্ঠদের শাস্তি প্রসঙ্গে দু'টি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

১. তাদের জন্য পরকালে জাহান্নামের আযাব রয়েছে।

২. তাদের জন্য দহন শাস্তি রয়েছে। এখানে দ্বিতীয়টি প্রথমটিরই বর্ণনা বা তাকিদ হতে পারে। অর্থাৎ জাহান্নামে গিয়ে তারা চিরকাল দহন-

যন্ত্রণা ভোগ করবে। অথবা দ্বিতীয়টি ভিন্ন আযাবও হতে পারে, যা তাদের উপর দুনিয়াতে আপতিত হয়েছিল।

কাফেরদের জন্য জাহান্নামের আগুন ও দহন-শাস্তির খবর দেওয়ার সাথে সাথে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন, ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا তারপর তাওবা করেনি অর্থাৎ এই আযাব তাদের উপর পতিত হবে, যারা এই দুষ্কর্মের কারণে অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করেনি। এতে প্রকারান্তরে চরম অপরাধীদেরও তাওবার দাওয়াত দেওয়া হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট তাবেয়ী হযরত হাসান বসরী রহ. বলেন, বাস্তবিকই আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও করুণার কোন সীমা নেই। তাই তো যেসব কাট্টা কাফের আল্লাহর খাস বান্দাদের জীবন্ত দগ্ধ করে তামাশা দেখেছে, আল্লাহ তা'আলা এত চরম অপরাধের পরেও তাদের তাওবার দাওয়াত দিচ্ছেন। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

আসহাবুল উখদুদের ঘটনা থেকে শিক্ষা

সূরা বুরুজের উল্লিখিত আয়াতসমূহ ও সংশ্লিষ্ট ঘটনা বিশ্ববাসীদের জন্য এক প্রকৃষ্ট শিক্ষা। এখানে একদিকে ঈমানদারদের নিজেদের ঈমানের উপর দৃঢ়ভাবে কায়েম থাকা এবং ঈমানের পথে আগত সকল বিপদ-মুসিবত অকাতরে সহ্য করার দৃষ্টান্ত রয়েছে, যার বিনিময়ে তারা দুনিয়াতেও আল্লাহ তা'আলার অপার করুণা ও রহমত লাভ করেছেন, আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার তথা চিরশান্তির জান্নাত। অপরদিকে বেদীন নাফরমানদের জুলুম-পাপাচারের পরিণতির দৃষ্টান্তও এখানে রয়েছে যে, আল্লাহর দীনের বিরোধিতা করার চরম শাস্তি তারা দুনিয়াতেও পেয়েছে। আর পরকালে তারা জাহান্নামের ভয়াবহ আযাব চিরকাল ভোগ করবে।

এসব ঘটনা থেকে শিক্ষালাভ করে আত্মসংশোধন করা এবং পরিপূর্ণ দীনদারি ও হেদায়েতের উপর কায়েম থাকা আমাদের কর্তব্য।

সমাপ্ত

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

হযরত মুহাম্মাদ صلى الله عليه وسلم

মুফতী মনসূরুল হক

মাকতাবাতুল মানসূর
www.darsemansoor.com
www.islamijindegi.com

সূচীপত্র

আসহাবে ফীলের ঘটনা
আল্লাহর ঘরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ভয়াবহ শাস্তি
হস্তিবাহিনীর উপর যেভাবে আযাব এলো
আসহাবে ফীলের ঘটনাস্থল
আসহাবে ফীলের ঘটনা থেকে শিক্ষা
ধনসম্পদের অপব্যবহার ও তার পরিণাম
আয়াতের শানে নুযুল হিসেবে প্রসিদ্ধ একটি অনির্ভরযোগ্য ঘটনা
প্রথম আলোচনা: সা‘লাবা রা. সংক্রান্ত রিওয়ায়েতের সনদ যাচাই
১. হযরত আবূ উমামা রা.
২. হযরত ইবনে আব্বাস রা.
৩. হযরত হাসান রা.
দ্বিতীয় আলোচনা: ঘটনাটির ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের মতামত
গাযওয়ায়ে বদর
গাযওয়ায়ে বদরের প্রেক্ষাপট
গাযওয়ায়ে আহযাব
রাসূলুল্লাহর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা: পরিখা খনন
পরিখা খননের সময় মুজিযার প্রকাশ
পরিখা তৈরি হয়ে গেল
মুসলিম বাহিনীর প্রস্তুতি
শত্রু বাহিনীর অবস্থান
শত্রুদের সাথে মুসলিম বাহিনীর মোকাবেলা
শত্রুদের ভিন্ন পথ অবলম্বন
পরিবর্তিত পরিস্থিতি: মুসলিম বাহিনী কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন
মুনাফিকদের প্রতারণা ও পলায়ন
গাযওয়ায়ে আহযাবের পরবর্তী ঘটনা
মদীনা মুনাওয়ারা অবরোধ
কাফেরদের সম্মিলিত আক্রমণ
হযরত সাফিয়া রা. এর বাহাদুরি
কাফেরদের আত্মকলহ

গায়েবি মদদ
সংবাদ সংগ্রহে হযরত হুজায়ফা রা.
গাযওয়ায়ে খায়বার
খায়বার যুদ্ধের প্রেক্ষাপট
খায়বার যুদ্ধে বিজয়ের সুসংবাদ
খায়বার যুদ্ধের সময়কাল
খায়বার যুদ্ধের সৈন্যদল
নবীজীর স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ
জিহাদের পথে রওয়ানা এবং শাহাদাতের সুসংবাদ
খায়বারের উপকণ্ঠে
নবীজীর বাহন
জনপদে প্রবেশের আদব শিক্ষাদান
আক্রমণের সূচনা এবং প্রিয়নবীর যবানে বিজয়ের সুসংবাদ
খায়বারের দুর্গসমূহ
নাইম দুর্গ বিজয়
কামুস দুর্গ বিজয়
মারহাবের সাথে যুদ্ধ
আলী রা.-এর বীরত্ব সংক্রান্ত একটি অগ্রহণযোগ্য বর্ণনা
উম্মুল মুমিনীন হযরত সাফিয়া রা. প্রসঙ্গ
সা'দ বিন মুয়ায দুর্গ বিজয়
কুল্লা দুর্গ বিজয়
কাফের যখন দীনের সৈনিক
ওয়াতিহ ও সুলালিম দুর্গ বিজয়
খায়বার বিজয়ের পর মুসলিমদের সচ্ছলতা লাভ
আনসারদের প্রদত্ত বাগান ও শষ্যক্ষেত ফেরত প্রদান
গনিমতের সম্পদ বণ্টন
বণ্টন পদ্ধতি
‘ফাদাক’ বিজয়
‘ওয়াদিয়ে কুরা’ বিজয়
অন্যের সম্পদে খেয়ানতের মন্দ পরিণতি

ইহুদী ষড়যন্ত্রের আরেক পর্ব
খায়বার যুদ্ধের কয়েকটি শিক্ষণীয় ঘটনা শহীদ নাকি জাহান্নামী
জান্নাতের ধনভাণ্ডার
ঈমানের মূল্য
খায়বার যুদ্ধে নাযিলকৃত হুকুম-আহকাম
ঐতিহাসিক মক্কা বিজয়
মক্কা বিজয়ের প্রেক্ষাপট
পরাজয় যেভাবে বিজয়ে রূপান্তরিত হলো
১. নবশক্তির উত্থান
২. যুদ্ধ বিরতী
৩. বিশ্ব দরবারে ইসলাম
৪. মক্কার দূর্বল মুসলমানদের ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভ
৫. ইসলামের সৌন্দর্যের প্রচার-প্রসার
৬. খালেদ ইবনে ওলীদ রা. এর ইসলাম গ্রহণ
মক্কা বিজয়ের বাহ্যিক প্রেক্ষাপট
কুরাইশ কর্তৃক হুদাইবিয়া সন্ধি চুক্তি ভঙ্গ
নবীজীর দরবারে বনু খুজাআর ফরিয়াদ
কুরাইশদের সন্ধি নবায়ন প্রচেষ্টা
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালোবাসা !
বিজয়াভিযানের প্রস্তুতি
হাতেব ইবনে আবী বালতাআ রা. -এর চিঠি
নবীজীর কথার সত্যতার উপর সাহাবায়ে কেরামের ঈমান!
বিজয়ের পথে রওনা
রোযা ভেঙে ফেলা...
ক্ষমা ও উদারতার নবী!
মক্কার উপকণ্ঠে
ক্ষমা মহানুভবতার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত!
আবু সুফিয়ানের ইসলাম গ্রহণ
আবু সুফিয়ানের মুসলিম বাহিনী পর্যবেক্ষণ
বিনয় ও নম্রতার আরো একটি দৃষ্টান্ত!

আবু সুফিয়ানের সতর্কীকরণ
মক্কায় প্রবেশ
ফাতহে মক্কার সফরে নবীজীর অবস্থানস্থল
খান্দামা লড়াই!
‘বিনয়ী’ বেশে ‘বিজয়ী’র পদার্পণ!
হাজরে আসওয়াদ চুম্বন ও কাবা ঘরের তাওয়াফ
কাবার আশেপাশের মূর্তি অপসারণ
বাইতুল্লার চাবি গ্রহণ ও তাতে প্রবেশ
কাবা অভ্যন্তরের মূর্তি অপসারণ
একটি বানোয়াট বর্ণনা
‘মতন’ মুনকার হওয়া প্রসঙ্গ
কাবার অভ্যন্তরে নবীজীর নামায আদায় ও তাকবীর প্রদান
ঐহিহাসিক খুতবা : ক্ষমা ও উদারতার সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত
হত্যার দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত কতিপয় কাফের
কাবা ঘরের চাবি হস্তান্তর
মক্কার ইথারে আবারো তাওহীদের বুলন্দ আওয়াজ
মক্কাবাসীর ইসলাম গ্রহণ এবং নবীজীর হাতে বাই‘আত
উম্মে হানী রা. এর ঘরে নামায আদায়
দ্বিতীয় দিনের খুতবা
মক্কার অশেপাশের মূর্তিভাঙা
প্রিয় কে পেয়েও হারানোর শঙ্কা!
কতদিন ছিলেন মক্কায়
মক্কা বিজয় কি সন্ধিমূলক না কি বলপূর্বক?
মক্কা বিজয়ের ঘটনা হতে আহরিত বিধি-বিধান

www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com

باسمہ تعالیٰ

আসহাবে ফীলের ঘটনা:
আল্লাহর ঘরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ভয়াবহ শাস্তি

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা ইরশাদ করেন,

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحَابِ الْفِيْلِ ○ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ ○ وَاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ○ تَرْمِيْهِم بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ○ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ○

আপনি কি দেখেননি, আপনার পালনকর্তা হস্তিবাহিনীর সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? তিনি কি তাদের চক্রান্ত সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ করে দেননি? আর তিনি তাদের উপর পাঠালেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি, যারা তাদের উপর কংকর জাতীয় পাথর নিক্ষেপ করছিল। ফলে আল্লাহ তাদের ভক্ষিত ভূষিসদৃশ করে দেন। (সূরা ফীল, আয়াত:১-৫)

এই সূরায় আসহাবে ফীল বা আবরাহার হস্তি বাহিনীর ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। তারা কাবা ঘর ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে হস্তি বাহিনী নিয়ে মক্কা মুকাররমায় অভিযান পরিচালনা করে ইয়ামান থেকে মিনা পর্যন্ত পৌঁছে ছিল। আল্লাহ তা‘আলা নগণ্য ও ক্ষুদ্র পাখিদের মাধ্যমে তাদের বাহিনী নিশ্চিহ্ন করে তাদের কুমতলব ধুলায় মিশিয়ে দেন।

খাতামুল আম্বিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের বছর মক্কা মুকাররমার অদূরে এই ঘটনা ঘটেছিল। বেশ কিছু রেওয়ায়েত দ্বারা এটা প্রমাণিত এবং এটাই প্রসিদ্ধ বর্ণনা। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

হাদীস বিশারদগণ এ ঘটনাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের একপ্রকার মুজিযারূপে আখ্যায়িত করেছেন। মুজিযা বলতে সাধারণত এমন কোন অলৌকিক ঘটনাকে বুঝানো হয় যেটা নবুওয়্যাত প্রাপ্তির পর নবীগণের দাবিকে সত্য প্রমাণিত করার জন্য আল্লাহ তা‘আলা প্রকাশ করে থাকেন। তবে আম্বিয়া আলাইহিস

GET ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

সালামের নবুওয়্যাত দাবির পূর্বে বরং তাঁদের জন্মেরও পূর্বে আল্লাহ তা'আলা মাঝে মধ্যে পৃথিবীর বুকে এমন কিছু ঘটনা ও নিদর্শন প্রকাশ করেন, যা অলৌকিকতায় মুজিযার অনুরূপই হয়ে থাকে। এধরনের নিদর্শনকে হাদীসবিদগণের পরিভাষায় ইরহাসাত (اِرْهَاصَاتٌ) বলা হয়।

اِرْهَاصَاتٌ এর শব্দ رَهْصٌ (রহসুন) অর্থ ভিত্তি ও ভূমিকা। এসব নিদর্শন নবীর নবুওয়্যাত প্রকাশের ভিত্তি ও ভূমিকা হিসেবে সংঘটিত হয় বিধায় এগুলোকে 'ইরহাসাত' বলা হয়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যাত এমনকি জন্মেরও পূর্বে এ ধরনের কয়েকটি ইরহাসাত প্রকাশ পেয়েছে। উল্লিখিত সূরা ফীলে বর্ণিত হস্তি বাহিনীকে কুদরতী গজব দ্বারা প্রতিহত করার নিদর্শন এ সবের অন্যতম।

আসহাবে ফীল-এর ঘটনা

হাদীস ও ইতিহাসশাস্ত্রের ইমাম আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. বর্ণনা করেন, ইয়ামানের উপর হিমইয়ারী শাসকদের কর্তৃত্ব ছিল, যারা আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করতো। তাদের প্রধান বাদশা যু-নাওয়াস তৎকালীন আহলে হক তথা 'ঈসা 'আলাইহিস সালামের দীনের অনুসারী তাওহীদপন্থীদের উপর খুব জুলুম করেছিল। সে বিশাল আকারে এক গর্ত খনন করে তাতে অগ্নি প্রজ্বলিত করে এবং যে সমস্ত দীনদার তাওহীদপন্থী মূর্তিপূজা ছেড়ে এক আল্লাহর ইবাদত করতেন, তাদের সকলকে উক্ত প্রজ্বলিত অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করে জ্বালিয়ে দেয়। যাদের সংখ্যা বিশ হাজারের কাছাকাছি ছিল। এটা ঐ অগ্নিকুন্ডের ঘটনা, যা 'আসহাবে উখদুদ'- এর আলোচনায় সূরা বুরুজে উল্লেখ হয়েছে।

এদের মধ্য থেকে দুই ব্যক্তি যে কোনো উপায়ে তার কবল থেকে উদ্ধার পেয়ে ছুটে এসে পারস্য-সম্রাটের কাছে ফরিয়াদ করে, হিমইয়ারী শাসনকর্তা দীনদার তাওহিদপন্থীদের উপর এরূপ অত্যাচার চালাচ্ছে। আপনি তার প্রতিশোধ নিন।

TOP

তখন পারস্য-সম্রাট ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের দীনের অনুসারী হাবশার শাসনকর্তার কাছে চিঠি লিখলেন, আপনি এই জুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণ করুন। তিনি এই নির্দেশ পেয়ে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী দুই কমান্ডার তথা আরবাত ও আবরাহার নেতৃত্বে ইয়ামানের ঐ বাদশার মোকাবেলা করার জন্য প্রেরণ করেন। উক্ত সেনাবাহিনী তার দেশের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং গোটা ইয়ামানকে হিমইয়ার সম্প্রদায়ের কবজা থেকে স্বাধীন করে।

তখন হিমইয়ার শাসনকর্তা যু-নাওয়াস পালিয়ে যায় এবং এক পর্যায়ে নদীতে ডুবে মারা যায়। এভাবে আবরাহার মাধ্যমে ইয়ামান অঞ্চল হাবশার শাসনকর্তার দখলে চলে আসে।

পরবর্তীকালে আরবাত ও আবরাহার মধ্যে লড়াই হয়। তখন আরবাত নিহত হয় এবং আবরাহা জয়ী হয়। এতে আবরাহা ইয়ামানের উপর এককভাবে দখলদারিত্ব কায়েম করে।

আবরাহার ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের বক্তব্য হলো, সে শাহী গোত্রের ছিল। তার নাম ছিল আবরাহা। কিন্তু যেহেতু তার নাক কাটা ছিল, তাই আরবরা তাকে ابرهة الاشرم (আবরাহা আলআশরাম) বলতো। আরবিতে اشرم শব্দের অর্থ নাক কাটা।

কারো কারো মতে, আবরাহা ৫২৫ খ্রিস্টাব্দে রাজত্ব শুরু করে। আর কোন কোন ঐতিহাসিক ৫৪৩ খ্রিস্টাব্দের কথা উল্লেখ করেছেন। ‘আরদুল কুরআন’ প্রণেতা দ্বিতীয় মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

আবরাহা কট্টর খ্রিস্টান ছিল, যার কারণে সে গোটা সাম্রাজ্যে ঈসায়ী মুবাল্লিগ নিযুক্ত করেছিল এবং শহরে-বন্দরে বড় বড় গির্জা নির্মাণ করেছিল। শেষ পর্যন্ত আবরাহা ইচ্ছা করলো, ইয়ামানে এমন একটি শানদার গির্জা নির্মাণ করবে, যার কোন নযীর পৃথিবীর বুকে থাকবে না। এর দ্বারা তার এই উদ্দেশ্য ছিল যে, ইয়ামানসহ সারা বিশ্বে যে সমস্ত আরব-অনারব মক্কা মুকাররমায় উপস্থিত হয়ে বায়তুল্লাহ শরীফ

তাওয়াফ করে, তারা যেন এই গির্জার শান-শওকতে প্রভাবিত হয়ে কাবার পরিবর্তে এই গির্জায় আগমন করে।

এই খেয়ালে সে একটি সুউচ্চ আলীশান গির্জা নির্মাণ করলো, তার চূড়ায় দাঁড়ালে নিচের মানুষজন দেখা যেত না। সম্পূর্ণ গির্জাটি সে সোনা-রুপা, হীরা, মণি-মুক্তা ও হাতির দাঁত দিয়ে নকশা করে সাজিয়েছিল।

সুহায়লী রহ. বর্ণনা করেন, এই গির্জা নির্মাণের ক্ষেত্রে আবরাহা ইয়ামানের অধিবাসীদের উপর খুব অত্যাচার করেছিল। সে সেখানকার অধিবাসীদের জোরপূর্বক শ্রমিক বানিয়েছিল এবং রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে এর পিছনে অঢেল সম্পদ ব্যয় করেছিল।

গির্জা-নির্মাণ সমাপ্ত করার পর আবরাহা হাবশার সম্রাট নাজাশীর কাছে এই মর্মে পত্র প্রেরণ করলো, আমি ইয়ামানের রাজধানী সানআয় আপনার জন্য 'আলকালিস' নামক এমন এক নযীরবিহীন গির্জা নির্মাণ করেছি, বিগত ইতিহাস যার কোন দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে পারেনি। এখন আমার আকাঙ্ক্ষা হলো গোটা বিশ্বের যে সকল আরব-অনারব মক্কা মুআজ্জমায় হজ্জ পালন করার জন্য একত্র হয়, তাদের সকলের অন্তরাত্মা এই গির্জার দিকে ফিরিয়ে দিব, আর এখন থেকে এটাই হবে তাদের সবার হজ্জব্রত পালন করার স্থান।

সমস্ত আহলে আরব তথা ধর্ম-বর্ণ-জাতি-গোষ্ঠী নির্বিশেষ সকলেই পবিত্র কাবার খুব সম্মান ও শ্রদ্ধা করতো এবং প্রত্যেকেই তাদের নিজ নিজ আকীদা-বিশ্বাস অনুযায়ী বায়তুল্লাহর হজ্জ ও যিয়ারত করা একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত মনে করতো। এ জন্যই আহলে আরবরা যখন আবরাহার এই উদ্দেশ্যের কথা জানতে পারলো, তখন আদনান, কাহতান ও কুরাইশ গোত্রের লোকেরা রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলো। এমনকি এদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি রাতের আঁধারে ঐ গির্জায় প্রবেশ করে তাতে মলমূত্র ত্যাগ করে তা অপবিত্র করে দিল। কোন কোন বর্ণনামতে, মুসাফিরদের একটি দল নিজেদের প্রয়োজনে উক্ত গির্জার

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

পাশে আগুন জ্বালালে তা থেকে ঐ গির্জায় আগুন ধরে যায় এবং তার অনেক ক্ষয়-ক্ষতি হয়।

আবরাহা যখন জানতে পারলো, কোন আরবীয় লোকের দ্বারা এ কাজ হয়েছে, তখন সে শপথ করলো, আমি তাদের কাবাগৃহের ইট একটা একটা করে খুলে ফেলবো এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তা না করতে পারবো, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি শান্ত হবো না। এরই ভিত্তিতে আবরাহা বায়তুল্লাহ অভিমুখে রওয়ানার প্রস্তুতি শুরু করলো এবং এই মর্মে বাদশা নাজাশীর কাছে অনুমতি চাইলো। নাজাশী তার 'মাহমুদ' নামক বিশেষ হাতিটি আবরাহার জন্য প্রেরণ করলো, যাতে করে সে সওয়ার হয়ে কাবা শরীফে আক্রমণ করতে পারে।

কোন কোন বর্ণনামতে, এটা খুব বড় ও শক্তিশালী হাতি ছিল, তৎকালীন সময়ে যার কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যেত না। এর সাথে সাথে হাবশা সম্রাট অন্যান্য সেনা সদস্যের জন্য আরও আটটি হাতি প্রেরণ করেছিল। সে এই উদ্দেশ্যে এসব হাতি প্রেরণ করেছিল যে, বায়তুল্লাহ শরীফ ধ্বংস করার ক্ষেত্রে এগুলো ব্যবহার করে যেন সহজেই কার্যসিদ্ধি করা যায়। সে ভাবলো, বায়তুল্লাহর খাম্বাগুলো লোহার শক্ত শিকল দিয়ে আটকিয়ে ঐ শিকলগুলো হাতির গলায় বেঁধে হাতি হাঁকানো হলে, হাতিগুলোর টানের তোড়ে সম্পূর্ণ বায়তুল্লাহ সাথে সাথে ভেঙ্গে পড়বে। (নাউযুবিল্লাহ)।

আরবরা যখন দুর্ধর্ষ আবরাহার এ কাবা আক্রমণের কথা শুনতে পেলো, তখন তারা সকলেই তার মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করলো। সর্বপ্রথম যু-নাযার নামক আরব-বংশোদ্ভূত এক ইয়ামানী সরদার ইয়ামান থেকে বের হয়ে আরবের বিভিন্ন গোত্রের কাছে এই সংবাদ দিয়ে দূত প্রেরণ করলেন যে, আমি আবরাহার মোকাবেলা করতে চাই। সুতরাং আপনাদের উচিত হলো এই সৎকাজে আমাকে সহযোগিতা করা। এই বলে তিনি আরবদের একটি দলসহ আগে বেড়ে

আবরাহা বাহিনীর মোকাবেলায় যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। কিন্তু তাতে তিনি পরাজয় বরণ করলেন এবং গ্রেফতার হলেন।

আবরাহা পথ অতিক্রম করে যখন 'খাসআম' গোত্রের এলাকায় পৌঁছালো তখন ঐ গোত্রের সরদার নুফায়েল ইবনে হাবিব নিজ গোত্রের লোকজন নিয়ে আবরাহা-বাহিনীর মোকাবেলা করলো। কিন্তু সেও পরাজিত হলো এবং গ্রেফতার হলো। তারপর সে প্রাণ বাঁচানোর জন্য আবরাহার পথপ্রদর্শকের দায়িত্ব গ্রহণ করলো।

অতঃপর আবরাহা বাহিনী তায়েফের নিকটে পৌঁছালো। সেখানকার অধিবাসী সাকিফ গোত্র পূর্ব থেকেই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাথে লড়াইয়ে আবরাহা বাহিনীর বিজয়ের কথা শুনেছে। তাই এত বড় শক্তির মোকাবেলা করতে পারবে না মনে করে তাদের সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত না হয়ে নিজেদের সরদার মাসউদ ইবনে মুআত্তাবকে একটি প্রতিনিধিদলসহ আবরাহার সাথে সাক্ষাত করতে প্রেরণ করে। সে আবরাহার সাথে সাক্ষাত করে বললো, আপনার সাথে আমাদের কোন শত্রুতা নেই। সেজন্য আমাদের এ বিশ্বাস আছে, আপনি আমাদের উপাস্য 'লাত'- এর মন্দিরের কোন ক্ষয়-ক্ষতি করবেন না। বিনিময়ে আমরা আপনার সহযোগিতা ও পথপ্রদর্শনের জন্য আমাদের এক সরদার আবু রিগালকে প্রেরণ করছি, তিনি আপনাকে মক্কা পর্যন্ত পৌঁছে দিবেন। আবরাহা এই প্রস্তাব গ্রহণ করে আবু রিগালকে সাথে নিয়ে মক্কার দিকে অগ্রসর হলো।

পথিমধ্যে 'মাগমাস' নামক উপত্যকায় আবু রিগাল মারা গেলো। বর্ণিত আছে, আবরাহাকে পথ দেখানো ছিল আবু রিগালের বিশ্বাস ঘাতকতামূলক অপরাধ। তাই তার মৃত্যুর পর সে যুগে আরবের লোকেরা দীর্ঘদিন পর্যন্ত তার কবরের উপর পাথর নিক্ষেপ করে।

এই 'মাগমাস' নামক স্থানে মক্কার কুরাইশ ও অন্যান্য গোত্রের ভেড়া-বকরি ও উটের চারণভূমি ছিল। আবরাহার সৈন্যবাহিনী এখানে পৌঁছে সর্বপ্রথম এসব পশুপালের উপর আক্রমণ করে তা থেকে অনেক ভেড়া-

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

বকরি ও উট লুট করে নিয়ে গেল। এ গুলোর মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানিত পিতামহ কুরাইশ-নেতা আবদুল মুত্তালিবেরও দুইশ উট ছিল।

অতঃপর এই স্থানে অবস্থান নিয়ে আবরাহা তার হানাতা হামিরী নামক দূতকে মক্কা মুকাররমায় প্রেরণ করলো, যেন সে মক্কায় গিয়ে কুরাইশ সরদারের নিকট এই পয়গাম পৌঁছায় যে, আমরা তোমাদের সাথে লড়াই করতে আসিনি। বরং কাবাঘর বিধ্বস্ত করাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। সুতরাং এ ব্যাপারে যদি তোমরা আমাদের বাধা না দাও, তা হলে আমরা তোমাদের কোন ক্ষতি সাধন করবো না।

আবরাহার পয়গাম নিয়ে হানাতা হামিরী যখন মক্কা মুয়াজ্জমায় প্রবেশ করলো, তখন সকলেই আবদুল মুত্তালিব-এর দিকে ইঙ্গিত করে বললো, ইনিই হলেন মক্কার প্রধান সরদার। তখন হানাতা আবদুল মুত্তালিব-এর সাথে সাক্ষাত করে আবরাহার উক্ত পয়গাম পৌঁছালো।

ইবনে ইসহাকের বর্ণনা অনুযায়ী, আবদুল মুত্তালিব জবাব দিলেন, আমরা কখনোই আবরাহার সাথে লড়াই করতে চাই না। আর না আমাদের তার সাথে লড়াই করার মতো শক্তি আছে। তবে হ্যাঁ, আমি নির্দ্বিধায় এতটুকু বলতে পারি, কাবা আল্লাহর ঘর, যা তার খলীল ইবরাহীম আলাইহিস সালাম নির্মাণ করেছেন। তিনি নিজেই এর হেফাজত করবেন। আর যে আল্লাহর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে, সে দেখতে পাবে, আল্লাহ তার সাথে কিরূপ আচরণ করেন।

অতঃপর হানাতা আবদুল মুত্তালিবের কাছে প্রস্তাব পেশ করলো, আপনি আমার সাথে চলুন। আমি আপনাকে আবরাহার সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিব। তিনি এই প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে আবরাহার সাথে দেখা করতে গেলেন।

আবদুল মুত্তালিব অতিশয় সুশ্রী, বলিষ্ঠ ও ব্যক্তিত্ববান লোক ছিলেন। আবরাহা তাকে দেখে খুবই প্রভাবিত হলো এবং নিজের সিংহাসন

থেকে উঠে এসে তার পাশে বসলো। অতঃপর আবরাহা জিজ্ঞেস করলো, আপনি কী উদ্দেশ্যে এসেছেন? তিনি বললেন, আমার প্রয়োজন শুধু এতটুকু যে, আমার যে সমস্ত উট লুণ্ঠন করে আনা হয়েছে, সেগুলো ফেরত দেওয়া হোক। আবরাহা বললো, আমি আপনাকে দেখে খুবই উচ্চ মনের অধিকারী ও বিচক্ষণ নেতা মনে করেছিলাম। কিন্তু আপনার এই কথার দ্বারা আমার সেই ধারণার পরিবর্তন ঘটলো। কেননা, আপনি কেবল আপনার দুইশ উট ফেরত নেওয়ার ব্যাপারেই আমার সাথে কথা বললেন, অথচ আপনি জানেন যে, আমি আপনার পিতৃধর্মের কেন্দ্রস্থল কাবাঘর ধ্বংস করার জন্য মক্কায় এসেছি। কিন্তু আপনি সে ব্যাপারে কোন কথাই বললেন না। আবদুল মুত্তালিব জবাব দিলেন, এই উটগুলোর মালিক আমি, তাই সে গুলোর ব্যাপারে আমাকেই চিন্তা করতে হবে। আর বায়তুল্লাহর ব্যাপারে কথা হচ্ছে, তারও একজন মহান মালিক আছেন। তিনি নিজেই এর হেফাজত করবেন।

তখন আবরাহা বললো, আপনার প্রভু তাকে আমার হাত থেকে রক্ষা করতে পারবেন না। তা শুনে আব্দুল মুত্তালিব বললেন, আমার বলার দরকার বললাম, এবার আপনার ইচ্ছা। আপনি যা চান, করতে পারেন।

কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, আবদুল মুত্তালিবের সাথে আরো কয়েকজন কুরাইশ সরদার আবরাহার সাথে সাক্ষাত করতে গিয়েছিলেন এবং তাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, আপনি যদি বায়তুল্লাহর উপর হস্তক্ষেপ না করে ফিরে যান, তবে আমরা প্রতি বছর আমাদের উৎপাদিত শস্যের এক-তৃতীয়াংশ আপনাকে কর হিসেবে প্রদান করবো। কিন্তু আবরাহা এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলো।

আলোচনার পরে আবরাহা আবদুল মুত্তালিব-এর উটগুলো ফিরিয়ে দিল। তিনি তার উট নিয়ে চলে এলেন।

অতঃপর আবদুল মুত্তালিব কুরাইশদের বিশাল একদল সাথে নিয়ে বায়তুল্লাহ শরীফের দরজার কড়া ধরে সকলে মিলে আল্লাহর দরবারে দু'আ করতে লাগলেন, আয় আল্লাহ, আবরাহার এত বড় শক্তিশালী বাহিনীর মোকাবেলা করার সামর্থ আমাদের নেই। তাই আপনি নিজেই আপনার ঘরের হেফাজত করার ব্যবস্থা করুন।

খুব কাকুতি-মিনতির সাথে দু'আ করার পর আবদুল মুত্তালিব মক্কা মুকাররমার লোকদের নিয়ে আশপাশের পর্বতমালায় আশ্রয় গ্রহণ করলেন। কারণ, তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আবরাহার সৈন্যবাহিনীর উপর আল্লাহর গজব নাযিল হওয়া অবধারিত। এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই আবদুল মুত্তালিব আবরাহার কাছে শুধু তার উট ফেরত চেয়েছিলেন। তখন বায়তুল্লাহ সম্পর্কে আলোচনা করা এ জন্য পছন্দ করেননি যে, একে তো তাদের মোকাবেলা করার মতো শক্তি-সামর্থ ছিল না, অপরদিকে এই বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর রহম করে স্বীয় কুদরতে কাবার দুশমনদের নাস্তানাবুদ করে দিবেন।

পরের দিন সকালে আবরাহা তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করার জন্য অগ্রসর হলো। সে তার 'মাহমুদ' নামীয় হাতিটি সামনে চালানোর জন্য প্রস্তুত করলো। তখন নুফায়েল ইবনে হাবিব, যাকে আবরাহা রাস্তা থেকে গ্রেফতার করে নিয়ে এসেছিল, সে এই সময় সামনে অগ্রসর হয়ে উক্ত হাতির কান ধরে বললো, তুমি যেখান থেকে এসেছো, সেখানেই সহীহ-সালামতে ফিরে যাও। কেননা, তুমি আল্লাহ তা'আলার নিরাপদ শহরে (بَلَد اَمِيْن) অবস্থান করছো। এই বলে সে হাতির কান ছেড়ে দিল। এটা শোনামাত্র উক্ত হাতি বসে পড়লো।

হাতির মাহুতরা অনেক চেষ্টা করে তাকে উঠিয়ে সামনে অগ্রসর করাতে চাইলো। কিন্তু কি আশ্চর্য, সে উঠলো না। এমনকি হাতিটিকে খুব প্রহার হলো, বড় বড় চাবুক দিয়ে আঘাত করা হলো এবং আঘাত করতে করতে তাকে আহত করা হলো। আবার হস্তিটির নাকে লোহার

TOP

আংটা লাগিয়ে তাকে উঠানোর চেষ্টা করা হলো। কিন্তু এতো কিছু সত্ত্বেও সে এক বিন্দুও সামনে বাড়লো না।

আরো আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, সেই হাতিটি যখন বিপরীত দিকে অর্থাৎ উত্তর, দক্ষিণ বা পূর্ব দিকে চালানোর চেষ্টা করা হতো, তখন সে দৌড় শুরু করতো। পক্ষান্তরে মক্কার দিকে ফিরিয়ে চালানোর চেষ্টা করা হলে, সাথে সাথে বসে পড়তো। তখন কোনক্রমেই সম্মুখের দিকে চালানো সম্ভব হতো না।

হস্তিবাহিনীর উপর যেভাবে আযাব এলো

এভাবে কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর হঠাৎ সমুদ্রের দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ে এলো। প্রত্যেকটি পাখির মুখে একটি ও দুই পায়ে দুটি করে পাথর ছিল।

ওয়াকিদী রহ. বর্ণনা করেন, পাখিগুলো এত আশ্চর্য ধরনের ছিল, ইতোপূর্বে কখনোই ঐ ধরনের পাখি দেখা যায়নি। সেগুলো আকৃতিতে কবুতরের চেয়ে একটু ছোট, লাল পাঞ্জাযুক্ত ছিল। এদের প্রত্যেক পাঞ্জা ও মুখে একটি করে কাঁকর-পাথর ছিল।

পাখিগুলো হঠাৎ করে এসে আবরাহার সৈন্যদের মাথার উপর শূন্যে অবস্থান গ্রহণ করলো এবং গোটা বাহিনীর উপর পাথরকুচির বৃষ্টি বর্ষণ শুরু করলো। এই কংকর যার শরীরে পড়লো, সাথে সাথে তার শরীর বিগলিত হয়ে মাটিতে প্রবিষ্ট হয়ে গেল।

এই ভয়ানক শাস্তি দেখে সমস্ত হাতি দৌড়ে পালিয়ে গেল। কেবল একটি হাতি সেখানে থেকে গিয়েছিল। সেটাও কংকরের আঘাতে ধ্বংস হয়ে গেল।

সকল সেনাসদস্য ঐ স্থানে ধ্বংস হয়নি, বরং তাদের অনেকে দৌড়ে পালাতে চেষ্টা করলে, রাস্তায়ই মরতে থাকে এবং জমিনে লুটিয়ে পড়তে থাকে।

আবরাহা বাহিনীর ধ্বংসের বিবরণ রেওয়ায়েতে এভাবে এসেছে,

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ : لَمَّا اَرَادَ اللهُ اَنْ يَّهْلِكَ اَصْحَابَ الْفِيْلِ بَعَثَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اُنْشِئَتْ مِنَ الْبَحْرِ اَمْثَالَ الْخَطَاطِيْفِ كُلُّ طَيْرٍ مِّنْهَا يَحْمِلُ ثَلَاثَةَ اَحْجَارٍ مُجَزَّعَةً حَجَرَيْنِ فِىْ رِجْلَيْهِ وَحَجَرًا فِىْ مِنْقَارِه قَالَ فَجَاءَتْ حَتّٰى صَفَّتْ عَلٰى رُؤُوْسِهِمْ ثُمَّ صَاحَتْ وَاَلْقَتْ مَافِىْ اَرْجُلِهَا وَمَنَاقِيْرِهَا فَمَا يَقَعُ حَجَرٌ عَلٰى رَاسِ رَجُلٍ اِلَّا خَرَجَ مِنْ دُبُرِه وَلَا يعق عَلٰى شَىْءٍ مِّنْ جَسَدِه اِلَّا خَرَجَ مِنَ الْجَانِبِ الْاٰخَرِ وَبَعَثَ اللهُ رِيْحًا شَدِيْدَةً فَضَرَبَتِ الْحِجَارَةَ فَزَادَهَا شِدَّةً فَاُهْلِكُوْا جَمِيْعًا (التفسير للامام ابن كثير)

হযরত উবাইদ ইবনে উমাইর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তা‘আলা যখন ‘আসহাবে ফীল’কে ধ্বংস করার ইচ্ছা করেন, তখন সমুদ্র থেকে তাদের উপর কবুতর ছানার ন্যায় ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি প্রেরণ করেন। সেগুলোর প্রত্যেকটি পাখি মুখে একটি এবং দুই পায়ে দুটি করে কাঁকর-পাথর নিয়ে আসে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর পাখিগুলো সারিবদ্ধভাবে আবরাহা বাহিনীর মাথার উপর অবস্থান নিয়ে চিৎকার করে আওয়াজ দেয় এবং তাদের মুখ ও দুই পায়ের পাথর নিক্ষেপ করে। পাথরগুলো আবরাহার সৈন্যদের মাথায় বিদ্ধ হয়ে পিছনের রাস্তা দিয়ে বের হয়ে যায় এবং শরীরের এক প্রান্তে প্রবেশ করে অপর প্রান্ত দিয়ে বের হয়ে যায়। আল্লাহ তা‘আলা প্রস্তর নিক্ষেপের সাথে সাথে তাদের উপর প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড়ও প্রেরণ করেন। এই ঝড় উক্ত প্রস্তরের গায়ে আঘাত হেনে তার গতির প্রচন্ডতা তীব্রভাবে বাড়িয়ে দেয় এবং এর দ্বারা তাদের উপর কঠিন গজব নিপতিত হয়ে তারা সকলে ধ্বংস হয়ে যায়। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

বিশিষ্ট ঐতিহাসিক মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক ও ইকরিমা রহ. বর্ণনা করেন, ঐ পাথরকুচির স্পর্শ লাগলেই হস্তি বাহিনীর সৈন্যদের দেহে বসন্ত রোগ উদ্ভূত হয়ে যেত। আরব দেশগুলোতে এই রোগের প্রাদুর্ভাব এই বছরই সর্বপ্রথম দেখা দেয়।

রইসুল মুফাসসিরীন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন, যার উপর এই পাথরকুচি পড়তো, সাথে সাথে তার শরীরে ভয়ানক

TOP

চুলকানি শুরু হয়ে যেত। এই চুলকানির ফলে চামড়া ফেটে যেত, গোশত খসে পড়ত এবং অস্থি বের হয়ে আসতো।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর অন্য বর্ণনামতে, এই প্রস্তরের আঘাতে শরীরের গোশত ও রক্ত পানির মতো ঝরতে শুরু করতো, যার ফলে হাড্ডি বের হয়ে আসতো। স্বয়ং আবরাহারও এই অবস্থা দেখা দেয়। তার শরীর ছিন্নভিন্ন হয়ে খসে পড়ে যেতে থাকে। তার শরীরের যেখানেই পাথর খণ্ড পড়লো, সেখান থেকেই রক্ত ও পুঁজ প্রবাহিত হতে লাগলো। এই অবস্থায় তাকে ইয়ামানের রাজধানী সানআয় নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে সে ছটফট করতে করতে অত্যন্ত করুণ অবস্থায় মারা গেল।

আবরাহার মাহমুদ নামক হাতির দুইজন চালক মক্কা মুকাররমায় রয়ে গিয়েছিল। তারা অন্ধ ও বিকলাঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। আয়েশা সিদ্দিকা রা. থেকে বর্ণনা করে বলেন, আমার বড় বোন হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রা. বলেন, আমি ঐ ল্যাংড়া দুটোকে ভিক্ষা করতে দেখেছি।

হস্তি বাহিনীর এ ঘটনা সম্পর্কে সূরা ফীলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে ইরশাদ করা হয়েছে,

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحَابِ الْفِيْلِ

আপনি কি দেখেননি, আপনার রব হস্তি বাহিনীর সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? এখানে প্রশ্ন হয় যে, اَلَمْ تَرَ (আপনি কি দেখেননি) বলা হয়েছে। অথচ এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের পূর্বেকার ঘটনা। কাজেই তার সেই ঘটনা দেখার প্রশ্নই উঠে না। এই প্রশ্নের জবাব হচ্ছে, উক্ত ঘটনা সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ ও বর্ণনা তখন এতো ব্যাপক ও বিস্তৃত ছিল, এ ব্যাপারে কারো সন্দিহান হওয়ার কোন অবকাশ ছিল না। আর যে ঘটনা এরূপ নিশ্চিত যে, তা ব্যাপকভাবে প্রত্যক্ষ করা হয়, সেই ঘটনার জ্ঞানকেও দেখা বলে ব্যক্ত করা হয়। যেন এটা চাক্ষুষ ঘটনা। তা ছাড়া ঘটনার কিছু প্রভাব

পরবর্তীতেও দেখা গেছে। যেমন, হযরত আসমা রা.-এর দুজন হস্তি চালককে অন্ধ-বিকলাঙ্গ ও ভিক্ষুকরূপে দেখার কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা আবরাহা বাহিনীকে যে পাখির মাধ্যমে ধ্বংস করেছেন, কুরআনে কারীম সে ব্যাপারে ইরশাদ হয়েছে,

وَاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ

তিনি তাদের উপর প্রেরণ করেছেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি। (সূরা ফীল, আয়াত:৪)

এখানে উল্লিখিত اَبَابِيْلَ শব্দটি বহুবচন। কিন্তু আরবী ভাষায় এর কোন এক বচনের ব্যবহার পাওয়া যায় না। এর অর্থ পাখির ঝাঁক। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে 'আবাবীল' কোন পাখির নাম নয়, বরং এ শব্দ দ্বারা সেই পাখির আধিক্য বুঝানো হয়েছে। এই পাখির আকারে কবুতর অপেক্ষা একটু ছোট ছিল। কিন্তু এ জাতীয় পাখি এর পূর্বে কখনোই দেখা যায়নি। (আহকামুল কুরআন)

হস্তিবাহিনীর উপর যে কংকর নিক্ষিপ্ত হয়েছিল কুরআনে কারীমে সে ব্যাপারে ইরশাদ হয়েছে, بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ (পাথরজাতীয় কংকর দ্বারা।) ভেজা মাটি আগুনে পুড়িয়ে যে কংকর তৈরি করা হয়, সে কংকরকে سِجِّيْلٍ বলা হয়। এতে ইঙ্গিত রয়েছে, এই কংকর কেবল সাধারণ মাটি ও আগুনের তৈরি ছিল, যার নিজস্ব কোন বিশেষ শক্তি ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার কুদরতে ঐ কংকর রাইফেলের গুলির চেয়ে বেশি কাজ করেছিল। যার ফলে আবরাহা বাহিনী ধ্বংস হয়ে ভক্ষিত ভূষির ন্যায় হয়ে গিয়েছিল।

নিম্নোক্ত আয়াতে এ কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে,

فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের ভক্ষিত ভূষিসদৃশ করে দেন। (সূরা ফীল, আয়াত:৫)

উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত عَصْفٌ শব্দের অর্থ ভূষি। ভূষি নিজেই ছিন্নবিচ্ছিন্ন তৃণ। তদুপরি যদি কোন জন্তু সেটিকে চাবায়, তবে এই তৃণও আর তৃণ থাকে না, বরং সম্পূর্ণ নিষ্পেষিত গুঁড়া হয়ে যায়। কংকর নিক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে আবরাহার সৈন্যবাহিনীর অবস্থাও তদ্রুপই হয়েছিল।

আসহাবে ফীলের ঘটনাস্থল

আসহাবে ফীলের এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল মিনা ও মুজদালিফার মাঝখানে মুহাসসার নামক স্থানে। মুসলিম ও আবু দাউদ শরীফের বর্ণনায় রয়েছে, ইমাম জাফর সাদেক রহ. তার পিতা ইমাম মুহাম্মাদ বাকের রহ. হতে বর্ণনা করেন, তিনি হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. হতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিদায় হজ্জের যে বিবরণ উদ্ধৃত করেছেন, তাতে তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মুযদালিফা হতে মিনার দিকে চললেন, তখন মুহাসসার উপত্যকায় চলার গতি খুব বাড়িয়ে দিলেন। বিশিষ্ট হাদীসবিশারদ ইমাম নববী রহ. এ হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, হস্তিওয়ালাদের উপর আযাব নাযিলের ঘটনা ঠিক এই জায়গায় সংঘটিত হয়েছিল। এ জন্য গযবের এই স্থানটিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব দ্রুত অতিক্রম করেছিলেন। সুতরাং এই স্থান এভাবে দ্রুত অতিক্রম করে যাওয়াই সুন্নত।

আল্লাহ তা'আলা হাবশীদের এই শাস্তি দেওয়ার সাথে সাথে তিন-চার বছরের মধ্যে ইয়ামান হতে তাদের শাসন ক্ষমতারও অবসান ঘটান। হস্তিবাহিনীর এ ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পরে ইয়ামানের হাবশীদের শক্তি ও ক্ষমতা সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যায়। দিকে দিকে ইয়ামানী সরদাররা তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে থাকে। এক পর্যায়ে ইয়ামানী নেতৃবর্গ হাবশীদের মোকাবেলায় পারস্য-সম্রাটের নিকট সামরিক সাহায্যের আবেদন করে। ফলে ৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে পারস্যের মাত্র এক হাজার সৈন্য ছয়টি যুদ্ধ জাহাজ সহ ইয়ামানে আগমন করে এবং

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

সেখান থেকে হাবশীদের পরাস্ত করে তাদের শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটায়।

হস্তিবাহিনীর এই অভূতপূর্ব ঘটনা সমগ্র আরবের এবং সারাবিশ্বের মানুষের অন্তরে কুরাইশদের মাহত্ম্য আরো বাড়িয়ে দেয়। এরপর থেকে সবাই এক বাক্যে স্বীকার করতে লাগলো, কুরাইশরা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ভক্ত। তাই তাদের পক্ষ থেকে আল্লাহ তা'আলা তাদের শত্রুদের নাস্তানাবুদ করে দিয়েছেন। (আল জামি' লি আহকামিল কুরআন লিল-কুরতবী)

আসহাবে ফীলের ঘটনা থেকে শিক্ষা

পবিত্র কুরআনে উল্লেখকৃত এ ধরনের ঘটনা থেকে আমাদের উপদেশ গ্রহণ করা জরুরী যে, আল্লাহ তা'আলার হুকুম-আহকামের অবমাননা করা নিজেদের ধ্বংস ও বরবাদি ডেকে আনারই নামান্তর। তাই সব ধরনের পাপাচার ও ঔদ্ধত্য পরিত্যাগ করে আল্লাহ তা'আলা ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশিত পন্থা অবলম্বন করা আমাদের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। এর মাধ্যমেই আমরা খোদায়ী আযাব-গযব হতে রক্ষা পেয়ে দুনিয়া ও আখেরাতে সফল হতে পারবো।

ধনসম্পদের অপব্যবহার ও তার পরিণাম

وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتَانَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ○ فَلَمَّا اٰتَاهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ○ فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِيْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهٗ بِمَا اَخْلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ○ اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ○

তাদের (নিফাক অবলম্বনকারীদের) মধ্যে কেউ কেউ এমন রয়েছে, যারা আল্লাহ তা'আলার সাথে ওয়াদা করেছিল, তিনি যদি আমাদের নিজ অনুগ্রহে ধনসম্পদ দান করেন, তবে অবশ্যই আমরা তা আল্লাহর পথে ব্যয় করবো এবং নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। অতঃপর যখন তিনি তাদের নিজ অনুগ্রহে সম্পদ দান করলেন, তখন

TOP

তারা তা থেকে দান করতে কার্পণ্য করলো এবং আল্লাহর হুকুম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। আর তারা তো মুখ ফিরাতেই অভ্যস্ত। তারপর এর পরিণতিতে তাদের অন্তরে কপটতা স্থান করে নিয়েছে সেদিন পর্যন্ত- যেদিন তারা আল্লাহর সাথে গিয়ে মিলবে। তা এ জন্য যে, তারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা লংঘন করেছে এবং এ জন্য যে, তারা মিথ্যা কথা বলতো। তারা কি জানে না, আল্লাহ তা'আলা তাদের মনের কথা ও শলা-পরামর্শ সম্পর্কে অবগত এবং আল্লাহ তা'আলা খুব ভালো করেই জানেন সমস্ত গোপন বিষয়? (সূরা তাওবা, আয়াত:৭৫-৭৮)

এ দু' আয়াতে ধনসম্পদ পেলে দান-খয়রাতের ব্যাপারে আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তারা এই অঙ্গীকার করেছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে। যেহেতু দীনের বিষয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ওয়াদা করা আল্লাহর সাথে ওয়াদা করার শামিল, তাই আয়াতটিতে আল্লাহর সাথে ওয়াদা করার কথা বলা হয়েছে।

এই আয়াতের শিক্ষা হলো, আল্লাহ তা'আলা যাকে মাল-সম্পদ দিয়েছেন, তার উচিৎ মাল-সম্পদকে আল্লাহ তা'আলার পরীক্ষা মনে করে এর সুষ্ঠু ব্যবহার ও শরী'আত নির্দেশিতভাবে ব্যয় করতে সচেষ্ট থাকা। কখনও আল্লাহ তা'আলার হুকুম পালনে অনীহা বা অনাগ্রহ দেখানো কিংবা দীনের পথে খরচ করতে বা যাকাত, ফিতরা, কুরবানী ইত্যাদি আদায়ে কিংবা হকদারদের হক পূরণ করতে কার্পণ্য করা কিছুতেই উচিত নয়।

যদি আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ তাঁর নির্দেশিত পন্থায় ব্যয় না করা হয় এবং আল্লাহর অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞ না থাকা হয় তাহলে এর শাস্তি হিসেবে অন্তরে মুনাফেকী চিরস্থায়ী হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে।

আয়াতের শানে নুযুল হিসেবে প্রসিদ্ধ একটি অনির্ভরযোগ্য ঘটনা

এই আয়াতের শানে নুযুল হিসেবে একটি ঘটনা প্রসিদ্ধ রয়েছে। ঘটনার সার সংক্ষেপ হলো, সা'লাবা ইবনে হাতেব আনসারী, রাসূল

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে ধনসম্পদ প্রাপ্তির জন্যে দু‘আ কামনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিরুৎসাহিত করে ফিরিয়ে দেন।

কিন্তু তিনি পরে আবার এসে একই নিবেদন করলেন এবং এই অঙ্গীকার করলেন, যদি আমি মালদার হই, তবে আমি প্রত্যেক হকদারকে তার হক বা প্রাপ্য পৌঁছে দিব। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপছন্দ সত্ত্বেও তার জন্য দু‘আ করলেন, আয় আল্লাহ, আপনি সা‘লাবাকে সম্পদশালী বানিয়ে দিন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু‘আর ফলে সা‘লাবার ছাগল-ভেড়া তড়িৎগতিতে বাড়তে আরম্ভ করলো। এমনকি একসময় মদীনায় বসবাসের জায়গাটি তার জন্য সংকীর্ণ হয়ে উঠলো। তখন তিনি মদীনা শহরের বাইরে চলে যান। শুধু যুহর ও আসরের নামায মদীনায় এসে আদায় করতেন।

তার ছাগল-ভেড়ার আরো বেড়ে গেলে তিনি মদীনার শহরতলী থেকে আরো দূরবর্তী এক স্থানে চলে যান। সেখান থেকে শুধু জুম‘আর নামাযের জন্য তিনি মদীনায় আসতেন এবং অন্যান্য পাঞ্জেগানা নামায সেখানেই পড়ে নিতেন।

তারপর ক্রমশ এসব ছাগল-ভেড়া বহুগুণে বেড়ে গেলে সেই জায়গাও তাকে ছাড়তে হলো এবং তিনি মদীনা থেকে বহুদূরে চলে গেলেন। সেখানে যাওয়ার পরে মসজিদে নববীতে কোন ওয়াক্তের জন্যও আসতে পারলেন না। ফলে জুম‘আ ও জামা‘আত সবকিছু থেকেই তাকে বঞ্চিত হতে হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সা‘লাবার এ অবস্থা শুনে সা‘লাবার প্রতি আফসোস প্রকাশ করেন।

কিছুদিন পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে যাকাত উসুলকারীগণ সা‘লাবার কাছে যাকাত নেয়ার জন্য হাজির হলে

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

সে যাকাতকে জিযিয়া (অমুসলিমদের থেকে উসুলকৃত কর) সাব্যস্ত করে যাকাত প্রদান করতে অস্বীকার করে।

যাকাত উসুলকারীগণ মদীনায় ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হলে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবারো সা‘লাবার প্রতি আফসোস প্রকাশ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের আফসোসের কথা শুনে সা‘লাবা ঘাবড়ে গেলো এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে নিবেদন করলো, আল্লাহর রাসূল, আমার যাকাত কবুল করে নিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তা‘আলা আমাকে তোমার যাকাত গ্রহণ করতে বারণ করেছেন।

মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর সা‘লাবা হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর নিকট উপস্থিত হয়ে যাকাত কবুল করার আবেদন জানালে আবুবকর সিদ্দিক রা. ও তার যাকাত কবুল করতে অস্বীকৃতি জানান। আবু বকর সিদ্দিক রা. এর ওফাতের পর হযরত উমর ফারুক রা. এবং হযরত উসমান রা. ও সা‘লাবার যাকাত গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। হযরত উসমান রা.-এর খিলাফতকালেই সা‘লাবার মৃত্যু হয়।” (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

দীর্ঘ এ ঘটনাটি মানুষের মধ্যে বেশ প্রসিদ্ধ। ধন-সম্পদের লোভের চরম শাস্তির কথা বুঝাতে গিয়ে অনেকেই এ ঘটনাটি বর্ণনা করেন। বেশ কয়েকটি তাফসীরের কিতাবেও এর উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু এ ঘটনাটি হাদীসের কোন নির্ভরযোগ্য সূত্রে পাওয়া যায় না। ধন-সম্পদ আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায় ব্যয় না করার পরিণতি আয়াতের তরজমা থেকেই সুস্পষ্ট। এটা বুঝানোর জন্য বা নিছক ঘটনা হিসাবে হযরত সা‘লাবা রা. সংক্রান্ত ঘটনাটি বর্ণনা করার কোন সুযোগ নেই।

এ পর্যায়ে আমরা দু’ভাবে ঘটনাটির বিশ্লেষণ করবো-

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

প্রথম আলোচনা: সা‘লাবা রা. সংক্রান্ত রিওয়ায়েতের সনদ যাচাই

হযরত সা‘লাবা রা. সংক্রান্ত ঘটনাটি তিনজন সাহাবীর বর্ণনায় পাওয়া যায়।

১. হযরত আবূ উমামা রা.

তাঁর রিওয়ায়েতটি আবার তিনটি সূত্রে পাওয়া যায়। (ক) মুহাম্মাদ ইবনে শু‘আইব, (খ) মিসকীন ইবনে বুকাইর। (গ) ওয়ালীদ ইবনে মুসলিম। উল্লিখিত তিনজনই হযরত মুআন ইবনে রিফা‘আর ওয়াসেতায় হযরত আলী ইবনে ইয়াযীদ হতে বর্ণনা করেন। এই আলী ইবনে ইয়াযীদের ব্যপারে ইমাম বুখারী রহ. বলেন, ‘মুনকারুল হাদীস’। (আত-তারীখুল কাবীর: ৬/৩০১)

অন্যত্র বলেন, আমি যার ব্যাপারে মুনকারুল হাদীস বলবো, তার থেকে রিওয়ায়েত করা জায়েয নেই। (মীযানুল ইতিদাল: ১/২; ৬/২০২)

ইমাম দারাকুতনী তার ব্যাপারে বলেছেন, ‘মাতরূক’। [আয-যু‘আফা ওয়াল মাতরুকীন: ১/৭৭; (মীযানুল ইতিদাল: ৩/১৬১)]

২. হযরত ইবনে আব্বাস রা.

তাঁর থেকে শুধুমাত্র একটি সূত্রে রিওয়ায়েতটি পাওয়া যায়। সেখানে একজন রাবী আছেন হুসাইন ইবনে হাসান ইবনে আতিয়্যাহ, তাঁর ব্যাপারে ইবনে হিব্বান রহ. বলেন, তার রিওয়ায়েত দ্বারা দলীল পেশ করা জায়েয নেই। আবূ হাতিম ও ইবনে সা‘দ রহ. বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে দুর্বল ছিলেন। (লিসানুল মীযান: ৩/১৫৫)

ইবনে মাঈন রহ.ও তার ব্যপারে একই মত পোষণ করেছেন। (তারীখে বাগদাদ: ৮/৫৫২)

৩. হযরত হাসান রা.

তাঁর থেকে শুধু একটি সূত্রে রিওয়ায়েতটি পাওয়া যায়। আর তাতে পাঁচটি ইল্লত (সমস্যা) রয়েছে।

সূত্র: এ সূত্রটির (ইল্লত) সমস্যাগুলোর শাস্ত্রীয় আলোচনা নিম্নরূপ:

ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله الاية، وكان الذي عاهد الله منهم :ثعلبة بن حاطب، ومعتب بن قشير، وهما من بني عمرو بن عوف.

اخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان 740/33 من طريق ابن حميد قال، حدثنا سلمة، عن ابن اسحاق، عن عمرو بن عبيد، عن الحسن.

هذا اسناد ضعيف جدا؛ فيه خمس علل:

١. الارسال؛ فان الحسن(وهو : البصري) تابعي، وقد ارسله،ومراسيل الحسن لا يحتج بها. وقال الحسن البصري كنت اذا اجتمع لي اربعة نفر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تركتهم واسندته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فاذا كان هذا شان مراسيل الحسن وهي عندكم من اضعف المراسيل فكيف بمراسيل غيره من كبار التابعين كابن المسيب. جامع التحصيل: ص5. وان مراسيل عطاء والحسن البصري لا يحتج بها لانهما كانا ياخذان عن كل احد.جامع التحصيل: ص4

٢. عمرو بن عبيد بن باب ويقال :بن كيسان التميمي ابو عثمان البصري مولى بني تميم هو المعتزلي المشهور الهالك ، كان داعية الى بدعته،تهذيب الكمال في اسماء الرجال: برقم 4406

2/501الحديث ط النبلاء اعلام سير. عنعن وقد مدلس، يسار بن اسحاق بن محمد

٣. سلمة بن الفضل الابرش ،صدوق كثير الخطا . قال ابو حاتم : محله الصدق، في حديثه انكار، لا يمكن ان اطلق لساني فيه باكثر من هذا .يكتب حديثه ولا يحتج به .وقال محمد بن سعد : كان ثقة صدوقا، وهو صاحب مغازي محمد بن اسحاق روى عنه"المبتدا"و"المغازي ."وكان مؤدبا، وكان يقال :انه من اخشع الناس في صلاته(.تهذيب الكمال في اسماء الرجال 11/308:

٤. محمد بن حميد بن حيان، ابو عبد الله الرازي وهو مكثر عن سلمة بن الفضل الابرش، وله مناكير وغرائب كثيرة .تاريخ الاسلام ت بشار :5/1221

দ্বিতীয় আলোচনা: ঘটনাটির ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের মতামত

হযরত সা‘লাবা সংক্রান্ত ঘটনাটি বাতিল হওয়ার ব্যাপারে অনেক উলামায়ে কেরামের সুস্পষ্ট মত পাওয়া যায়।

১. ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন, তাঁর ব্যাপারে বর্ণিত ঘটনাটি সহীহ নয়। আবূ উমর বলেন, হযরত সা‘লাবার ব্যাপারে যাকাত না দেয়া সংক্রান্ত যে ঘটনাটি বলা হয়, তা সহীহ নয়। (আল জামি‘ লি আহকামিল কুরআন: ৮/২১০)

www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com

২. শায়েখ আব্দুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ রহ. বলেন, হযরত সা'লাবা রা. সংক্রান্ত ঘটনাটি গ্রহণযোগ্য নয়। (আত তালিকাতুল হাফিলাহ, পৃষ্ঠা: ১০৮)

৩. শায়েখ নাসিরুদ্দীন আলবানী রহ. বলেন, হযরত সা'লাবা রা. সংক্রান্ত ঘটনাটির সনদ যয়ীফ যিদ্দান। (সিলসিলাতুল যয়ীফা: ৯/৮০)

৪. মুহাক্কিক আব্দুল হুমাইদ সাদানী বলেন, ঘটনাটি সহীহ নয়। (মারেফাতুস সাহাবা লি আবী নু'আইম: ১/৪১৪)

হযরত সা'লাবা রা. সংক্রান্ত ঘটনাটির সনদ তথা বর্ণনাসূত্রের অবস্থা এবং এ ব্যাপারে হাদীস শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ উলামায়ে কেরামের বক্তব্যের আলোকে এ কথা স্পষ্ট যে, ঘটনাটি নির্ভরযোগ্য ও বর্ণনার উপযুক্ত নয়। তাই এটি বর্ণনা করা থেকে আমাদের অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বেঁচে থাকতে হবে।

গাযওয়ায়ে বদর

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের সূরা আনফালে ইরশাদ করেন,

كَمَآ اَخۡرَجَكَ رَبُّكَ مِنۡۢ بَيۡتِكَ بِالۡحَقِّ ۪ وَ اِنَّ فَرِيۡقًا مِّنَ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ لَكٰرِهُوۡنَ ○

يُجَادِلُوۡنَكَ فِى الۡحَقِّ بَعۡدَ مَا تَبَيَّنَ كَاَنَّمَا يُسَاقُوۡنَ اِلَى الۡمَوۡتِ وَهُمۡ يَنۡظُرُوۡنَ ○

(গনিমতের মাল বণ্টনের এ বিষয়টা কল্যাণকর হওয়ার দিক থেকে এমনই) যেমন আপনাকে আপনার রব আপনার ঘর (মদীনা) থেকে (বদরপ্রান্তরে) বের করেছেন ন্যায় ও সৎকাজের (কাফেরদের সাথে যুদ্ধের) জন্য, আর মুমিনদের একটি দল (সংখ্যা স্বল্পতা আর যুদ্ধাস্ত্রের স্বল্পতার কারণে স্বভাবত) তা অপছন্দ করছিল। তারা আপনার সাথে বিবাদ করছিল সত্য ও ন্যায় বিষয়ে (তথা কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করার ব্যাপারে) (মশওয়ারা সাপেক্ষে) তা (যুদ্ধের সিদ্ধান্ত) প্রকাশিত হওয়ার পর। (তারা আপনার সাথে এমনভাবে বিবাদ করছিল) যেন তাদেরকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আর তারা

(মৃত্যুকে) দেখছে। (সূরা আনফাল, আয়াত:৫-৬; তাফসীরে মারিফুল কুরআন, ৪/১৮১)

এ আয়াত দুটিতে গাযওয়ায়ে বদর প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। মুসলিম উম্মাহ ও ইসলামের ইতিহাসে গাযওয়ায়ে বদর বা বদরের যুদ্ধ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই যুদ্ধ দ্বারা একদিকে তখনকার ইসলাম বিরোধী কুফরী শক্তির দর্প চূর্ণ হয়েছে। অপরদিকে মুসলিমগণ মানসিকভাবে অশেষ দৃঢ়তা অর্জন করতে পেরেছেন।

আল্লাহ তা‘আলা এই যুদ্ধের মাধ্যমে হক ও বাতিলের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য রচনা করে দিয়েছেন। এই যুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ ঘটনার প্রতি গভীরভাবে মনোযোগ দিলে মুমিনের ঈমান বাড়ে আর অবিশ্বাসী সম্প্রদায় এর দ্বারা ইসলাম গ্রহণ করার এবং ইসলামের বিরোধিতা না করার নসীহত লাভ করতে পারে।

অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের নসীহত অর্জনের মতো আরেকটি যুদ্ধ হলো গাযওয়ায়ে খায়বার। এ যুদ্ধেও ইসলাম বিরোধীদের নাস্তানাবুদ হওয়ার চিত্র প্রত্যক্ষভাবে ফুটে উঠেছে।

আমরা সবিস্তারে এই দুই গাযওয়া সম্পর্কিত আয়াতগুলোর তাফসীর করার চেষ্টা করবো। যাতে মুসলিমগণের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং তারা যেন আল্লাহ তা‘আলার রহমত থেকে নিরাশ না হয় আর অবিশ্বাসী সম্প্রদায় নসীহত অর্জনপূর্বক ইসলামের বিরোধিতা থেকে বিরত থাকে।

প্রথমে বদর যুদ্ধের প্রসঙ্গে আলোচনা করা হচ্ছে। এ যুদ্ধের সাথে সংশ্লিষ্ট দুটি আয়াত উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। আয়াতে বলা হয়েছে,

وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكٰرِهُوْنَ

“মুমিনদের একটি দল তা অপছন্দ করছিল।”

সাহাবায়েকেরামের একটি দল বদর যুদ্ধকে কেন অপছন্দ করছিলেন, তা বুঝার জন্য বদর যুদ্ধের প্রেক্ষাপট জানা প্রয়োজন।

TOP

GET ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

গাযওয়ায়ে বদরের প্রেক্ষাপট

ইবনে উকবা ও ইবনে আমেরের বর্ণনা মোতাবেক বদর যুদ্ধের প্রেক্ষাপট নিম্নরূপ।

কাফেররা বিভিন্নভাবে ইসলামের ধ্বংস সাধনের অপচেষ্টা করতে থাকে। তাদের অত্যাচারে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীগণ মাতৃভূমি মক্কা ছেড়ে মদীনায় হিজরত করতে বাধ্য হন। কিন্তু তাদের মদীনায় চলে আসার পরও কাফেররা ইসলাম ও মুসলিমদের ধ্বংস সাধনে নানারকম ষড়যন্ত্র করতে থাকে।

ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে সেই ষড়যন্ত্রের সূত্রেই কাফেররা মক্কা থেকে সিরিয়ায় একটি বৃহৎ বাণিজ্য-কাফেলা প্রেরণ করে। যার উদ্দেশ্য ছিলো, ব্যবসার মুনাফা লব্ধ অর্থসম্পদ তারা ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে ব্যয় করবে। এমনকি এ ব্যাপারে তারা মান্নত করে নিলো।

তাদের এ অসৎ পরিকল্পনার কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম জেনে গেলেন। তাই তাদের সেই চক্রান্তমূলক বাণিজ্য-কাফেলার গতিরোধ করার ইচ্ছা করলেন।

দ্বিতীয় হিজরির রমযান মাস চলছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হঠাৎ একদিন খবর পেলেন, কুরাইশ-সরদার আবু সুফিয়ান মক্কার সেই বৃহৎ ব্যবসায়ী কাফেলা নিয়ে সিরিয়া থেকে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করছে। এই ব্যবসায় মক্কার সমস্ত কুরাইশ শরীক ছিল। এই কাফেলায় তখনকার পঞ্চাশ হাজার দিনার সমমূল্যের মাল ছিল। বর্তমান টাকার হিসেবে পঞ্চাশ কোটি ছাড়িয়ে যাবে। এই ব্যবসায়ী কাফেলার হেফাজতের জন্য কুরাইশের সত্তরজন সশস্ত্র জওয়ান পাহারায় নিযুক্ত ছিল। এদের চল্লিশজনই ছিল নেতা পর্যায়ের। তাদের মধ্য থেকে আমর ইবনুল আস ও মাখযামা বিন নাওফেল-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

যদিও ব্যবসা ছিল কুরাইশদের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। কিন্তু এই ব্যবসায়ী কাফেলার মাধ্যমে তারা বিশেষভাবে অর্থসম্পদ ও যুদ্ধাস্ত্র সংগ্রহ করে ইসলামের বিরুদ্ধাচরণে অবতীর্ণ হওয়ার শপথ করেছিলো এবং এই কাফেলার সমস্ত মাল তারা ইসলাম ও মুসলিমদের উৎখাতের জন্য ব্যয় করার মান্নত করে রেখেছিল।

তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এই ব্যবসায়ী কাফেলার সিরিয়া থেকে মক্কার পথে রওনা হওয়ার কথা শুনলেন, তখন তিনি কুরাইশদের এই ইসলাম বিরোধী অপতৎপরতার ভিত উপড়ে ফেলার জন্য এই কাফেলার গতিরোধ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন।

এ নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত সাহাবায়েকেরামের সাথে পরামর্শ করলেন। তখন একে তো রমযান মাস চলছিল, তা ছাড়া পূর্ব থেকে তাদের যুদ্ধের প্রস্তুতি ছিল না, তাই এ ব্যাপারে কেউ কেউ কিছুটা অমত প্রকাশ করেছিলেন। আবার কেউ কেউ খুব বাহাদুরির সাথে হামলার পক্ষে মত ব্যক্ত করেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবাইকে এই জিহাদে শরীক হওয়ার হুকুম দিলেন না। বরং বললেন, যারা যেতে আগ্রহী এবং যাদের বাহন-জন্তু এ এলাকায় উপস্থিত আছে, শুধু তারাই আমার সাথে যুদ্ধে বের হবে।

এ কথা শুনে অনেকেই এ জিহাদে শরীক হলেন না। কারণ, তারা ভাবছিলেন, ব্যবসায়ী কাফেলার গতিরোধ করা হবে। এর জন্য বেশি সংখ্যক মুজাহিদের প্রয়োজন নেই। তা ছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধে শরীক হওয়াকে জরুরী বলেননি। বরং ঐচ্ছিক বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

অনেকে যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছায় বাহন-জন্তু গ্রাম থেকে নিয়ে আসার অনুমতি চাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

অনুমতি দিলেন না। কারণ, হাতে এতটা সময় ছিল না যে, তাদের জন্য অপেক্ষা করা হবে। এসব কারণে খুব কম সংখ্যক সাহাবী এ যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন।

যুদ্ধের উদ্দেশ্যে কাফেলা রওনা হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়েকেরামকে নিয়ে মদীনার বাইরে ‘বিরে সুকআ’ নামক স্থানে পৌঁছলেন। কায়েস বিন সা‘সা রা. কে সৈন্য সংখ্যা গণনা করার হুকুম দিলেন। তিনি জানালেন, সৈন্য সংখ্যা সব মিলে ৩১৩। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তালুতের বাহিনীর সৈন্য সংখ্যাও ৩১৩ জন ছিল। এর দ্বারা বিজয়ের শুভ লক্ষণ গ্রহণ করা যেতে পারে।

সাহাবায়ে কেরামের সাথে মোট সত্তরটি উট ছিল। পালাক্রমে প্রত্যেক তিনজন একটি উটে আরোহণ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গী ছিলেন হযরত আলী ও আবু লুবাবা রা.। যখন নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের পায়ে হেঁটে চলার পালা আসতো, তখন তারা বলতেন, আপনার পরিবর্তে আমরাই হেঁটে চলছি, আপনি উটের উপর থাকুন। উত্তরে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, তোমরা আমার চেয়ে বেশি শক্তিশালী নও, আর আমি আখিরাতের সাওয়াব থেকে অমুখাপেক্ষী নই যে, নিজের সুযোগ হাতছাড়া করবো। এ জবাবের পর কিছু বলার থাকে না। তাই নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামও নিজের পালার সময় পায়ে হেঁটে চলতে লাগলেন।

ওদিকে একব্যক্তি সিরিয়ার প্রসিদ্ধ স্থান আইনে যারকা পৌঁছে কাফেলা-প্রধান আবু সুফিয়ানকে সতর্ক করলো। সে সংবাদ দিল, মুহাম্মাদ অস্ত্রশস্ত্র ও দলবল নিয়ে তার অপেক্ষায় আছেন।

এই সংবাদ শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাকড়াও থেকে বাঁচার জন্য আবু সুফিয়ান ভিন্ন পথে অগ্রসর হলো এবং হিজাযের সীমানায় প্রবেশ করে যামযাম বিন উমর নামক এক

বিচক্ষণ ও দ্রুতগামী দূতকে অনেক সম্পদের বিনিময়ে মক্কার সরদারের নিকট এই মর্মে সংবাদ দিয়ে পাঠালো যে, ব্যবসায়ী কাফেলা মুসলিম ফৌজ দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে। অনতি বিলম্বে ব্যবস্থা নিন।

যামযাম বিন উমর ব্যবসায়ী কাফেলার আশঙ্কা বুঝানোর জন্য ঐ সময়ের বিশেষ রীতি অনুযায়ী মক্কায় প্রবেশের পূর্বে নিজ উটের নাক-কান কেটে দিল এবং পরিধেয় বস্ত্র অগ্র-পশ্চাৎ থেকে ছিঁড়ে ফেললো। আর উটের হাওদা উল্টিয়ে উটের পিঠে রেখে দিল। যখন সে এই অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করলো, তখন মুহূর্তে তার সংবাদ মক্কার অলিগলিতে পৌঁছে গেল এবং তার নিকট বিস্তারিত খবর শোনার পর কুরাইশের শত শত যুবক মুসলিমদের হাত থেকে তাদের ব্যবসায়ী কাফেলা রক্ষা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল।

কুরাইশের সামর্থ্যবানরা নিজেরাই যুদ্ধে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলো। আর যারা দুর্বল বা সমস্যাগ্রস্ত ছিল, তারা নিজেদের পক্ষ থেকে আরেকজনকে পাঠানোর ব্যবস্থা করলো। মাত্র তিন দিনের মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র ও প্রয়োজনীয় যুদ্ধসামগ্রী নিয়ে হাজার সৈনিকের একটি দল যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলো। তাদের মধ্যে ছিল এক হাজার যোদ্ধা, দুইশত ঘোড়া এবং ছয়শত উট ও বাদক দল।

এসব নিয়ে কাফের বাহিনী মদীনা অভিমুখে যাত্রা শুরু করলো। প্রত্যেক মনযিলে (ষোল মাইলে এক মনযিল) এ বাহিনীর খাবারের জন্য দশটি করে উট জবাই করতে হতো।

এ যুদ্ধে যেতে যে-ই পিছপা হচ্ছিল, কুরাইশ-সরদার তাকেই সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো। তা ছাড়া যেসব লোকের ব্যাপারে কুরাইশদের ধারণা ছিল, তারা মুসলিমদের সহমর্মী এবং ঐসব মুসলমান, যারা বিভিন্ন ওজরের কারণে তখনও পর্যন্ত হিজরত করতে পারেননি, তাদের এবং বনী হাশেমের মধ্য থেকে যার ব্যাপারে সামান্য ধারণা হলো যে, সে মুসলিমদের ব্যাপারে নরম মনোভাব রাখে, তাদেরও জোরপূর্বক এই যুদ্ধে শরীক করে নেওয়া হলো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আব্বাস রা. এবং আবু তালিবের দুই ছেলে তালিব ও আকিল এই অপারগদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

এ দিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু একটি ব্যবসায়ী কাফেলাকে ধাওয়া করার প্রস্তুতির নিয়তে রমাযানের ১২ তারিখে মদীনা থেকে বের হয়েছেন। মক্কার কাফেরদের পূর্ণ যুদ্ধ প্রস্তুতির কথা তারা জানতেন না, তাই তাদের মোকাবেলায় পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ প্রস্তুতি তাদের ছিল না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৩১৩ জন সাহাবীকে নিয়ে কয়েক মনযিল পথ অতিক্রম করে বদরের নিকটবর্তী একস্থানে পৌঁছলেন। সেখানে পৌঁছে আবু সুফিয়ানের কাফেলার সংবাদ নেওয়ার জন্য দুই ব্যক্তিকে পাঠালেন। গুপ্তচররা এই সংবাদ নিয়ে এলেন যে, মুসলিমদের পিছু ধাওয়া করার সংবাদ পেয়ে আবু সুফিয়ান সমুদ্র সৈকতের পথ ধরে মক্কায় পৌঁছে গেছে আর মক্কা থেকে এক হাজারের এক বাহিনী মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য মদীনার দিকে আসছে।

গুপ্তচরের এ সংবাদ পরিস্থিতি পাল্টে দিলো। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়েকেরামের সাথে পরামর্শে বসলেন। জিজ্ঞেস করলেন, আমরা কুরাইশদের আগত বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করবো নাকি তাদের এড়িয়ে যাবো?

হযরত আবু আইয়ুব আনসারীসহ কয়েকজন সাহাবী বললেন, তাদের সাথে যুদ্ধ করার মতো সামর্থ্য বর্তমানে আমাদের নেই। তাছাড়া আমরা সমরাস্ত্রে সজ্জিত বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার নিয়তে বা সেই রকম প্রস্তুতি নিয়ে বের হইনি।

তাদের কথা শেষ হওয়ার পর হযরত আবুবকর রা. দাঁড়ালেন এবং যে কোনো পরিস্থিতিতে যে কোনো হুকুম বাস্তবায়নের জন্য নিজেকে পেশ

করলেন। এরপর হযরত উমর রা. ও যে কোন নির্দেশ পালনের জন্য নিজেদের মানসিক প্রস্তুতির কথা জানালেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কথা শুনে খুশি হলেন এবং তাদের জন্য দু‘আ করলেন।

কিন্তু তখন পর্যন্ত আনসারী সাহাবীগণের পক্ষ থেকে যুদ্ধের জন্য সম্মতিসূচক কোন কথা পাওয়া যায়নি। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় বললেন, তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও, এ জিহাদে অগ্রসর হবো, নাকি হবো না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মূলত আনসারী সাহাবীগণকে লক্ষ্য করেই এ কথা বলেছিলেন। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আনসারদের সরদার সাদ বিন মুয়ায রা. বললেন, আল্লাহর রাসূল, আমরা আপনার উপর ঈমান এনেছি এবং এ সাক্ষ্য দিয়েছি যে, আপনি যা বলেন তা সব সত্য ও সঠিক। আর আমরা আনসারীগণ আপনার সাথে এই অঙ্গীকার করেছি যে, আমরা সর্বাবস্থায় আপনাকে মান্য করবো। অতএব, আল্লাহ তা‘আলা আপনাকে যে হুকুম দিয়েছেন, তা আপনি নিশ্চিন্তে জারি করুন। শপথ ঐ সত্তার, যিনি আপনাকে সত্য দীন দিয়ে পাঠিয়েছেন, যদি আপনি আমাদের উত্তাল সমুদ্রতরঙ্গে ঝাঁপ দিতে বলেন, তবু আমরা পিছপা হবো না। কালই যদি আপনি আমাদের শত্রুবাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে বলেন, তবু আমাদের কোন দ্বিধা থাকবে না। আমরা আশা করছি, আল্লাহ তা‘আলা আমাদের দ্বারা এমন অবস্থার সৃষ্টি করবেন, যা দেখে আপনার চক্ষু শীতল হবে। আপনি যেখানে চান আমাদের নিয়ে চলুন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদ রা. এর দৃপ্তকণ্ঠের আত্মপ্রত্যয়ী কথা শুনে দারুণ খুশি হলেন। কাফেলাকে হুকুম দিলেন, আল্লাহর নামে সামনে অগ্রসর হও। আর সাহাবীগণকে এ সুসংবাদ দিলেন যে, আল্লাহ তা‘আলা দুই দলের (আবু সুফিয়ানের ব্যবসায়ী কাফেলা ও আবু জাহেলের নেতৃত্বাধীন কুরাইশ সেনাবাহিনীর) মধ্য

থেকে যেকোনো একটির উপর বিজয় দানের ওয়াদা করেছেন। (তাফসীরে মারিফুল কুরআন, ৪/১৮৭)

উক্ত বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আয়াতে বর্ণিত 'আর মুমিনদের একটি দল অপছন্দ করছিল'- এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, হযরত আবু আইয়ূব আনসারীসহ কিছু সাহাবীর পূর্ণ যুদ্ধপ্রস্তুতি না থাকায় এতে অমত পোষণ করা। আর এ বিষয়টিই পরবর্তী আয়াতে 'তারা আপনার সাথে বিবাদ করছিল সত্য ও ন্যায় বিষয়ে' দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে।

যদিও সাহাবীগণ কখনো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কোন বিষয়ে ঝগড়া-বিবাদ করেননি, কিন্তু যুদ্ধের ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মানশা বা ইচ্ছা বুঝার পরও তার ইচ্ছার বিপরীত খেয়াল প্রকাশ করা সাহাবায়েকেরামের উঁচু মর্যাদা অনুযায়ী হয়নি। তাই এক্ষেত্রে তাদের এই অবস্থাকেই বিবাদ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। (তাফসীরে মারিফুল কুরআন, ৪/১৮৭)

সেসময় মুসলমানগণ আল্লাহ তা'আলার নিকট নিজেদের সংখ্যা স্বল্পতা, যুদ্ধাস্ত্রের অপ্রতুলতা এবং শত্রুবাহিনীর সংখ্যাধিক্যের ফরিয়াদ করলে আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দেন, আমি তোমাদের এমন এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করবো, যারা যুদ্ধের ময়দানে ধারাবাহিকভাবে নামবে। উল্লিখিত আয়াতসমূহে এসব বিষয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনশ' তের জন সাহাবীকে নিয়ে কয়েক মনযিল পথ অতিক্রম করে বদরের নিকটবর্তী এক স্থানে পৌঁছলেন। সেখানে পৌঁছে আবু সুফিয়ানের কাফেলার সংবাদ নেওয়ার জন্য দুই ব্যক্তিকে পাঠালেন। গুপ্তচরদ্বয় এই সংবাদ নিয়ে এলেন যে, মুসলিমদের পিছু ধাওয়ার সংবাদ পেয়ে আবু সুফিয়ান সমুদ্রসৈকতের পথ ধরে মক্কায় পৌঁছে গেছে আর মক্কা থেকে এক হাজার সৈন্যের এক বাহিনী মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য মদীনার দিকে আসছে।

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

এভাবে শেষ পর্যন্ত মক্কার কাফেরদের সাথে যুদ্ধ অবধারিত হয়ে যায়। পূর্বপ্রস্তুতি না থাকা সত্ত্বেও বাধ্য হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসার ও মুহাজির সাহাবায়ে কেরামের সাথে মশওয়ারা করে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

মুসলিমদের পূর্বেই মক্কার মুশরিকবাহিনী বদর নামক স্থানে পৌঁছে তুলনামূলক উঁচু ও শক্ত স্থানে শিবির স্থাপন করলো। পানির কূপগুলো তাদের কাছাকাছি ছিল। মুসলিম ফৌজ সেখানে পৌঁছে তুলনামূলক নিম্নভূমিতে শিবির স্থাপনে বাধ্য হলো। অবশ্য মুসলিম ফৌজ প্রথমে যেখানে শিবির স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছিল, হযরত হুবাব ইবনুল মুনযির রা. এর পরামর্শে সেখান থেকে আরেকটু এগিয়ে মুশরিক বাহিনীর দখলকৃত দুই-একটা কূপ ছিনিয়ে নিয়ে শিবির স্থাপন করলো।

শিবির স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর হযরত সাদ বিন মুয়ায রা. বললেন, আল্লাহর রাসূল, আমাদের মন চায়, আমরা আপনার জন্য নিরাপদ কোন স্থানে একটি ঝুপড়ি তৈরি করে দিই, যেখানে আপনি অবস্থান করবেন এবং আপনার বাহন-জন্তুও তার আশপাশে থাকবে। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুমতি দিলেন। ঝুপড়ি তৈরি করা হলো। হযরত আবুবকর সিদ্দিক রা. ছাড়া সেখানে অন্য কারো প্রবেশের অনুমতি ছিল না। হযরত মুয়ায রা. নাঙ্গা তরবারি হাতে ঝুপড়ির দরজায় পাহারায় নিযুক্ত হন।

যুদ্ধের পূর্বের রাত। তিনশ’ তের জন অস্ত্রহীন মুজাহিদের মোকাবেলায় এক হাজার সশস্ত্র কাফের প্রস্তুত। রণাঙ্গনের শক্ত ও চলাচলের জন্য অধিক উপযোগী স্থানটাও শত্রুসেনাদের দখলে। নিজেদের শিবির বালুময় নরম ভূমির উপর, যেখানে চলাচল অত্যন্ত কষ্টকর। স্বভাবতই মুসলমানগণ অত্যন্ত পেরেশান। কাউকে তো শয়তান এই ওয়াসওয়াসাও দিল যে, তোমরা নিজেদের হকের উপর প্রতিষ্ঠিত মনে করো। অথচ এই নিশুতি রাতে আরাম করার পরিবর্তে

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

তাহাজ্জুদসহ অন্যান্য ইবাদতে লিপ্ত রয়েছ, তা সত্ত্বেও দুশমনের অবস্থা সর্বদিক দিয়ে তোমাদের তুলনায় অনেক ভাল।

পেরেশানীর কারণে কারো ঘুম আসছিল না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা নিজ রহমতে সবার উপর ঘুম চাপিয়ে দিলেন। তাই ঘুমাতে না চাওয়া সত্ত্বেও তারা ঘুমাতে বাধ্য হয়েছিলেন। হযরত আলী রা. বলেন, গাযওয়ায়ে বদরের রাতে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত আমাদের প্রত্যেকেই ঘুমিয়ে ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারারাত তাহাজ্জুদে মশগুল ছিলেন। (তাফসীরে মারিফুল কুরআন, ৪/১৯৫)

যুদ্ধের ময়দানের এমন ঘুম বা তন্দ্রার ব্যাপারে হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, 'যুদ্ধের ময়দানে তন্দ্রা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে রহমতস্বরূপ আসে। আর নামাযের মধ্যে তন্দ্রা আসে শয়তানের পক্ষ থেকে।' (তাফসীরে মারিফুল কুরআন, ৪/১৯৫)

ঐ রাতে মুজাহিদদের জন্য আরেকটি নিয়ামত এই ছিল যে, মুসলিমদের অনুকূলে বৃষ্টি বর্ষিত হয়। এমন বৃষ্টি, যা একদিকে যেমন রণাঙ্গনের নকশা পাল্টে দেয়, অন্যদিকে তার বরকতে মুসলিম ফৌজের অন্তর থেকে সব ধরনের শয়তানি ওয়াসওয়াসা দূরীভূত হয়। সেই বৃষ্টি শত্রু শিবিরে খুব বেশি পরিমাণে হয়। এতে তাদের শক্ত ভূমি কর্দমাক্ত হয়ে চলাফেরা করা দুঃসাধ্য হয়ে যায়। অপরদিকে মুসলিম শিবিরে অল্প পরিমাণে বৃষ্টি হয়। যার ফলে বালু জমে গিয়ে চলাফেরা খুব সহজ হয়ে যায়।

এসব নিয়ামতের কথা আল্লাহ তা'আলা নিম্মোক্ত আয়াতে উল্লেখ করেছেন,

اِذْ يُغَشِّيْكُمُ النُّعَاسَ اَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُمْ بِهٖ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطٰنِ وَلِيَرْبِطَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامَ ○

স্মরণ করো, যখন তিনি তার পক্ষ থেকে প্রশান্তিস্বরূপ তোমাদের তন্দ্রাচ্ছন্ন করেন এবং আকাশ থেকে তোমাদের উপর পানি নাযিল করেন, যেন তার মাধ্যমে তোমাদের পবিত্র করেন এবং তোমাদের থেকে শয়তানের নাপাকি (কুমন্ত্রণা) দূর করে দেন, আর তোমাদের অন্তরে দৃঢ়তা তৈরি করেন এবং তার মাধ্যমে তোমাদের পা স্থির করে দেন। (সূরা আনফাল, আয়াত:১১)

এর পরবর্তী আয়াতে আরেকটি নিয়ামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা মুসলিমদের উহুদ যুদ্ধের সময়ও দেওয়া হয়েছিল। তা হলো, যুদ্ধের ময়দানে ফেরেশতাদের মাধ্যমে মুসলিমদের সাহায্য প্রদান। আল্লাহ তা'আলা বদর যুদ্ধে মুজাহিদদের সাহায্যের জন্য পাঠানো ফেরেশতাদের সম্পর্কে বলেন,

اِذْ يُوْحِيْ رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰٓئِكَةِ اَنِّيْ مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ سَاُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ۝

স্মরণ করুন, যখন আপনার প্রতিপালক ফেরেশতাদের ওহীর মাধ্যমে হুকুম দিলেন, আমি তোমাদের সাথে আছি, কাজেই তোমরা মুমিনদের দৃঢ়পদ রাখো। আমি অবশ্যই কাফেরদের মনে ভীতি সঞ্চার করবো। সুতরাং তোমরা তাদের ঘাড়ের উপর আঘাত করো এবং তাদের মধ্য থেকে আঙুলের জোড়াসমূহে আঘাত করো। (সূরা আনফাল, আয়াত:১২)

এখানে ফেরেশতাদের দুটি দায়িত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এক. মুসলিমদের সাহস বৃদ্ধি করে ময়দানে দৃঢ় রাখা। দুই. কিতালে অংশগ্রহণ করা। ফেরেশতাগণ এ উভয় কাজই সুচারুরূপে আনজাম দিয়েছিলেন।

এই যুদ্ধ মূলত কুফর ও ইসলামের মধ্যকার যুদ্ধ ছিল। কাফেরদের আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরোধিতাই এ যুদ্ধের মূল কারণ ছিল। সে জন্য এ যুদ্ধের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে,

TOP

যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরোধিতা করে, তাদের পরিণাম তেমন শোচনীয়ই হয়ে থাকে, যেমনটি মক্কার কাফেরদের হয়েছিল। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَآقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ وَمَنْ يُّشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ○

ذٰلِكُمْ فَذُوْقُوْهُ وَاَنَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابَ النَّارِ ○

তা এ জন্য যে, তারা আল্লাহ ও তার রাসুলের বিরোধিতায় লিপ্ত হয়েছে। আর যে আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরোধিতায় লিপ্ত হয়, নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠিন আযাবদানকারী। সুতরাং এর মজা ভোগ করো। নিশ্চয়ই কাফেরদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আযাব। (সূরা আনফাল, আয়াত:১৩-১৪)

সকালবেলা উভয়দল যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। টিলার আড়াল থেকে কুরাইশ সৈন্যরা বের হয়ে এলো। অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সহস্রাধিক কুরাইশ সৈন্য রণাঙ্গনে সদম্ভে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেল। লৌহবর্মে আচ্ছাদিত শতাধিক অশ্বারোহী সেনাপতির হুকুমের প্রতীক্ষা করতে লাগলো। সেনাপতি ও কবিরা কুরাইশ জোয়ানদের মুসলিম মুজাহিদদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে লাগলো।

অপরপক্ষে মুসলিমদের মাত্র ৩১৩ জন পদাতিক মুজাহিদ ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে ময়দানের অপরপ্রান্তে সমবেত। অস্ত্র ও বাহ্যিক সরঞ্জামের দিক দিয়েও তারা অত্যন্ত দুর্বল। তবু তারা ভীত নন। কারণ, আল্লাহ তা'আলার উপর তাদের অটল বিশ্বাস হলো, আল্লাহ তাদের অবশ্যই জয়ী করবেন। আল্লাহর সাহায্য তাদের সাথে আছে। আল্লাহর উপর এ বিশ্বাস ও ভরসাই তাদের মূল শক্তি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন, আয় আল্লাহ, বিজয়ের যে ওয়াদা আপনি আমার সাথে করেছেন, তা আজ পূর্ণ করুন। দু'আ শেষে জিবরাইল আলাইহিস

TOP

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

সালামের পরামর্শে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন মুষ্টি বালু ও কংকর নিয়ে কাফেরদের ডানে-বায়ে ও মধ্যখানে নিক্ষেপ করলেন। আল্লাহ তা‘আলা নিজ কুদরতে বালুর কণাগুলো কাফেরদের চোখে ঢুকিয়ে দিলেন। এ ঘটনার বর্ণনা নিম্মোক্ত আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى ۚ

(হে নবী,) আপনি যখন (মাটি) নিক্ষেপ করেছেন, তখন তা আপনি নিক্ষেপ করেননি, বরং আল্লাহ নিক্ষেপ করেছেন। (সূরা আনফাল, আয়াত:১৭)

চোখে বালুকণা ঢুকায় শত্রু সেনারা ভড়কে গিয়ে শোরগোল শুরু করে দিল। এ সুযোগে মুজাহিদগণ শত্রুবাহিনীর উপর ব্যাপক হামলা শুরু করেন। ফেরেশতাগণও মুজাহিদদের সাথে যোগ দিলেন। শত্রু সেনাদের বাহিনী প্রধান আবু জাহেল সহ সত্তরজন নিহত হলো এবং সত্তরজন বন্দি হলো। অন্যরা পালিয়ে জান বাঁচালো।

কুরাইশী বাহিনী মক্কা থেকে বের হওয়ার পূর্বে উক্ত বাহিনীর প্রধান আবু জাহেল কাবা শরীফের গিলাফ ধরে দু‘আ করেছিল। দু‘আর মধ্যে সে বলেছিল, ‘আয় আল্লাহ, দুই লশকরের মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠ, হেদায়েতপ্রাপ্ত, ভদ্র এবং যাদের ধর্ম উত্তম, তাদের বিজয় দান করুন।’

আবু জাহেল মনে করেছিল, মুসলিমদের তুলনায় তারাই সবদিক দিয়ে উত্তম। তাই সে হক ও বাতিলের মধ্যে ফায়সালার দায়িত্ব আল্লাহ তা‘আলার উপর ন্যস্ত করলো। সে ভেবেছিল, যেহেতু তারা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই বিজয় তাদেরই হবে। আল্লাহর তা‘আলার কাছে হক ও বাতিলের মধ্যে ফায়সালার সিদ্ধান্ত প্রার্থনার উক্ত ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

اِنۡ تَسۡتَفۡتِحُوۡا فَقَدۡ جَآءَكُمُ الۡفَتۡحُ ۚ وَ اِنۡ تَنۡتَهُوۡا فَهُوَ خَيۡرٌ لَّـكُمۡ ۚ وَ اِنۡ تَعُوۡدُوۡا نَعُدۡ ۚ وَلَنۡ تُغۡنِىَ عَنۡكُمۡ فِئَتُكُمۡ شَيۡـًٔا وَّلَوۡ كَثُرَتۡ ۙ وَ اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ۝

(হে কাফেররা,) যদি তোমরা মীমাংসা কামনা করো, তবে নিঃসন্দেহে মীমাংসা তোমাদের নিকট এসে গেছে। এখন যদি তোমরা নিবৃত্ত হও, তবে তা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে। আর যদি পুনরাবৃত্তি করো, তা হলে আমরাও পুনরাবৃত্তি করবো। তোমাদের দল তোমাদের কোন কাজে আসবে না, তা যত বেশিই হোক। জেনে রেখো, আল্লাহ মুমিনদের সাথে আছেন। (সূরা আনফাল, আয়াত:১৯)

উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সত্য-মিথ্যার মীমাংসা নির্ণয় করে দিয়েছেন- ঈমানদারদের পথই হলো সত্য পথ এবং কাফেরদের পথ হলো মিথ্যা। তাই আল্লাহ তা'আলা ঈমানদের সাথে আছেন। এ জন্য আল্লাহ তা'আলা তাদের বিজয়ী করবেন, কাফেরদের দলবল যত বেশিই হোক। অতএব, কাফেররা সর্বশক্তি নিয়োগ করেও দুনিয়ার বুক থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনীত দীন ইসলাম নিশ্চিহ্ন করতে পারবে না। বরং ইসলামের নূরকে আল্লাহ তা'আলা পূর্ণতায় পৌঁছাবেন।

বদর যুদ্ধের এই অভাবনীয় ফল লাভের মধ্যে যেমনিভাবে কাফেরদের জন্য শিক্ষা রয়েছে, তেমনি মুমিনদের জন্য রয়েছে উপদেশ। তা হলো, মুমিনদের বিজয়ের জন্য সেনাবাহিনীর সংখ্যার আধিক্য কিংবা অস্ত্রশস্ত্রের চাকচিক্য শর্ত নয়, বরং মুমিনদের বিজয়ের জন্য শর্ত হলো, তাদের খাঁটি মুমিন হতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَا تَهِنُوۡا وَلَا تَحۡزَنُوۡا وَاَنۡتُمُ الۡاَعۡلَوۡنَ اِنۡ كُنۡتُمۡ مُّؤۡمِنِيۡنَ۝

হীনমন্য হয়ো না এবং পেরেশানী করো না, তোমরাই বিজয়ী হবে, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত:১৩৯)

এ আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, যতদিন মুসলিম উম্মাহ আল্লাহ তা'আলার খাঁটি ঈমান ধারণ করে তার উপর তাওয়াক্কুল করবে,

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

ততদিন তারা বিজয়ী হবে। তখন কাফেরদের পারমাণবিক বোমাও মুসলিমদের পরাজিত করতে পারবে না। কাফের-বেদীনদের মোকাবেলায় মুসলিম বাহিনীর বিজয় অর্জনের এটাই চাবিকাঠি।

গাযওয়ায়ে আহযাব

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا هٰٓؤُلَآءِ اَهْدٰى مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبِيْلًا ○ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ ؕ وَمَنْ يَّلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ نَصِيْرًا ○

আপনি কি তাদের দেখেননি, যারা কিতাবের কিছু অংশ প্রাপ্ত হয়েছে যে, তারা প্রতিমা ও শয়তানকে মান্য করছে এবং কাফেরদের বলছে, এরা মুমিনদের তুলনায় অধিকতর সরল সঠিক পথে রয়েছে? এরাই সেই লোক, যাদের আল্লাহ তা'আলা লানত করেছেন। আর আল্লাহ তা'আলা যাকে লানত করেন, আপনি কখনও তাদের কোন সাহায্যকারী পাবেন না। (সূরা নিসা, আয়াত:৫১-৫২)

এ আয়াতে গাযওয়ায়ে আহযাব বা খন্দকের জিহাদ-সংশ্লিষ্ট প্রেক্ষাপট সম্পর্কে ইঙ্গিত করা হয়েছে। মদীনা থেকে বিতাড়িত ইহুদী বনু নাযির সম্প্রদায় মক্কার কাফেরদের সাথে হাত মিলিয়ে তাদের প্রতি মিথ্যা তোষামোদ দেখিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফেরদের উত্তেজিত করেছিল সেসম্পর্কে এখানে আলোকপাত করা হয়েছে।

সূরা আহযাবে গাযওয়ায়ে আহযাব বা খন্দকের যুদ্ধের বিভিন্ন অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। হাদীস শরীফে উক্ত জিহাদের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। কুরআন ও হাদীসের আলোকে নিম্নোক্তগাযওয়ায়ে আহযাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছে।

গাযওয়ায়ে আহযাব-এর বিবরণ

কুরাইশরা উহুদ থেকে ফিরে যাওয়ার আগে মুসলিমদের বিরুদ্ধে দম্ভভরে জানিয়ে গিয়েছিল, আগামী বছর বদরপ্রান্তরে তোমাদের

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

সাথে আবার মোকাবেলা হবে। কিন্তু নিজেদের দুর্বলতা উপলব্ধি করে পরবর্তী বছর বদরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেও রাস্তা থেকেই তারা ফিরে গিয়েছিল।

তৎকালীন মক্কার কাফেরদের সরদার আবু সুফিয়ান বুঝতে পেরেছিল, উহুদের মত স্বল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে মুসলিমদের পরাজিত করা সম্ভব নয়। তাদের পরাজিত করতে হলে ব্যাপক ও শক্তিশালী বাহিনীর প্রয়োজন। তাই তারা সারা আরববাসীকে কীভাবে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টা করতে লাগলো।

অন্যদিকে বনু নাযীরের ইহুদীরা মদীনা থেকে বিতাড়িত হয়ে খায়বারে এসে বসতি স্থাপন করেছিল। সেখানে তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র স্থাপন করে। এ সময় তারা সিদ্ধান্ত নিলো, মক্কায় গিয়ে কুরাইশদের মুহাম্মাদ-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। পরে একযোগে হামলা চালিয়ে মুসলিমদের একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে।

সেই মোতাবেক হুয়াই ইবনে আখতাব, সাল্লাম ইবনে আবুল হুকাইক, কিনানা ইবনে রবী প্রমুখ ইহুদী সরদার মক্কায় গিয়ে কুরাইশদের মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে উদ্বুদ্ধ করতে লাগলো। তারা বললো, ভয় করবেন না। আমরা আপনাদের সাথেই আছি। আমরা মুহাম্মাদকে ধ্বংস করেই তবে দম নিব। সেজন্য আমরা আপনাদের সাথে চুক্তি করতে এসেছি। তখন তারা এ কথাও বললো, আপনারাই বাস্তবে সত্যের উপর আছেন।

এ কথা শুনে কুরাইশরা উত্তেজিত হয়ে উঠলো। তাদের মধ্যে নতুন করে শক্তি ও সাহস সঞ্চার হলো। ক্রমশ তাদের মধ্যকার চাপা ক্রোধ ও ক্ষোভের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো।

TOP

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

ফলে তারা ইহুদীদের খুব খাতির-তোয়াজ করলো। তারপর আনন্দে-আহলাদে আটখানা হয়ে তাদের বললো, হ্যাঁ, আমরা তো এটাই চাই। মুহাম্মাদের শত্রুরাই আমাদের বন্ধু। এবার তা হলে আমরা সবাই একসাথে মিলে তার দর্প চূর্ণ করে দিতে পারবো।

এরপর কুরাইশরা বললো, ভাইসব, আগে থেকেই তো আপনাদের কাছে আসমানি কিতাব আছে। মুহাম্মাদের সাথে আমাদের দ্বন্দ্ব রয়েছে, তা আপনারা জানেন। কিন্তু আপনারা যে বললেন, আমরাই সত্যের উপর আছি, অনুগ্রহ করে খুলে বলবেন কি যে, আমাদের ধর্ম ঠিক নাকি মুহাম্মাদের ধর্ম ঠিক?

তখন হতভাগ্য মিথ্যুক ইহুদীরা বললো, তাওবা তাওবা! তোমাদের ধর্মের সাথে কি তার ধর্মের কোন তুলনা হতে পারে? তোমরাই প্রকৃত সত্যের উপর আছ। তোমাদের ধর্মই মুহাম্মাদের ধর্ম থেকে উৎকৃষ্ট।

এদের এ মন্তব্য সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের উক্ত আয়াতে বলেছেন। আর তাদের এ মিথ্যা কথার কারণে তাদের উপর লানত করেছেন।

এভাবে ইহুদীরা কুরাইশদের সাথে উত্তেজনাকর কথাবার্তা বলতে লাগলো। কুরাইশদের সাথে ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা কথা বলে তাদের উত্তেজিত করে তুললো। পরিশেষে কুরাইশরা ইহুদীদের ধোঁকাবাজিতে পড়ে ক্রোধে অন্ধ হয়ে বলতে লাগলো, আমাদের শরীরের শেষ রক্তবিন্দুটুকু দিয়ে হলেও আমরা মুহাম্মাদের সাথে লড়বো। মুহাম্মাদের ধর্ম আমরা কিছুতেই ছড়িয়ে পড়তে দিব না। মুহাম্মাদের কবল থেকে দুনিয়াকে আমরা রক্ষা করবোই। তার ধর্মের নাম-নিশানা মিটিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত আমরা থামব না।

কুরাইশদের সমর্থন পেয়ে এবার বনী নাযীরের ইহুদীরা গাতফানীদের নিকট গমন করলো। তাদের লোভ দেখালো যে, তোমরা যদি

আমাদের সাথে যোগ দাও, তা হলে খায়বারে উৎপাদিত শস্যের অর্ধেক তোমাদেরদের দিব।

গাতফানীরা পূর্ব থেকেই মুসলিমদের চরম শত্রু ছিল। বীরে মাউনার ঘটনায় যে সত্তরজন কারী-আলেম সাহাবী শহীদ হয়েছিলেন, এর পিছনে তাদেরই ষড়যন্ত্র ছিল। তাই ইহুদীদের প্রস্তাব পেয়ে তারা সাথেসাথে রাজি হয়ে গেল।

ওদিকে বনু আসাদ গোত্র গাতফান গোত্রের সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিল। সে কারণে তারাও গাতফানদের আহ্বানে বেরিয়ে পড়লো। আবার বনু সুলাইম গোত্রের সাথে কুরাইশদের আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকায় তারাও কুরাইশদের সঙ্গী হলো। তেমনিভাবে বনু সাদ গোত্র ইহুদীদের সাথে চুক্তিবদ্ধ থাকায় তারাও আর বসে থাকতে পারলো না। সম্মিলিত মুসলিমবিরোধী বাহিনীতে যোগ দিল।

মোটকথা, এবার সমগ্র আরব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে একজোট হলো। সবাই নিজেদের শয়তানি পরিকল্পনা ও অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে ইসলামের দীপ্তিময় আলো চিরতরে নিভিয়ে দেওয়ার জন্য ঐক্যবদ্ধ হলো।

সর্বপ্রথম আবু সুফিয়ান তিনশ ঘোড়া, একহাজার উট, চার হাজার কুরাইশ সৈন্য নিয়ে মক্কা ত্যাগ করলো। তারা যখন ‘মাররুয যাহরান’নামক স্থানে পৌঁছালো, তখন গাতফান, আসাদ, ফাযারা, আশজা, মুররা প্রভৃতি গোত্রের সৈন্যরা এসে তাদের সাথে যোগ দিল। এতে মোট সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ালো দশ হাজার।

সমস্ত সৈন্য তিন ভাগে বিভক্ত করা হলো। আবু সুফিয়ান কুরাইশদের, উয়াইনা ইবনে হিস্ন গাতফানীদের এবং তুলায়হা আসাদ গোত্রের সেনাপতি মনোনীত হলো। আবু সুফিয়ান হলো কমান্ডার ইন চিফ। আর অন্য সৈন্যরা এই তিন বাহিনীর মধ্যে ভাগ হয়ে গেল।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

মুসলমানদের ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন করতে দশ হাজারের অধিক রক্তপিপাসু দুর্ধর্ষ এই ইহুদী ও কুরাইশ-পৌত্তলিকের যৌথবাহিনী মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলো।

রাসূলুল্লাহর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা: পরিখা খনন

ইসলামের বিরুদ্ধে যৌথ বাহিনীর এ অভিযানের সংবাদ যথাসময়ে মদীনায় পৌঁছে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসম্পর্কে পরামর্শ করার জন্য বিশিষ্ট সাহাবীদের এক পরামর্শসভা আহ্বান করলেন।

উক্ত সভায় এ পরিস্থিতিতে করণীয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হলো। এবার শত্রুদের প্রতিরোধ করার জন্য মদীনার বাইরে যাওয়া সমীচীন হবে, নাকি ভিতরে থেকেই প্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে- এসম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করা হলো। পরিশেষে সিদ্ধান্ত হলো, মদীনায় থেকেই তাদের মোকাবেলা করা হবে।

তখন হযরত সালমান ফারসী রা. (যিনি পূর্বে পারস্যবাসী ছিলেন) পারস্যের লোকদের এক অভিনব প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থার বিবরণ প্রস্তাবরূপে পেশ করলেন। তিনি বললেন, মদীনার যে দিকটি অরক্ষিত, সেদিকে গভীর খন্দক বা পরিখা খনন করলে ভালো হয়। যাতে শত্রুসৈন্যরা তা পার হয়ে শহরে ঢুকতে না পারে।

তার এই নতুন পরিকল্পনা সকলে পছন্দ করলেন। আরববাসীরা যুদ্ধের এই অভিনব ব্যবস্থাপনা আগে কোনদিন শোনেনি। তাই তারা খুব বিস্মিত হলেন এবং তা সাদরে গ্রহণ করলেন।

মদীনার তিন পাশে ছিল ঘরবাড়ি ও খেজুর বাগান। তাতে সাধারণভাবে শহর রক্ষার কাজ হতো। একমাত্র সিরিয়ার দিকটি খোলা ছিল। সেদিকে ছিল সালা পাহাড়। সুতরাং সালা পাহাড়কে ভেতরে রেখে তার বাইরের দিকে পরিখা খননের সিদ্ধান্ত হলো।

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

পঞ্চম হিজরির যিলকদ মাসের ৮ তারিখে এই খনন কাজ শুরু হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাজের শৃঙ্খলার জন্য সাহাবীদেরকে দশজনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত করে দিলেন। সেই সাথে খননের জন্য প্রত্যেক দলকে দশ গজ করে চিহ্নিত করে দিলেন। পরিখার দৈর্ঘ্য পূর্ব হাররা হতে পশ্চিম হাররা পর্যন্ত প্রায় তিন হাজার গজ। লাফ দিয়ে ঘোড়া পার না হতে পারে সেই পরিমাণ প্রস্থ রাখা হয়েছিল। আর গভীরতা করা হয়েছিল পাঁচ গজ ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন আদর্শ আমীর। যেকোন কাজে সবার সাথে শরীক হয়ে সহকর্মী হওয়া ছিল তাঁর মহান গুণ। তাই মসজিদে নববীর ন্যায় এখানেও তিনি ঝুড়ি-কোদাল হাতে নিয়ে খনন কাজে যোগ দিলেন।

মাটিতে সর্বপ্রথম তিনি যখন কোদাল ফেললেন, তখন মুখে উচ্চারণ করলেন,

بسم الله ربنا بدينا ولو عبدنا غيره شقينا حبذا ربا وحبذا دينا

‘আল্লাহর নামে এ খননটি শুরু করছি। যদি আমরা তার ব্যতীত আর কারো ইবাদত করতাম, তা হলে বড় দুর্ভাগা হতে হতো। কত উত্তম রব তিনি, কত উত্তম তার দেওয়া এ দীন। (আল রউযুল উনুফ, ৩:১৮৯; ফাতহুল বারী, ৭:৩০৪)

তখন ছিল শীতকাল। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বাতাস বইছিল। আনসার ও মুহাজির সাহাবীগণ একান্ত আগ্রহ ও মনোযোগের সাথে খন্দক খুঁড়ে চলছিলেন। তারা গর্ত থেকে মাটি উঠাতে থাকেন এবং সাথে সাথে বলতে থাকেন,

نحن الذين بايعوا محمدا+ على الجهاد ما بقينا ابدا

‘আমরা হলাম সেই সেনাদল, যারা কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে হাত রেখে জিহাদের বাই‘আত-অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছি। যতদিন আমাদের দেহে প্রাণ থাকবে, ততদিন আমরা এ বায়আতে অটুট থাকব।’

TOP

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এ কথার জবাবে বললেন,

اللّٰهُمَّ ان العيش عيش الاخرة + فاغفر للانصار والمهاجرة

'আয় আল্লাহ, সত্যিকারের জীবন তো আখিরাতের জীবন। আপনি মেহেরবানী করে আনসার ও মুহাজিরদের সকল গুনাহ মাফ করে দিন।'

হযরত বারা ইবনে আযেব রা. বলেন, খন্দক খননের দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাটি তুলে দূরে ফেলতে থাকেন। এমনকি এতে তার পবিত্র দেহ মোবারক ধুলোয় ধূসরিত হয়ে যায়। তিনি তখন বলছিলেন,

والله لو لا انت ما اهتدينا + ولا تصدقنا ولا صلينا

فانزلن سكينة علينا + وثبت الاقدام ان لاقينا

ان الالى قد بغوا علينا + اذا ارادوا فتنة ابينا

'আল্লাহর কসম, হে আল্লাহ, যদি আপনি না থাকতেন, তা হলে আমরা হেদায়েত পেতাম না। আর না আমরা সদকা করতাম এবং না নামায পড়তাম। (আয় আল্লাহ,) আমাদের উপর রহমতের সাকিনা নাযিল করুন এবং শত্রুর সাথে মোকাবেলা হলে তাতে আমাদের পাগুলো দৃঢ়-অবিচল রাখুন। পৌত্তলিকরা আমাদের উপর জুলুমের খড়গ হেনেছে। তারা আবার যদি আমাদের মধ্যে কোন ফেতনা সৃষ্টি করতে চায়, আমরা তা হতে দিব না।'

এই শেষ শব্দ "ابين, ابينا" (অর্থাৎ 'আমরা হতে দিব না', 'আমরা হতে দিব না'কথাটি) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম উচ্চস্বরে বারবার বলছিলেন আর তখন সাহাবায়েকেরামও তার সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে বলছিলেন, "ابين, ابينا "আমরা তা হতে দিব না, আমরা তা হতে দিব না।

পরিখা খননের সময় মুজিযার প্রকাশ

প্রখ্যাত সীরাত ও মাগাযী বিশেষজ্ঞ আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক রহ. বলেন, পরিখা খননকালে ঘটে যাওয়া বহু ঘটনা আমি শুনেছি। যা আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হতে তার রাসূলের সমর্থন ও তার নবুওয়্যাতের প্রত্যয়নকল্পে সংঘটিত হয়েছিল। সেসব ঘটনা সাহাবীগণ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তার মধ্য হতে কয়েকটি ঘটনা নিম্নরূপ।

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. বলেন, একটা বৃহদাকার শক্ত পাথর সাহাবীগণের পরিখা খননে সমস্যা সৃষ্টি করছিল। তারা বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবহিত করেন।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি পাত্রে পানি আনতে বললেন। পানি আনা হলে তিনি তাতে থুথু ফেলে আল্লাহর দরবারে খুব দু‘আ করলেন। তারপর উক্ত পাথরে সেই পানি ঢেলে দিলেন। সেখানে উপস্থিত লোকেরা বলেন, ‘আল্লাহর কসম, যিনি তাকে সত্য নবী করে পাঠিয়েছেন, পানি ঢালামাত্র পাথরটি নরম বালুর স্তূপে পরিণত হলো।

ইবনে ইসহাক রহ. বলেন, সায়িদ ইবনে মিনা রহ. আমার কাছে বর্ণনা করেন, বাশির ইবনে সা‘দ-এর কন্যা (প্রখ্যাত সাহাবী নোমান ইবনে বাশির রা. এর বোন) বলেন (তখন তিনি ছোট ছিলেন), ‘আমার মা বিনতে রাওয়াহা আমাকে ডেকে আমার কাপড়ে এক মুষ্টি খেজুর ঢেলে দিলেন। তারপর বললেন, আমার প্রিয় কন্যা, তুমি এগুলো তোমার পিতা ও তোমার মামা আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার কাছে নিয়ে যাও। তারা এ দিয়ে দুপুরের আহার করবেন। আমি সেগুলো নিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। আমি তাদের খোঁজাখুঁজি করছি, এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমার দেখা হলো। তিনি বললেন, ‘খুকি, এদিকে এসো! তোমার কাছে এগুলো কী?’আমি বললাম, আল্লাহর রাসূল, এগুলো খেজুর। আমার মা এগুলো আমার পিতা বাশির ইবনে

সা'দ ও মামা আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার কাছে পৌঁছানোর জন্য পাঠিয়েছেন। তারা তা দিয়ে দুপুরের আহার করবেন।' এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ওগুলো আমার কাছে দাও। তখন আমি তা তার হাতে তুলে দিলাম। কিন্তু পরিমাণে তা এতই কম ছিল যে, তার হাত ভরলো না।

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কাপড় বিছাতে বললেন। কাপড় বিছানো হলো। তিনি খেজুরগুলো সেই কাপড়ের উপর ছড়িয়ে দিলেন। তারপর পাশে উপস্থিত একজনকে বললেন, পরিখা খননকারী সকলকে ডাকো, তারা দুপুরের আহার সেরে যাক।

কিছুক্ষণের মধ্যে সকলে উপস্থিত হলেন এবং সেখান থেকে খেজুর খাওয়া শুরু করলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তারা যতই খেজুর খাচ্ছিলেন, খেজুর ততই বাড়ছিল। অবশেষে পরিখা খননকারী সকলে যখন পেট পুরে খেয়ে উঠলেন, তখনও কাপড়ের চারপাশে খেজুর উপচে পড়ছিল। সুবহানাল্লাহ !!!

ইবনে ইসহাক রহ. বলেন, আমার কাছে সায়িদ ইবনে মিনা জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. এর সূত্রে বর্ণনা করেন, 'আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে খননে শরীক ছিলাম। আমার একটি ছোট ছাগল ছিল। তেমন মোটা-তাজা নয়। মনে মনে বললাম, এ ছাগল দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য আহারের ব্যবস্থা করলে ভালো হবে। আমি আমার স্ত্রীকে তা জানিয়ে তাকে খাবার আয়োজন করতে বললাম।

সে কিছু যব পিষে রুটি তৈরি করলো এবং আমি ছাগলটি জবাই করলাম। আমরা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য ছাগলটি ভুনা করলাম।

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

খনন কাজে আমাদের নিয়ম ছিলো, দিনভর কাজ করতাম এবং সন্ধ্যা হলে বাড়িতে ফিরে আসতাম। সেদিন সন্ধ্যাবেলা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিখাস্থল হতে প্রস্থান করতে যাচ্ছিলেন, তখন আমি বললাম, আল্লাহর রাসূল, আমার একটি ছোট ছাগল ছিল, সেটি আপনার জন্য ভুনা করেছি, আর কিছু যবের রুটি তৈরি করেছি। আশা করি, আপনি আমার বাড়িতে যাবেন।

জাবের রা. বলেন, আমার ইচ্ছা ছিল নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাই আসবেন। কিন্তু আমি একথা বলামাত্র তিনি বললেন, অবশ্যই। তারপর একজনকে নির্দেশ দিলেন, সকলকে ডাক দিয়ে বলো, তোমরা আল্লাহর রাসূলের সাথে জাবের ইবনে আবদুল্লাহর বাড়িতে দাওয়াত খেতে চলো। আমি পেরেশান হয়ে গেলাম।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকলকে নিয়ে আমার বাড়ি এলেন। তারা এসে বসার পর আমরা উক্ত খাদ্য দ্রব্য তার সামনে বের করলাম। তিনি বিসমিল্লাহ বলে খাওয়া শুরু করলেন। স্থান সংকুলান হচ্ছিল না বিধায় পালাক্রমে একদল করে এসে খেয়ে যাচ্ছিলেন। এভাবে পরিখা খননকারী সকল সাহাবীই সেই খাবার তৃপ্তিসহকারে খেলেন। তারপরও তার কিছু অংশ রয়ে গিয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘এ খাবার তোমাদের (ঘরওয়ালাদের) জন্য।’

ইবনে ইসহাক রহ. বলেন, আমি শুনেছি, সালমান রা. বলেন, আমি পরিখার একপ্রান্তে খননকার্যে লিপ্ত ছিলাম। সহসা একটি কঠিন পাথর আমার সামনে পড়লো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছেই ছিলেন। তিনি দেখলেন, আমি বারবার কোদাল মারছি, কিন্তু পাথরটার কোন কিনারা করতে পারছি না।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে আমার হাত থেকে কোদাল নিয়ে পাথরটার উপর সজোরে তিনবার আঘাত

TOP

করলেন। দেখলাম প্রতিবারই পাথর থেকে আলোর ঝলক বের হলো। আমি বললাম, আল্লাহর রাসূল, আপনার উপর আমার পিতামাতা কুরবান হোক, আপনি আঘাত করার সময় প্রতিবারই যে আলোর ঝিলিকের বিচ্ছুরণ হয়, এর কারণ কী? তিনি বললেন, তুমি কি এটা দেখেছ, হে সালমান? আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি দেখেছি। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, প্রথম ঝলকে আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য ইয়ামানের চাবি আমাকে প্রদান করেন এবং তার বিজয়ের ইঙ্গিত দেন। দ্বিতীয় ঝলকে শাম ও পশ্চিম দেশের চাবি আমাকে প্রদান করেন এবং তৃতীয় ঝলক দ্বারা পূর্বদেশের চাবি আমাকে দেন এবং এসব দেশ বিজয়ের ইঙ্গিত দেন।

ইবনে ইসহাক রহ. বলেন, হযরত আবু হুরায়রা রা. এর সূত্রে এমন একব্যক্তি আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, যার বিশ্বস্ততায় আমার কোন সন্দেহ নেই, তিনি বলেন, হযরত উমর রা. ও হযরত উসমান রা. এবং তাদের পরবর্তী খলীফার যুগে যখন এসব দেশ বিজিত হয়, তখন আবু হুরায়রা বলতেন, তোমরা যা ইচ্ছা জয় করতে থাকো। আল্লাহর কসম, যার হাতে আবু হুরায়রার প্রাণ, তোমরা যেসব দেশ জয় করেছ এবং কিয়ামত পর্যন্ত আরও জয় করবে, তার চাবি আল্লাহ তা'আলা পূর্বেই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে অর্পণ করেছেন। (সীরাতে ইবনে হিশাম)

পরিখা তৈরি হয়ে গেল

আল্লাহ তা'আলার খাস রহমতে সাহাবীগণের বিরামহীন মেহনতের ফলে মাত্র ছয় দিন মতান্তরে বিশ দিনে প্রায় তিন হাজার গজ লম্বা ও পাঁচ গজ গভীর পরিখা খননের কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে কাফের বাহিনীর মোকাবেলার জন্য বিন্যস্ত করেন।

জিহাদে এ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

TOP

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

وَ اَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَ اٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ

তোমরা কাফেরদের মোকাবেলায় প্রস্তুতি গ্রহণ করো, যারা সক্ষমতা রাখো শক্তি-সামর্থের মধ্য থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে। এগুলোর দ্বারা তোমরা ভীত-সন্ত্রস্ত কর আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদের এবং তাদের ছাড়াও অন্যদের। (সূরা আনফাল, আয়াত:৬০)

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের কাফেরদের মোকাবেলা করার জন্য নিজেদের সবরকম শক্তি-সামর্থ্যের ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আলোচ্য গাযওয়ায়ে আহযাবে পরিখা খনন এ সামর্থের ব্যবস্থারই অংশ ছিল।

বস্তুত আরবদের মাঝে পরিখা খনন করার কোন প্রচলন ছিল না। এটি ছিল পারস্য এলাকায় প্রচলিত পদ্ধতি। পারস্যরাজ মনুশাহর ইবনে উবাইরিজ ইবনে আফরিদুন সর্বপ্রথম এই পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সালমান ফারসী রা. এর পরামর্শ অনুযায়ী পরিখা খননের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

এতে একটি বিষয় সুস্পষ্ট হয় যে, প্রয়োজন হলে, অমুসলিমদের বৈধ যুদ্ধরীতি অনুসরণ করে যুদ্ধ করা ইসলামী আইনে অনুমোদিত। তেমনি কাফেরদের উদ্ভাবিত যাবতীয় অস্ত্র ব্যবহার করাও জায়েয।

এ ভিত্তিতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফের যুদ্ধে কাফেরদের উদ্ভাবিত অস্ত্র মিনজানিক (ঐ যুগের কামান) ব্যবহার করেছেন এবং হযরত উমর রা. খলীফা থাকাকালে হযরত আবু মুসা আশআরী রা. কে তুসতার শহরের কেল্লা অবরোধকালে মিনজানিক ব্যবহারের নির্দেশ দেন। তেমনি হযরত আমর ইবনুল আস রা. যখন আলেকজান্দ্রিয়া শহর অবরোধ করেন তখন তিনি মিনজানিক ব্যবহার করেন। তেমনিভাবে বিষযুক্ত তরবারি ব্যবহারও (অমুসলিম রীতি হওয়া সত্ত্বেও) জায়েয।

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

এ আলোচনা দ্বারা এ কথাই প্রতীয়মান হয়, যে সকল পদ্ধতি দ্বারা আল্লাহর ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের শত্রুরা নিপাত হয় এবং আল্লাহর দীনের প্রাবল্য ও বিজয় সূচিত হয় সেসব কৌশল ও অস্ত্র ব্যবহারের রীতি শিক্ষা করা আবশ্যক।

এ কারণেই ইসলামী শরী‘আত কোন কারিগরি ও প্রযুক্তিগত উন্নতিতে বাধা তো প্রদান করেই না, বরং যে সকল প্রযুক্তি ও কারিগরি দ্বারা দেশের উন্নতি ও উন্নয়ন সাধিত হয়, সেগুলো অর্জন করা ফরযে কিফায়া বলে সাব্যস্ত করেছে। সকল ফকীহ ও আলেম এ বিষয়ে মতৈক্য পোষণ করেন।

কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, অমুসলিমদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প ইত্যাদিও অনুসরণীয়। বিশেষত বর্তমান পাশ্চাত্যের শিক্ষা ও শিল্প-সংস্কৃতির নামে যে নির্লজ্জতা, বেহায়াপনা, নগ্নতা ও অবাধ যৌনাচারের ছড়াছড়ি চলছে, ইসলাম তা মোটেই অনুমোদন করে না। বরং তার কঠোর বিরোধিতা করে। কেননা, এ সকল অপকর্মের দ্বারা স্বভাব-চরিত্রের বিনাশ ও ধ্বংস সাধন, মানবীয় সুকুমারবৃত্তির অপমৃত্যু এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের অধঃপতন বৈ কোনই উপকার সাধিত হয় না।

মুসলিম বাহিনীর প্রস্তুতি

খন্দক যুদ্ধে কাফেরদের মোকাবেলায় মদীনার বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। এ জন্য একে গাযওয়ায়ে আহযাবও বলা হয়। আহযাব (احزاب)‘হিযবুন’(حزب) -এর বহুবচন। এর অর্থ হলো, বহু দল। তেমনিভাবে এতে আত্মরক্ষার জন্য পরিখা খনন করা হয় বিধায় একে খন্দক যুদ্ধও বলা হয়। খন্দক (خندق) অর্থ পরিখা।

শত্রুসৈন্য মদীনার উপকণ্ঠে পৌঁছার পূর্বেই পরিখার খনন কাজ সমাপ্ত হয়ে যায়। এরপর তাদের পৌঁছার পূর্বেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

TOP
Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com App Store

‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারী ও শিশুদের অপেক্ষাকৃত সুরক্ষিত ও নিরাপদ একটি দুর্গে স্থানান্তরিত করলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রা. কে মদীনার প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হলো।

বিশ্বাসঘাতক ইহুদীদের প্রতি আস্থা স্থাপনের কোন সুযোগই ছিল না। বনু কায়নুকা ও বনু নাযিরকে আগেই মদীনা থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল। এখন শুধু রয়ে গিয়েছিল বনু কুরাইযা। আগে তারা কয়েকবার চুক্তিভঙ্গ করে বিশ্বাসঘাতকতার চেষ্টা করেছে। এবারও সেই আশঙ্কা আছে। আর মুনাফিকরা তো আস্তিনের সাপ হিসেবে আছেই। এসব দিক লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুর্গের পাহারার জন্য যায়েদ ইবনে হারেসা রা. এর নেতৃত্বে তিনশ সৈন্য এবং মাসলামা ইবনে আসলাম রা. এর নেতৃত্বে দুইশ সৈন্য মোট পাঁচশত সৈন্যকে নিযুক্ত করলেন।

মুসলমানদের মোট সৈন্য সংখ্যা ছিল তিন হাজার। তার মধ্যে পাঁচশ এখানে মোতায়েন করার পর অবশিষ্ট আড়াই হাজার সৈন্য নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাহাড় পিছনে রেখে পরিখা সামনে রেখে শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করতে ব্যূহ রচনা করলেন।

শত্রুবাহিনীর অবস্থান

সে সময় শত্রুবাহিনীর একটি অগ্রগামী দলকে মদীনার নিকটবর্তী স্থানে দেখা গেল। তারা মুসলিমদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছে বলে মনে হলো।

কাফের দলের সরদার আবু সুফিয়ানের ইচ্ছা ছিল, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সে উহুদ প্রান্তরে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। সেখানে তার সাথে সাক্ষাত না হওয়ায় সে বাহিনীকে মদীনার দিকে চালিয়ে দেয়।

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

মদীনার নিকটবর্তী স্থানে পৌঁছে আবু সুফিয়ানের দল শিবির স্থাপন করলো। আবু সুফিয়ান ও আরো কয়েকটি গোত্র উহুদের নিকটবর্তী এক জায়গায় অবস্থান করতে লাগলো।

শত্রু বাহিনীর সেই ছোট দলটি মদীনার নিকটবর্তী হয়েই মুসলিমদের অবস্থা সম্পর্কে কিছুটা আঁচ করতে পারলো। তারা সেখানে পৌঁছে সম্পূর্ণ একটি নতুন জিনিস দেখলো। যা ছিল তাদের কল্পনার অতীত। তারা আশ্চর্য হয়ে মূল বাহিনীতে ফিরে গিয়ে অন্যান্য লোকদের এ সংবাদ জানিয়ে দিল। যে শুনলো, সে-ই হতবাক হয়ে গেল। তারা বলাবলি করতে লাগলো, এ তো দেখছি সম্পূর্ণ নতুন পরিকল্পনা। আরব দেশে তো এমন ব্যবস্থা কখনোই দেখা যায়নি!

শত্রুদের সাথে মুসলিম বাহিনীর মোকাবেলা

কুরাইশদের আগমনের সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে মুসলমানগণ তাদের ঘাঁটিতে সতর্ক হয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৈন্য বাহিনীকে কয়েকটি অংশে ভাগ করে দিয়েছিলেন। কিছু সৈন্যকে ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে পরিখা দেখা-শোনার কাজে নিয়োজিত করেছেন। আর পরিখার যে স্থানটিতে আক্রমণের আশঙ্কা বেশি ছিল সেখানে কিছু সৈন্য পাহারায় নিযুক্ত করে বাকি সৈন্য শত্রুর মোকাবেলায় সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। এদের সম্মুখভাগকে পরিখার দিকে মুখ করে মোতায়েন করা হয়। হাতে বর্শা, তীর, ধনুক ও কামান নিয়ে তারা সেখানে মোতায়েন রয়েছেন।

ইতোমধ্যে কাফেরবাহিনী সম্মুখে অগ্রসর হলো। এবার উভয়পক্ষই মুখোমুখি। কুরাইশরা পরিখা পার হওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করলো। কিন্তু পারলো না। এই ফাঁকে মুসলিমবাহিনী অনবরত তীর বর্ষণ করে কুরাইশ-বাহিনীকে নাজেহাল করে দিল। ফলে তারা পিছু হটতে লাগলো।

এভাবে যুদ্ধ চলতে চলতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। অতঃপর দু’পক্ষই যার যার শিবিরে ফিরে গেল।

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

পরদিন প্রত্যুষেই কুরাইশ বাহিনী পুনরায় পরিখা পার হওয়ার চেষ্টা করলো। কিন্তু মুসলিমবাহিনীর সুদৃঢ় প্রতিরোধের মুখে এবারও তারা ব্যর্থ হলো।

এ ব্যর্থতায় হতাশ হয়ে তারা ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলো। ব্যর্থতার বুঝা ঘাড়ে নিয়ে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে করতে তারা তাদের শিবিরে ফিরে গেল।

কাফেররা এবার স্পষ্ট বুঝতে পারলো, তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে চলেছে। মুসলিমদের মোকাবেলা করা সহজ নয়। ওদিকে হঠাৎ প্রচন্ড ঝড় ও তুফান শুরু হলো। সেই সাথে পড়লো হাড়কাঁপানো শীত। এই শীতে ও ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে কাফেরবাহিনী বরফের মত জমে যাচ্ছিল। তাই তারা ক্ষোভে ও ক্রোধে ফেটে পড়ছিল।

একদিকে বিরূপ আবহাওয়া, অন্যদিকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভূতপূর্ব রণকৌশল কুরাইশদের এই অভিযান ব্যর্থ করে দিল। হতাশার কালো মেঘ কুরাইশবাহিনীকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলো, এখন মুহাম্মাদকে কীভাবে পরাজিত করা সম্ভব?

শত্রুদের ভিন্ন পথ অবলম্বন

কাফের বাহিনীর নৈরাশ্যকর অবস্থার মুখে বনী নাযিরের সরদার হুয়াই বিন আখতাব আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লো। সেনাসংগ্রহের জন্য সে-ই সবচেয়ে বেশি উদ্যোগী ছিল। মানসিকভাবে সে খুব ভেঙ্গে পড়লো। সে ভীষণ ঘাবড়ে গেল।

অবশেষে হুয়াই চিন্তা করলো, সৈন্যরা যদি হতাশার কারণে বিদ্রোহ করে, তা হলে কী উপায় হবে? তখন তো সর্বনাশ হয়ে যাবে। সে জন্য অবিলম্বে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।

TOP

এ কথা চিন্তা করে সে আবু সুফিয়ানের কাছে এসে বললো, আমি চেষ্টা করলে মদীনায় বসবাসকারী বনু কুরাইযাকে মুহাম্মাদের সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করিয়ে আমাদের সাথে নিতে পারি। আর তুমি তো জানো, তাদের শক্তি ও সাহস কোন পর্যায়ের। আমার এ চেষ্টা সফল হলে মদীনার অভ্যন্তরে পৌঁছাও সহজ হয়ে যাবে। আবু সুফিয়ান বললো, তা হলে আর দেরি না করে যাও। গিয়ে বলো, মুহাম্মাদের সাথে শান্তি চুক্তি ভেঙ্গে দাও।

হুয়াই কালবিলম্ব না করে বনু কুরাইযার দিকে ছুটলো। বনু কুরাইযার সরদার কা'ব হুয়াইয়ের আগমনসংবাদ শুনেই দুর্গের দরজা বন্ধ করে দিল। সে তার মতলব টের পেয়ে গিয়েছিল। তাই তার সাথে সাক্ষাত করাটা মোটেই পছন্দ করলো না।

হুয়াই দুর্গের দরজায় পৌঁছে আওয়াজ দিল এবং দরজা খোলার জন্য বললো। আর সবাইকে আশ্বস্ত করার উদ্দেশে বললো, আমি জানি, তোমরা কেন দরজা বন্ধ করেছ। তোমরা ভাবছো, যদি আমি তোমাদের খাস পেয়ালায় শরীক হয়ে যাই! তার এ কথায় কা'ব লজ্জা পেল। তখন দরজা খুলে দিল।

হুয়াই বললো, দেখ কা'ব, আমি তোমার জন্য কত বড় মর্যাদাকর সুসংবাদ নিয়ে এসেছি। সমুদ্রের মত বিশাল এক বাহিনী নিয়ে এসেছি। সারা আরবভূমি উজাড় হয়ে এসেছে। কুরাইশ ও গাতফান গোত্রের সমস্ত নেতাও এসেছেন। সবার একটাই লক্ষ্য, তারা মুহাম্মাদের রক্ত পান করতে চায়। সবাই একমত যে, মুহাম্মাদকে সদলবলে নির্মূল করা ছাড়া শান্তির কোন পথ নেই।

কা'ব বললো, তুমি আমাকে বেইজ্জত করতে চাচ্ছ। আমি মুহাম্মাদের সাথে শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ। এ চুক্তি ভঙ্গ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। মুহাম্মাদ সর্বদাই আমাদের সাথে চুক্তির শর্ত মেনে চলছে।

হুয়াই তবু দমলো না। সে বারবারই কা'বের মন গলানোর চেষ্টা করতে লাগলো। সে বললো, সম্প্রদায়ের সমস্ত মানুষের মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব এখন তোমার হাতে। তাদের ইজ্জত-সম্ভ্রমও তোমারই হাতে। তুমি একটু চিন্তা করে দেখো। এ সুযোগ হাতছাড়া করাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তুমি মুহাম্মাদের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করো এবং সৈন্যদের যাওয়ার রাস্তা দিয়ে দাও। তারা বন্যার মতো প্রবেশ করবে এবং মুহাম্মাদ ও তার বাহিনীকে নির্মূল করে দেবে। তারপর সমগ্র আরবে আবার আমাদের আধিপত্য বিস্তার হবে। আমাদের ধর্মও নিষ্কণ্টক হয়ে যাবে। মদীনার সমস্ত ধনসম্পদ আর জমি-জায়গাও আমাদের অধিকারে এসে যাবে।

এবারের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো না। হুয়াইর বক্তব্য যাদুর মতো কাজ হলো। কা'ব তার মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিয়ে চুক্তি ভঙ্গ করতে রাজি হয়ে গেল। কিন্তু তবু সে চিন্তা করতে লাগলো যে, কুরাইশ ও গাতফানদের সম্মিলিত বাহিনী যদি পরাজিত হয়, তাহলে কী দশা হবে? তারা তো নিজেদের বাঁচানোর জন্য তখন অন্য পথ ধরবে। আর আমরা একাকী হয়ে যাব। তখন আমাদের কী অবস্থা হবে? বনু নাযির ও বনু কায়নুকার মতোই পরিণাম আমাদের ভোগ করতে হবে।

তখন হুয়াই এ প্রশ্নেরও সমাধান দিয়ে দিল। হুয়াই বললো, আল্লাহ না করুন, আমরা যদি হেরে যাই, আর কুরাইশরা যদি রণক্ষেত্র ত্যাগ করে পালিয়ে যায়, তা হলে আমি খায়বার ছেড়ে এসে তোমাদের সাথে বসবাস করবো। বিপদ আপদে সর্বদাই আমরা তোমাদের সাথে থাকবো।

এবার কা'ব পুরোপুরিভাবে তার পাতা ফাঁদে পা দিয়ে ফেললো। সে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কৃত চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে শত্রু বাহিনীতে যোগ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল।

TOP

হুয়াই আনন্দচিত্তে আপন বাহিনীতে গিয়ে এ সংবাদ জানিয়ে দিল। এবার তারা ভাবতে লাগলো, জয় আমাদের সুনিশ্চিত। কেবল বনু কুরাইযারই আগমনের অপেক্ষা।

পরিবর্তিত পরিস্থিতি: মুসলিম বাহিনী কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন

বনী কুরাইযার বিদ্রোহের এই সংবাদ খুব দ্রুত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছে গেল। তিনি খবরটির সত্যতা যাচাই করার জন্য এবং এ নিয়ে সরাসরি বনু কুরাইযার সরদার কা‘বের সাথে কথা বলার জন্য সা‘দ ইবনে মুয়ায, সা‘দ ইবনে উবাদাহ ও আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা- এই তিনজন সাহাবীকে পাঠালেন। তাদের বলে দিলেন, যদি খবরটি সঠিক বলে প্রমাণিত হয়, তা হলে ফিরে এসে তোমরা খবরটি এমন অস্পষ্ট ভাষায় জানাবে যেন উপস্থিত লোকজন তা অনুধাবন করতে সক্ষম না হয়। আর যদি খবরটি সঠিক না হয়, তাহলে সকলের মাঝে সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করতে কোন অসুবিধা নেই।

তখন তারা বিষয়টির সত্যতা জানতে পেরে বনু কুরাইযার সরদার কা‘ব ইবনে আসাদের সাথে সাক্ষাত করে মুসলিমদের সাথে তার পূর্বকৃত ওয়াদার কথা স্মরণ করিয়ে দিলে কা‘ব বললো, কিসের ওয়াদা! আর মুহাম্মাদই-বা কে! তার সাথে আমাদের কোন ওয়াদা-অঙ্গীকার নেই।

তখন এই তিন সাহাবী ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ মত অস্পষ্ট শব্দে তাকে এই সংবাদ জানালেন। তারা বললেন, ‘আদল ও ফারাহ। অর্থাৎ ‘আদল ও ফারাহ গোত্র আসহাবুর রাজি তথা খুবাইব রা.-এর সাথে যেমন ওয়াদা ভঙ্গ করেছে, বনী কুরাইযাও তদ্রুপ ওয়াদা ভঙ্গ করেছে। (সীরাতে ইবনে হিশাম, ২:৪০ পৃষ্ঠা)

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু কুরাইযার এই বিশ্বাসঘাতকতার কারণে খুবই ব্যথিত হলেন। কেননা, এখন মদীনা অরক্ষিত হয়ে গেল। মালপত্র পৌঁছানোর রাস্তাও বন্ধ হয়ে গেল।

শত্রুদের মদীনায় আক্রমণের পথ খুলে গেল। মুসলমানগণ এখন বাহির-ভিতর সবদিক থেকে শত্রুর বেষ্টনীর মধ্যে পড়ে গেলেন। মুসলমানগণ বর্ণনাতীত নাযুক ও ভয়াবহ অবস্থায় পড়ে গেলেন।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে যুদ্ধের এ পরিস্থিতি ও মুসলিমদের অবস্থা বর্ণনা করে ইরশাদ করেন,

اِذْ جَآءُوْكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَ مِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَ اِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَ بَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ وَ تَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا۠ ○ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ زُلْزِلُوْا زِلْزَالًا شَدِيْدًا ○

ঐ সময়ের কথা স্মরণ করো, যখন কাফেররা তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল উঁচু এলাকা ও নিম্ম এলাকা থেকে এবং যখন তোমাদের চোখ (বিস্ময়ে) বিস্ফোরিত হয়েছিল, তোমাদের প্রাণ হয়ে পড়েছিল কণ্ঠাগত। আর তোমরা আল্লাহর সম্বন্ধে নানা (অমূলক) ধারণা করছিলে। তখন মুমিনগণ পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিল এবং তারা ভীষণ কম্পিত হয়েছিল। (সূরা আহযাব, আয়াত:১০-১১)

সময়টি ছিল মুসলিমদের জন্য বড় কঠিন পরীক্ষার। ইখলাস ও নিখাঁদ দীনের কষ্টিপাথর দ্বারা ঈমান ও নেফাক যাচাই করা হচ্ছিল। এ কষ্টিপাথর তখন খাঁটি ও ভেজালের পার্থক্য সুস্পষ্ট করে দেয়।

মুনাফিকদের প্রতারণা ও পলায়ন

এ বহু মুনাফিক গোপনে পলায়ন করে। অনেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আবেদন জানায়, আল্লাহর রাসূল, আমাদের ঘরের দেয়াল খুব নিচু, তাই ঘরগুলো মোটেই সংরক্ষিত নয়। মহিলা ও শিশুদের হেফাজত করা জরুরী। তাই আপনার কাছে যুদ্ধ থেকে অব্যাহতি কামনা করছি। এ জাতীয় নানান মিথ্যা অজুহাত পেশ করে মুনাফিকরা ময়দান ছাড়তে লাগলো। অধিকন্তু শুধু নিজেরা নয়, সত্যিকার মুমিনদেরও ময়দান ত্যাগ করার জন্য বিভিন্ন কথা বলে তারা ফুসলাতে লাগলো। এহেন নাজুক মুহূর্তে তাদের এই ঘৃণ্য তৎপরতা আল্লাহ তা'আলার কাছে এত অপছন্দ হয়েছিল যে, আল্লাহ

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

তা'আলা পবিত্র কুরআনের নয়টি আয়াতে তাদের এই ঘৃণ্য অপতৎপরতার বর্ণনা তুলে ধরেছেন।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَاِذۡ يَقُوۡلُ الۡمُنٰفِقُوۡنَ وَالَّذِيۡنَ فِىۡ قُلُوۡبِهِمۡ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوۡلُهٗۤ اِلَّا غُرُوۡرًا ○ وَاِذۡ
قَالَتۡ طَّآئِفَةٌ مِّنۡهُمۡ يٰۤاَهۡلَ يَثۡرِبَ لَا مُقَامَ لَـكُمۡ فَارۡجِعُوۡا ۚ وَيَسۡتَاۡذِنُ فَرِيۡقٌ مِّنۡهُمُ النَّبِىَّ
يَقُوۡلُوۡنَ اِنَّ بُيُوۡتَنَا عَوۡرَةٌ ۛؕ وَمَا هِىَ بِعَوۡرَةٍ ۛۚ اِنۡ يُّرِيۡدُوۡنَ اِلَّا فِرَارًا ○ وَلَوۡ دُخِلَتۡ عَلَيۡهِمۡ مِّنۡ
اَقۡطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الۡفِتۡنَةَ لَاٰتَوۡهَا وَمَا تَلَبَّثُوۡا بِهَاۤ اِلَّا يَسِيۡرًا ○ وَلَقَدۡ كَانُوۡا عَاهَدُوا اللّٰهَ
مِنۡ قَبۡلُ لَا يُوَلُّوۡنَ الۡاَدۡبَارَ ؕ وَكَانَ عَهۡدُ اللّٰهِ مَسۡئُوۡلًا ○ قُلۡ لَّنۡ يَّنۡفَعَكُمُ الۡفِرَارُ اِنۡ فَرَرۡتُمۡ
مِّنَ الۡمَوۡتِ اَوِ الۡقَتۡلِ وَاِذًا لَّا تُمَتَّعُوۡنَ اِلَّا قَلِيۡلًا ○ قُلۡ مَنۡ ذَا الَّذِىۡ يَعۡصِمُكُمۡ مِّنَ اللّٰهِ اِنۡ
اَرَادَ بِكُمۡ سُوۡٓءًا اَوۡ اَرَادَ بِكُمۡ رَحۡمَةً ؕ وَلَا يَجِدُوۡنَ لَهُمۡ مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيۡرًا ○ قَدۡ
يَعۡلَمُ اللّٰهُ الۡمُعَوِّقِيۡنَ مِنۡكُمۡ وَالۡقَآئِلِيۡنَ لِاِخۡوَانِهِمۡ هَلُمَّ اِلَيۡنَا ۚ وَلَا يَاۡتُوۡنَ الۡبَاۡسَ اِلَّا
قَلِيۡلًا ○ اَشِحَّةً عَلَيۡكُمۡ ۖۚ فَاِذَا جَآءَ الۡخَـوۡفُ رَاَيۡتَهُمۡ يَنۡظُرُوۡنَ اِلَيۡكَ تَدُوۡرُ اَعۡيُنُهُمۡ كَالَّذِىۡ
يُغۡشٰى عَلَيۡهِ مِنَ الۡمَوۡتِ ۚ فَاِذَا ذَهَبَ الۡخَـوۡفُ سَلَقُوۡكُمۡ بِاَلۡسِنَةٍ حِدَادٍ اَشِحَّةً عَلَى الۡخَيۡرِ ؕ
اُولٰٓئِكَ لَمۡ يُؤۡمِنُوۡا فَاَحۡبَطَ اللّٰهُ اَعۡمَالَهُمۡ ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيۡرًا ○ يَحۡسَبُوۡنَ
الۡاَحۡزَابَ لَمۡ يَذۡهَبُوۡا ۚ وَاِنۡ يَّاۡتِ الۡاَحۡزَابُ يَوَدُّوۡا لَوۡ اَنَّهُمۡ بَادُوۡنَ فِى الۡاَعۡرَابِ يَسۡاَلُوۡنَ
عَنۡ اَنۡۢبَآئِكُمۡ ؕ وَلَوۡ كَانُوۡا فِيۡكُمۡ مَّا قٰتَلُوۡۤا اِلَّا قَلِيۡلًا ○

স্মরণ করুন, মুনাফিকরা ও যাদের অন্তরে ছিল ব্যাধি, তারা বলছিল, আল্লাহ ও তার রাসূল আমাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা প্রতারণা ব্যতীত কিছুই নয়। আর তাদের একদল বলেছিল, হে ইয়াসরিববাসী, এখানে তোমাদের কোন স্থান নেই। তোমরা ফিরে যাও। আর তাদের একদল নবীর কাছে অব্যাহতি প্রার্থনা করে বলছিল, আমাদের বাড়ি-ঘর অরক্ষিত। অথচ এগুলো অরক্ষিত ছিল না। আসলে পলায়ন করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। যদি বিভিন্ন দিক

থেকে তাদের (মুসলমানদের) বিরুদ্ধে শত্রুদের প্রবেশ ঘটতো, অতঃপর তাদের (মুনাফিকদের) বিদ্রোহের জন্য প্ররোচিত করা হতো, তবে তারা অবশ্যই তা করে বসতো। তারা এতে কালবিলম্ব করতো না। এরা তো পূর্বেই আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে না। আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার সম্বন্ধে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হবে। বলুন, তোমাদের কোন লাভ হবে না যদি তোমরা মৃত্যু অথবা হত্যার ভয়ে পলায়ন করো। তবে সেক্ষেত্রে তোমাদের সামান্যই ভোগ করতে দেওয়া হবে। বলুন, কে তোমাদের আল্লাহ হতে দূরে রাখবে যদি তিনি তোমাদের অমঙ্গল ইচ্ছা করেন অথবা তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করার ইচ্ছা করেন? তারা আল্লাহ ব্যতীত নিজেদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না। আল্লাহ অবশ্যই জানেন, তোমাদের মধ্যে কারা বাধা প্রদানকারী এবং কারা তাদের ভাইদের বলে, আমাদের সাথে আসো। তারা অল্পই যুদ্ধে অংশ নেয়। তোমাদের ব্যাপারে বিরাগবশত; আর যখন ভীতি আসে, তখন আপনি তাদের দেখবেন, মৃত্যুর ভয়ে মূর্ছাতুর ব্যক্তির মতো চক্ষু উল্টিয়ে তারা আপনার দিকে তাকাচ্ছে। কিন্তু যখন ভীতি চলে যায়, তখন তারা ধনের লালসায় তোমাদের তীক্ষ্ণ ভাষায় বিদ্ধ করে। তারা ঈমান আনেনি, এ জন্য আল্লাহ তা'আলা তাদের আমলসমূহকে নিষ্ফল করে দিয়েছেন। আর এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ। তারা সম্মিলিত বাহিনীকে ধারণা করে, তারা যায়নি। যদি সম্মিলিত বাহিনী আবার এসে পড়ে, তখন তারা কামনা করবে, ভালো হতো তারা যদি যাযাবর মরুবাসীদের সাথে থেকে তোমাদের সংবাদ নিত। তারা তোমাদের সাথে অবস্থান করলেও যুদ্ধ খুব কমই করতো। (সূরা আহযাব, আয়াত:১২-২০)

এ সব আয়াতে গাযওয়ায়ে আহযাব বা খন্দকের জিহাদের সময় মুনাফিকদের স্বার্থান্ধ ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং এর দায় ও পরিণাম সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। তারা খুবই সুবিধাবাদী হয়। যখন মুসলিমদের ভাল অবস্থা দেখে, তখন এসে

ভাগ বসাতে চায়। আবার যখন সঙ্গীন অবস্থা প্রত্যক্ষ করে তখন সেখান থেকে পলায়ন করতে চায়। উল্লিখিত ঘটনায় তাদের সেই দু'রকম চেহারা সম্যকরূপে প্রকাশ পেয়েছে।

অপরদিকে যারা ঈমান ও ইখলাসে পরিপূর্ণ, যাদের অন্তর ছিল আল্লাহ ও তার রাসূলের মুহাব্বতে পূর্ণ, গাযওয়ায়ে আহযাবের সময় তাদের ভূমিকা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَمَّا رَاَ الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ ۙ قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ ۫ وَمَا زَادَهُمْ اِلَّاۤ اِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا ۝

মুমিনরা যখন সম্মিলিত বাহিনী দেখলো, তখন তারা বলে উঠলো, এটি তো তা-ই, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল আমাদের নিকট যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ ও তার রাসূল সত্যই বলেছেন। এর দ্বারা তাদের ঈমান ও আনুগত্যই বৃদ্ধি পেল। (সূরা আহযাব, আয়াত:২২)

এ আয়াতে গাযওয়ায়ে আহযাবে মুমিনদের ভূমিকার প্রশংসা করা হয়েছে। তারা সেই জিহাদকে আল্লাহর দীনের বিজয়ের অবলম্বনরূপে গ্রহণ করেছিলেন।

গাযওয়ায়ে আহযাবের পরবর্তী ঘটনা

ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, মক্কার সকল গোত্রের কাফেররা একজোট হয়ে মদীনায় আগমন করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুমিনদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে যুদ্ধ করে তাদের খতম করার জন্য। তদুপরি তারা নানা প্রলোভনে মদীনার ইহুদী সম্প্রদায় বনী কুরাইযাকে কবজা করে নিয়ে সম্মিলিত কাফের বাহিনীরূপে মুসলিমদের উপর এক যোগে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আবার মুসলিমদের মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকা মুনাফিকরাও তাদের সহায়তা দেয়।

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

এভাবে ইহুদী ও মুনাফিক দল মুসলিমদের সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করে। ফলে মুসলিমরা বহিঃশত্রু ও অন্তঃশত্রু এ উভয় শত্রুর অবরোধ ও আক্রমণের শিকার হয়।

মদীনা মুনাওয়ারা অবরোধ

কাফের বাহিনী মুসলিমদের পরিখা খননের কারণে সরাসরি আক্রমণে বাধাগ্রস্ত হয়ে এবার কঠোর অবরোধ জারি করলো। মদীনাকে তারা চতুর্দিক থেকে ঘেরাও করে রাখলো এবং কোন এক ফাঁকে পরিখা অতিক্রম করে ভিতরে ঢুকে আক্রমণ করার সুযোগ খুঁজতে লাগলো।

এভাবে কয়েকদিন অতিক্রান্ত হয়ে গেল। শত্রুরা পুরো মদীনা কঠোরভাবে অবরোধ করে রাখলো। মুসলিমদের কাছে সেই পরিস্থিতি খুবই কঠিন মনে হতে লাগলো।

এমনকি কারো কারো কাছে তা বড় অসহনীয় মনে হতে লাগলো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে উদয় হলো, অবরোধের প্রচন্ডতার দরুন সাধারণ মুসলিমরা ঘাবড়ে যেতে পারে। তাই তিনি গাতফান গোত্রের দুই সরদার ও নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তি উয়াইনা ইবনে হিসন ও হারেস ইবনে আউফ-এর সাথে সন্ধি করার চিন্তা করলেন। সেই মোতাবেক এক ব্যক্তিকে দিয়ে প্রস্তাব পাঠালেন, তারা যদি যুদ্ধ না করে মদীনা ত্যাগ করে চলে যায়, তা হলে মদীনার একতৃতীয়াংশ আবাদী তাদের দিয়ে দেয়া হবে।

কাফেররাও সম্মুখ আক্রমণে না পেরে চাইছিল, কোনভাবে যদি এ সংকট থেকে মান রক্ষা করে উদ্ধার পেত! তাই সন্ধির প্রস্তাব পাওয়ার সাথে সাথে গাতফান এ প্রস্তাব আনন্দের সাথে মেনে নিল।

অতঃপর কথা পাকা করার জন্য তারা এক ব্যক্তিকে অন্যান্য গোত্রের নিকট পাঠালো। কিন্তু তারা এক- তৃতীয়াংশ নয়, বরং অর্ধেক আবাদী দাবি করলো। কিন্তু কাফের বাহিনীর সরদার আবু সুফিয়ান এ ব্যাপারে কিছুই জানলো না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্ধি চুক্তি চূড়ান্ত করার আগে সা'দ ইবনে মুয়ায ও সা'দ ইবনে উবাদাহর সাথে পরামর্শ করলেন। তাদের এ বিষয়টি জানালে তারা বললেন, আল্লাহর রাসূল, এটা যদি আল্লাহর সিদ্ধান্ত হয়, তা হলে আপত্তি করার তো কিছু নেই। তেমনি যদি আপনার ইচ্ছায় এ সিদ্ধান্ত হয়, তা-ও শিরোধার্য। কিন্তু যদি আমাদের লোকদের প্রতি দয়া ও দরদবশত আপনি এ চিন্তা করে থাকেন, তা হলে সবিনয় কিছু নিবেদন করি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা তো তোমাদের সুবিধার জন্যই করছি। আরবরা এখন এক জোট হয়ে এক নির্দেশের আওতায় তোমাদের মোকাবেলা করছে। আমি চাচ্ছি, এ পন্থায় তাদের ঐক্য ও জোট ভেঙ্গে হীনবল করে দিতে।

হযরত সা'দ ইবনে মুয়ায রা. বললেন, আল্লাহর রাসূল, যখন তারা ও আমরা সবাই কাফের-মুশরিক ছিলাম, মূর্তিপূজা করতাম, আল্লাহ তা'আলাকে জানতাম না, তখনও এ লোকগুলোর আমাদের একটা খোরমা পর্যন্ত নেওয়ার সাহস ছিল না। হয়ত আমরা মেহমানদারি হিসেবে দিতাম বা তারা আমাদের থেকে কিনে নিত। এ ছাড়া নেওয়ার কোন সুযোগ ছিল না। এখন যখন আল্লাহ তা'আলা হেদায়েতের অমূল্য দৌলত দান করেছেন, ইসলাম দান করে আমাদের সৌভাগ্যশালী ও সম্মানিত করেছেন, এখন আমরা তাদের এমনিই দিয়ে দিব? তা কখনো হতে পারে না। আল্লাহর কসম, তাদের কোন কিছুই দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আল্লাহর কসম, আমরা তাদের তরবারি ব্যতীত কিছুই দিব না, তারা যা করতে পারে করুক। এ কথা বলে হযরত সা'দ ইবনে মুয়ায রা. নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইশারায় সব লেখা মুছে ফেললেন।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হিম্মত দেখে খুবই আনন্দিত হলেন এবং সন্ধির ইচ্ছা ত্যাগ করলেন। ফলে গাতফানদের লোকটি ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল। (সীরাতে ইবনে হিশাম, ২:১৪১)

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

এরপর যতই দিন যেতে লাগলো, অবস্থা ততই খারাপ হতে লাগলো। কষ্টের পর কষ্ট বেড়েই চললো। রাতে ঘুমান পর্যন্ত হারাম হয়ে গেল। প্রতি মুহূর্তেই ছিল বিপদের ঘনঘটা।

সেসময় মুসলিমবাহিনীতে যেসব কপট ও মুনাফিক ছিল, তারা বেচাইনী ও অস্থির ভাব দেখাতে লাগলো। তারা বারবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে যার যার বাড়িতে ফিরে যাওয়ার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করতে লাগলো। তারা বারবার বলতে লাগলো, আমাদের বাড়ি-ঘর সুরক্ষিত নয়, বাল-বাচ্চারাও বিপদের সম্মুখীন। আমাদের বাড়িতে ফিরে যেতে দিন। তারা নিজেরা যেমন, তেমনই মুসলিমদেরও বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য উসকে দিতে লাগলো। তাদের মধ্যে হতাশা ও মৃত্যু ভয় ঢুকিয়ে দিতে লাগলো। বলতে লাগলো, মুহাম্মাদ তো আমাদের খুবই আশার বাণী শোনালেন। খুব ভাল ভাল বাগ-বাগিচা দেখালেন। বললেন, কায়সার ও কিসরার সম্পদ তোমরা পেয়ে যাবে। অথচ আজ অবস্থা এতই খারাপ যে, দানা-পানি পর্যন্ত পাচ্ছি না। আর জীবন তো হাতের মুঠোয় এসে গেছে। উল্লিখিত আয়াতসমূহে তাদের এ অবস্থার কথা তুলে ধরা হয়েছে।

কাফেরদের সম্মিলিত আক্রমণ

পরিখা অতিক্রম করে মদীনায় প্রবেশের জন্য কাফেররা বিভিন্নভাবে চেষ্টা করলো। কিন্তু মুসলমানদের প্রতিরোধের মুখে নিষ্ফল হলো। পরিশেষে তারা সিদ্ধান্ত নিল, প্রসিদ্ধ সেনানায়ক ও বীরগণ সমস্ত সৈন্যকে সমবেত করে সকলে একযোগে পরিখার নির্দিষ্ট একটি স্থানে আক্রমণ করবে।

সালাআ পাহাড়সংলগ্ন পরিখার একটি স্থান অপেক্ষাকৃত অপ্রশস্ত ছিল। আক্রমণের জন্য তারা এই স্থানটিই নির্বাচন করলো। তারা অতি দ্রুত অগ্রসর হলো। ঘোড়া লাফ দিয়ে পরিখার অপর পারে চলে গেল। তারা উন্মত্ত হয়ে উঠলো। তাদের মধ্যে আবু জাহেলের পুত্র ইকরিমা এবং

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

জিরারও ছিল। সেই সাথে আরবের বিখ্যাত বীর আমর ইবনে আবদুদও ছিল। তাকে এক হাজার অশ্বারোহীর সমকক্ষ মনে করা হতো। সে প্রথমেই অগ্রসর হয়ে চিৎকার করে বললো, আমার মুকাবিলায় কে এগিয়ে আসতে চায়?

হযরত আলী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে থামালেন। হযরত আলী বসে পড়লেন। আমর আবার চিৎকার করলো। অন্য কেউ সাহস করলো না। হযরত আলী আবার বললেন, আমি। তৃতীয়বারেও একই কথার পুনরাবৃত্তি হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার কি জানা আছে, সে আমর? হযরত আলী রা. বললেন, হ্যাঁ, আমার খুব ভাল করে জানা আছে, সে আমর। মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি দিয়ে পবিত্র হাতে তার মাথায় পাগড়ি বেঁধে হাতে তলোয়ার তুলে দিলেন।

হযরত আলী রা. এবার আমরের মোকাবেলায় অবতীর্ণ হলেন। আমরের মুখোমুখি হলে সে বললো, দুনিয়ার কেউ যদি আমার নিকট তিনটি জিনিস প্রার্থনা করে তা হলে আমি একটা অবশ্যই মনযুর করবো। হযরত আলী রা. বললেন, ভাল কথা, তুমি তা হলে ইসলাম গ্রহণ করো। সে বললো, এটা অসম্ভব ব্যাপার। হযরত আলী রা. বললেন, তা হলে তুমি যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে ফিরে যাও। আমর বললো, আমি কুরাইশ মহিলাদের তিরস্কার শুনতে পারবো না। হযরত আলী বললেন, তা হলে আমার সাথে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হও। আমর বললো, আকাশের নিচে এমন কথা আমাকে কেউ বলতে পারে তা আমি ইতোপূর্বে বিশ্বাসও করতাম না। আচ্ছা বেশ, আমি সম্মত আছি। কিন্তু আমি অশ্বারোহী তুমি পদাতিক। অশ্বে আরোহণ করে পদাতিকের সাথে যুদ্ধ করা বীরের ধর্ম নয়, এই বলে আমর ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে তরবারির এক আঘাতে ঘোড়ার পা কেটে অচল করে দিল।

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

তারপর সে বললো। যুদ্ধের পূর্বে তোমার পরিচয়টা জানা দরকার। বরো, তোমার নাম কী? হযরত আলী নিজের নাম বললেন, আমর বললো, আমি তোমার সাথে যুদ্ধ করতে চাই না। হযরত আলী বললেন, কিন্তু আমি তো চাই। এ কথা শুনে আমর গর্জে উঠলো এবং তরবারি কোষমুক্ত করে বীরবিক্রমে হযরত আলীর উপর প্রচন্ড আঘাত করলো। তিনি ঢালের সাহায্যে আঘাত প্রতিহত করলেন, কিন্তু ঢাল ভেঙ্গে দ্বিখণ্ডিত হয়ে তরবারির সম্মুখভাগ তার কপালে বিদ্ধ হলো।

আল্লাহর সিংহ হযরত আলী রা. আমরের আঘাত সামলে নিয়ে সিংহ গর্জনে অগ্রসর হয়ে হায়দারি হাঁক ছেড়ে আমরের উপর প্রচন্ড আঘাত হানলেন। এক আঘাতেই আমর দ্বিখণ্ডিত হয়ে ভূপতিত হলো। তাকবির ধ্বনিতে খন্দক প্রান্তর মুখরিত হয়ে উঠলো। সাহাবায়েকেরাম আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুললেন।

আমর নিহত হওয়ার পর নাওফিল, ইকরিমা, জিরার, জুবাইর প্রমুখ বীর হযরত আলীর উপর সম্মিলিত আক্রমণ করলো। কিন্তু জুলফিকারের চাকচিক্যে অনতিবিলম্বে তারা রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করলো। হযরত উমর ফারুক জিরারের পশ্চাদ্ধাবন করলেন। জিরার ঘুরে তাকে বর্শাবিদ্ধ করতে চাইলো, কিন্তু আবার ক্ষান্ত হয়ে বললো, উমর, এই অনুগ্রহের কথা মনে রেখো। নাওফিল পলায়ন করতে যেয়ে খন্দকের মধ্যে পতিত হলে মুসলিমবাহিনী তার উপর তীর-পাথর বর্ষণ করতে শুরু করলো। সে চিৎকার করে বললো, তোমরা আমাকে কুকুরের মতো মের না। আমি সম্মানজনক মৃত্যু কামনা করছি। হযরত আলী রা. তার আবেদন মনযুর করলেন। খন্দকের মধ্যে নেমে তরবারির আঘাতে তার মস্তক ছিন্ন করলেন।

হযরত সাফিয়া রা. এর বাহাদুরি

এদিকে মুসলিম নারী ও শিশুদের দুর্গে রাখা হয়েছিল। সেটি ছিল বনু কুরাইযার আবাস ভূমি সংলগ্ন। সক্ষম পুরুষরা পরিখা পাহারায় ব্যস্ত ছিল। সারা মদীনা জনমানবশূন্য। ইহুদীরা ভাবলো, এই সুযোগে

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

দুর্গে আক্রমণ করে নারী ও শিশুদের অনায়াসে হত্যা করা যায়। তাই তারা আক্রমণের লক্ষ্যে দুর্গ-অভিমুখে রওয়ানা হলো। জনৈক ইহুদী দুর্গের ফটকে গিয়ে আক্রমণের পথ খুঁজছিল। এ সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফুফু হযরত সাফিয়া রা. লোকটিকে দেখতে পেয়ে সেখানে অবস্থানরত সাহাবী হাসসান বিন সাবিতকে বললেন, লোকটিকে হত্যা করুন, নতুবা সে ফিরে গিয়ে শত্রু পক্ষকে সব জানিয়ে দিবে।

হযরত হাসসানের একটি দুর্ঘটনা ঘটেছিল, যাতে তিনি এতই ভীত হয়ে পড়েছিলেন যে, লড়াই ও যুদ্ধ বরদাশত করতে পারতেন না। এ কারণে তিনি অক্ষমতা প্রকাশ করলেন। বাধ্য হয়ে হযরত সাফিয়া রা. তাঁবুর একটি খুঁটি উপড়ে নিয়ে ইহুদীর মাথায় প্রচন্ড এক আঘাত করলেন। এক আঘাতেই তার ভবলীলা সাঙ্গ হলো। তিনি ফিরে এসে হযরত হাসসানকে নিহত ইহুদীর সাজ-সজ্জা, অস্ত্র ইত্যাদি খুলে আনতে বললেন। এবারও তিনি অপারগতা প্রকাশ করলেন। হযরত সাফিয়া রা. বললেন, তা হলে তার মাথাটা কেটে বাইরে ফেলে দিন। সেটা দেখে ইহুদীরা ভয় পেয়ে যাবে। কিন্তু তাও তার দ্বারা সম্ভব হলো না। অবশেষে হযরত সাফিয়া রা. নিজেই এটা সমাধা করলেন। ইহুদীরা দুর্গের বাইরে কর্তিত মস্তক দেখে মনে করলো, দুর্গে নিশ্চয় সৈন্য মোতায়েন করা আছে। তাই তারা আর দুর্গ আক্রমণের সাহস পেল না।

এদিকে শত্রুরা মুসলমানদের অনুমতি নিয়ে নাওফিলের লাশ উঠিয়ে নিয়ে গেল। কিন্তু তবু তারা যুদ্ধের মনোবাঞ্ছা ত্যাগ করলো না। দিনরাত তারা পরিখা অতিক্রম করার চেষ্টা করতে লাগলো। সেজন্য তারা সৈন্যদের ছোট ছোট দলেও ভাগ করে বিভিন্ন জায়গায় পাঠিয়ে দিয়ে পরিখা পার করানোর চেষ্টা করতে লাগলো। এভাবে একটি দল ব্যর্থ হয় আরেকটি দল চেষ্টা করে। এভাবে তারা চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলো।

মুসলমানদের উপর দিয়ে কয়েকটি বিনিদ্র রজনী অতিক্রান্ত হয়ে গেল। ঘরে ঘরে মহিলা ও শিশুরা বড় উদ্বেগের মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন। এ দুঃসহ অবস্থার কথা ভাবতেও কষ্ট হয়।

শত্রুপক্ষ অনবরত তীর বর্ষণ করতে লাগলো। আর তারা জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে সত্যের পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে রাখতে জীবনের কর্তব্য পালন করে চললেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামও বীরত্বের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে চললেন। তিনি পরিখার বিভিন্ন অংশে সেনা মোতায়েন রাখলেন। যাতে শত্রুদের হামলা হওয়া মাত্র মোকাবেলা করতে পারে। একটা অংশ তিনি নিজেই রক্ষা করে চলেছিলেন। তিনি তীর দিয়ে শত্রুবাহিনীকে প্রাণপণে রুখে চললেন।

এ দিনটি খুব জটিলতার মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয়ে গেল। সারাটি দিন শত্রুদের সাথে চূড়ান্ত মোকাবেলা করে যেতে হলো। শত্রুদের পাকাপোক্ত তীরন্দাজরা তীর বর্ষণ করে যাচ্ছিল। মুসলিম বাহিনী নাজেহাল হয়ে পড়ছিলেন। ক্ষুধা-পিপাসায় তারা কাতর হয়ে পড়ছিলেন কিন্তু নিজেদের স্থানে তারা ছিলেন পাহাড়ের মত সুদৃঢ়, অটল, অনড়। বিন্দুমাত্র পিছু হটেননি তারা।

এ লড়াইয়ে মুসলিম শহীদের সংখ্যা কম হলেও আনসারদের মধ্য থেকে কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবী শহীদ হয়ে গেলেন। আউস গোত্রের নেতা হযরত সা‘দ ইবনে মুয়ায রা. বড় বীরত্বের সাথে লড়াই করছিলেন। শত্রুরা তাকে হত্যার সুযোগ খুঁজছিল। সুযোগ পেতেই তারা তার হাতে তীর মারলো। ফলে তার হাতের মূল রগ কেটে গেল। তা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হতে লাগলো। সেসময় সা‘দ রা. আকাশের দিকে দু’হাত তুলে সর্বশক্তিমান আল্লাহর উদ্দেশ্যে মর্মস্পর্শী ভাষায় দু‘আ করলেন, আয় আল্লাহ, কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ এখনো বাকি। তুমি আমাকে জীবিত রাখো। যে জাতির লোকেরা তোমার মনোনীত নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, যারা তাকে দেশ ছাড়া করেছে, তাদের চেয়ে বেশি লোকের

TOP

GET ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

সাথে লড়াই করার ইচ্ছা আমার নেই। কিন্তু তাদের সাথে যদি আর যুদ্ধ না হয় তা হলে তুমি আমাকে এই আঘাতেই শাহাদাত দাও। আর যতক্ষণ পর্যন্ত বনু কুরাইযার বিশ্বাসঘাতকতার পরিণাম না দেখতে পাই ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমাকে মৃত্যু দিয়ো না।

এদিন হামলার ভয়াবহতা এত বেশি ছিল যে, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের চার ওয়াক্ত নামায কাজা হয়ে গেল, যা পরর্বতী সময়ে একসাথে কাজা পড়ে নিয়েছিলেন।

কাফেরদের আত্মকলহ

অবরোধ চলাকালে একদিন গাতফান গোত্রের এক দলপতি নুয়াইম ইবনে মাসউদ আশজায়ী নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমীপে উপস্থিত হয়ে বললেন, আল্লাহর রাসূল, আমি আপনার প্রতি ঈমান এনেছি। তবে আমার গোত্র এ ব্যাপারে কিছু জানে না। এ অবস্থায় আপনি যদি অনুমতি দেন, তা হলে আমি একটা পদক্ষেপ নিতে পারি, যার দ্বারা এই অবরোধ শেষ হয়ে যাবে। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি দিয়ে বললেন, ঠিক আছে, তুমি একজন অভিজ্ঞ লোক। যদি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারো, করো। কেননা, লড়াই তো হচ্ছে কৌশল ও চালাকির নাম।

নুয়াইম ইবনে মাসউদ রা. প্রিয়নবীর কাছ থেকে ফিরে এসে চিন্তা করতে লাগলেন। এখন কী করা যায়, কীভাবে শত্রুদের ব্যর্থ করে দেওয়া যায়। হঠাৎ তার মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন শত্রুদের ঐক্য বিনাশ করে দিবেন। এ ছাড়া উত্তম কোন উপায় তিনি দেখলেন না।

নুয়াইম তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন। তারপর অতি দ্রুত বনু কুরাইযার কাছে গেলেন। প্রথম থেকেই বনু কুরাইযা তাকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে দেখতো। সেখানকার ইহুদীরা তাকে খুব মানতো। তার কথাবার্তা খুব মনোযোগ সহকারে শুনতো। তার সঙ্গলাভ করাটা খুব

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

মর্যাদার ব্যাপার বলে মনে করতো। নুয়াইম রা. তাদের কাছে পৌঁছতেই তারা খুব সম্মানের সাথে তাকে অভ্যর্থনা জানালো। এবং মর্যাদার সাথে বসালো। ইহুদীদের সমস্ত নেতাই তার কাছে এসে জমায়েত হলো। খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগলো তার কথাবার্তা। নুয়াইম কিছুক্ষণ ধরে এ-কথা সে-কথা বললেন। তারপর আসল কথায় এলেন। বললেন, তোমরা জানো, তোমাদের সাথে আমার সম্পর্ক কত গভীর ও কত দিনের। তা ছাড়া তোমাদের আমি কত ভালোবাসি তাও তোমরা জানো। সবাই একসাথে বলে উঠলো, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা তো আমরা ভালোই জানি।

নুয়াইম বললেন, তোমরা তো মুহাম্মাদের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করে কুরাইশ ও গাতফানদের সাথে যোগ দিয়েছ। কিন্তু এর পরিণাম কী ভেবে দেখেছ? জিতে গেলে তো কোন সমস্যা থাকবে না। কিন্তু হেরে গেলে? তখন কী অবস্থা হবে? তারা তো নিজেদের পথ বেছে নিবে আর তোমরা একেবারেই নিঃসঙ্গ হয়ে পড়বে। তখন তো মুহাম্মাদের সাথে তোমাদের একাই মোকাবেলা করতে হবে। সেসময় তো তোমাদের অবস্থা কাহিল হয়ে পড়বে। তখন তো বনী কায়নুকা ও বনী নাজিরের মতো দুর্ভাগ্য তোমাদেরও বরণ করতে হবে।

লোকেরা উদ্বেগের সাথে সমস্বরে বলে উঠলো, তা হলে এখন আমরা কী করব, নুয়াইম!

নুয়াইম বললেন, আমার মনে হয় আগে তাদের কিছুলোক তোমাদের কাছে জামিন হিসেবে রেখেই তবে তাদের সঙ্গী হওয়া উচিত। জামিনের লোকদের উচ্চ বংশ হতে হবে। এভাবে তাদের উপর তোমাদের বিশ্বাস থাকবে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মুহাম্মাদকে মেরে না ফেলবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা ফিরে যেতে পারবে না।

লোকেরা এই যুক্তি শুনে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। তারা বললো, বাহ, নুয়াইম, তোমার যুক্তি একেবারেই সঠিক। আমরা এখন এটাই করবো।

নুয়াইম বললেন, আচ্ছা আমি এখন যাই। তবে সাবধান, এ কথা কাউকে বলবে না। লোকেরা বললো, না, না, কখনই বলবো না। তুমি পূর্ণ আস্থা রাখো। আমরা কারো সাথেই বলবো না।

নুয়াইম ওখান থেকে বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু এরা তখনো পর্যন্ত নুয়াইমের প্রশংসা করতে লাগলো এবং বলতে লাগলো, নুয়াইম কত সাবধানী লোক, তিনি কত চিন্তাশীল! তিনি আমাদের প্রতি কত খেয়াল রাখেন।

এরপর নুয়াইম আবু সুফিয়ানের কাছে পৌঁছলেন সেখানে কুরাইশদের অন্য নেতারাও উপস্থিত ছিলেন। নুয়াইম বললেন, তোমরা জানো, আমি তোমাদের কত ভালোবাসি। আমি একটা কথা জানতে পারলাম, তাই সেই খবরটা তোমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়াটা জরুরী মনে করে ছুটে এলাম। যাতে তোমরা সাবধান হয়ে যাও।

লোকেরা হতভম্ব হয়ে সমস্বরে বললো, নুয়াইম, কী হয়েছে? কী ব্যাপার?

নুয়াইম বললেন, আমি জানতে পারলাম, বনু কুরাইযা মুহাম্মাদের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে। তাঁরা মুহাম্মাদের কাছে তাদের অপরাধ মিটিয়ে দেওয়ার আবেদন জানিয়ে ক্ষমা চেয়েছে। মুহাম্মাদ শর্তসাপেক্ষে তাদের মাফ করে দিয়েছেন। তা হলো বনু কুরাইযা কুরাইশ ও গাতফানের কাছ থেকে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে তার নিকট পাঠাবে। তিনি তাদের হত্যা করবেন। দেখ ভাই, সাবধান থেকো। যে কোনো বাহানায় তারা তোমাদের কাছে লোক চাইলে মনের ভুলেও দিয়ো না।

এ কথা বলে নুয়াইম বেরিয়ে পড়লেন। কুরাইশ নেতারা তার অনেক প্রশংসা করলো এবং তার প্রতি অনেক কৃতজ্ঞতা জানালো।

সেখান থেকে ফিরে নুয়াইম গাতফানদের কাছে গেলেন। তাদের সাথেও তিনি ঐ একই কথা বললেন।

TOP

নুয়াইমের এই কথায় কুরাইশ ও গাতফান খুবই হতবিহ্বল হয়ে পড়লো। সমস্ত নেতা একত্র হয়ে চিন্তা করতে লাগলো, বনু কুরাইযার ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন মত দিল। সবশেষে সিদ্ধান্ত হলো, দুই গোত্রের কিছু নেতা সেখানে যাক। গিয়ে বলুক, ভাই, এখানে আমাদের অনেকদিন অতিবাহিত হয়ে গেছে। আর বেশিদিন অবস্থান করার ইচ্ছা আমাদের নেই। এ ব্যাপারে একটা ফায়সালা হয়ে যাওয়া উচিত। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তোমরাও আমাদের সাথে মিলে যাও। সবাই মিলে আমরা একসাথে বড় রকমের একটা হামলা চালিয়ে দিই।

কুরাইশ ও গাতফানের একটি দল বনু কুরাইযার কাছে গিয়ে এসব কথা বললো। বনু কুরাইযা বললো, আগামীকাল তো শনিবার। শনিবার আমাদের যুদ্ধ-বিগ্রহ করা নিষেধ। অন্য কোনদিন ঠিক করো। হ্যাঁ, আর একটা কথা আছে। আমরা তোমাদের সাথে এক হয়ে লড়তে রাজি আছি, তবে আমাদের কাছে তোমাদের বিশিষ্ট কিছুলোককে জামিনস্বরূপ রাখতে হবে। যাতে আমাদের বিশ্বাস জন্মায় যে, মুহাম্মাদের সাথে যুদ্ধে পরাজয় হলে তোমরা আমাদের ছেড়ে পালিয়ে যাবে না।

কুরাইশ ও গাতফানদের নুয়াইমের কথার প্রতি বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইলো না। তাদের পূর্ণ বিশ্বাস জন্মালো, বনু কুরাইযার উদ্দেশ্য সত্যিই খারাপ। তাই জামিন হিসেবে তাদের কাছে কাউকে রাখতে অস্বীকৃতি জানালো। তখন বনু কুরাইযারও নুয়াইমের কথার প্রতি বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকলো না। ফলে দুইপক্ষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়ে গেল। ফলে এত বিশাল লোকবল সত্ত্বেও শত্রুরা সাহস হারিয়ে হীনবল হয়ে পড়ল।

গায়েবি মদদ

কাফের বাহিনীর দীর্ঘ এক মাসের অবরোধে মুসলমানদের দুরবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোমল প্রাণ কেঁদে

উঠলো। তিনি তাদের এ সীমাহীন কষ্ট লাঘব করে কাফের বাহিনীর বিরুদ্ধে বিজয়ের জন্য আল্লাহর দরবারে হাত তুলে দু‘আ করলেন। মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু সায়িদ খুদরী রা. বলেন, আমরা যুদ্ধের কঠোর অবস্থা আলোচনা করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দু‘আর দরখাস্ত করলাম। তিনি এই পরিপ্রেক্ষিতে দু‘আ করলেন,

اللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِنَا وَامِنْ رَوْعَاتِنَا

আয় আল্লাহ, আপনি আমাদের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখুন এবং আমাদের ভয়ভীতি থেকে নিরাপদ রাখুন।

বুখারি শরীফে এ সময়ের অপর একটি দু‘আ বর্ণিত হয়েছে। তা হচ্ছে,

اللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِيَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الْاَحْزَابِ اِهْزِمْهُمْ وَانْصُرْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ

আয় আল্লাহ, হে কিতাব নাযিলকারী, হে বৃষ্টি ও মেঘ প্রেরণকারী, কাফের দলগুলোকে পরাজয় দানকারী, আপনি তাদের পরাজয় দিন এবং তাদের বিপরীতে আমাদের বিজয় দান করুন। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৯৬৬)

আল্লাহ তা‘আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু‘আ কবুল করলেন। শীতকালের পরিষ্কার আকাশে হঠাৎ কালো মেঘ দেখা দিল। মুহূর্তেই শুরু হয়ে গেল প্রচণ্ড রকমের ঝড়। সেই সাথে নামলো প্রবল বৃষ্টি। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবহাওয়া ভয়ংকর রূপ ধারণ করলো। প্রচণ্ড বৃষ্টি, ঝড়, বিদ্যুৎচমক একসাথে শত্রুদের মনপ্রাণ আতঙ্করগ্রস্ত হয়ে পড়লো। তারা তাদের তাঁবুর দিকে ছুটে যেতে লাগলো। কিন্তু আবহাওয়া বড় নির্মম ও ভয়ংকর হয়ে উঠলো। ঝড়-তুফান অনবরত বেড়েই চললো। ঝড়ের সাঁ সাঁ শব্দে ভয়ে তাদের প্রাণ উড়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। তাঁবুর দড়িগুলো ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। জিনিসপত্র এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়লো। চুলা ও হাঁড়ি-পাতিল সব ওলট-পালট হয়ে গেল। ঝড় শুধু একা আসেনি, সাথে নিয়ে এসেছে বালি আর কাঁকর। ফলে শত্রুদের চোখ-মুখ সব অন্ধকার করে দিলো। কেউ

TOP

কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। প্রচণ্ড ভয়ে তারা চিৎকার ও আর্তনাদ করতে লাগলো। হায় সর্বনাশ! হায় সর্বনাশ! সব শেষ হয়ে গেল। এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন,

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُوْدٌ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ○

হে মুমিনগণ, তোমাদের প্রতি আল্লাহর প্রদত্ত নিয়ামতের কথা স্মরণ করো, যখন কাফেরদের বহুদল তোমাদের মাথার উপর এসে পড়ে, সে সময় আমি তাদের বিপরীতে পাঠালাম ঝঞ্ঝাবায়ু এবং আকাশ থেকে এমন সেনাদল, যাদের তোমরা দেখতে পাও না। তোমরা যা-কিছু করো, আল্লাহ তার সবই দেখেন। (সূরা আহযাব, আয়াত:৯)

وَجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا

"এমন সেনাদল, যাদের তোমরা দেখতে পাও না"- দ্বারা ফেরেশতার দলকে বুঝানো হয়েছে, যারা কাফেরদের অন্তরে ভয়-ভীতির সঞ্চার করেছে। এর বিপরীতে তারাই মুসলিমদের অন্তরে সাহস ও দৃঢ়তা সৃষ্টি করেছে। ফলে কাফেরদের দশ হাজার সেনাদল ভীত-সন্ত্রস্ত ও অস্থিরচিত্ত পেরেশান অবস্থায় ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যায়। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا ؕ وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا ○

আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের ক্রুদ্ধাবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন, তারা কোন কল্যাণ লাভ করেনি, যুদ্ধে মুমিনদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী। (সূরা আহযাব, আয়াত:২৫)

হযরত হুযাইফা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নির্দেশ দিলেন, যাও, কাফেরদের খবর নিয়ে এসো। আমি বললাম, আমাকে আবার আটকে না ফেলে। শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাকে ধরতে পারবে না।

TOP

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জন্য দু‘আ করলেন,

اَللّٰهُمَّ احْفَظْهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَمِنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ فَوْقِهِ وَمِنْ تَحْتِهِ

হে আল্লাহ, আপনি তাকে হেফাজত রাখুন, তার সামনে থেকে, তার পিছন থেকে, তার ডান দিক থেকে, তার বামদিক থেকে, তার উপর দিক থেকে, তার নিচ থেকে।

সংবাদ সংগ্রহে হযরত হুজায়ফা রা.

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ দু‘আর বদৌলতে আমার অন্তর থেকে ভয় একেবারে দূর হয়ে গেল। আমি নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় প্রফুল্ল অন্তরে বেরিয়ে পড়লাম। যখন বের হচ্ছিলাম তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হুযাইফা, নিজের পক্ষ থেকে কিছু করো না।

আমি যখন কাফেরদের এলাকায় পৌঁছুলাম, তখন বাতাস এত তীব্র গতিতে চলছিল যে, কোনকিছু কোথাও স্থির থাকার সুযোগ ছিল না। সেই সাথে এত অন্ধকার যে, কোন কিছুই দেখার উপায় নেই। এমনি পরিস্থিতিতে আমি শুনলাম আবু সুফিয়ান বলছে, হে কুরাইশ বাহিনী, এখানে দাঁড়িয়ে থাকার উপায় নেই। আমাদের সব জন্তু ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। বনু কুরাইযাও আমাদের সাহায্য থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছে। আর এই ঝঞ্ঝাবায়ু আমাদের পেরেশান ও অস্থির করে দিচ্ছে। আমাদের চলাফেরা, ওঠা বসা সবকিছু বড় কঠিন হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় এটিই ভালো যে, আমরা ফিরে যাই। আবু সুফিয়ান এই কথাগুলো বলেই উটের পিঠে চড়ে বসলো।

হযরত হুযাইফা রা. বলেন, আমার অন্তরে তখন এ কথার উদয় হলো যে, তীর দিয়ে তাকে মেরে ফেলি। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম রওয়ানা হওয়ার সময় আমাকে যে নির্দেশ

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

দিয়েছিলেন নিজের পক্ষ থেকে কিছু করো না। এ নির্দেশের কথা স্মরণ থাকায় আমি এ কাজ থেকে বিরত থেকে ফিরে এলাম। (যুরকানী, ২:১১৮)

اَلْاٰنَ نَغْزُوْهُمْ وَلَا يَغْزُوْنَنَا نَحْنُ نَسِيْرُ اِلَيْهِمْ

ফিরে এসে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এসব তথ্য জানালাম। এরপর সকালে যখন দেখলেন কাফের বাহিনীর সবাই রাতেই পালিয়ে গিয়েছে। ময়দান একেবারেই মানবশূন্য। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন,

'এখন থেকে আমরাই মোকাবেলায় এগিয়ে যাবো; তারা আর আমাদের দিকে এগিয়ে আসবে না। আমরাই তাদের দিকে এগিয়ে যাবো।

অর্থাৎ কুফর এখন এতটাই দুর্বল হয়ে পড়েছে, তারা এগিয়ে এসে ইসলাম ও মুসলিমদের উপর হামলা করবে সে সাহস আর তাদের নেই। বরং এর বিপরীত অবস্থা এসে গেছে। এখন আমরাই এগিয়ে যাবো এবং তাদের উপর হামলা করবো। (বুখারী শরীফ, হা. নং ৪১১০)

ভোরবেলায় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় ফিরে এলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়ছিলেন,

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ

اٰئِبُوْنَ تَآئِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَنَصَرَ عَبْدَهٗ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهٗ

আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি একক। তার কোন শরীক নেই। রাজত্ব তারই। প্রশংসা কেবল তার জন্যই। তিনিই সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। আমরা সফর থেকে ফিরে আসছি। গুনাহ থেকে তাওবা করছি, ইবাদতের ইরাদা করছি। আমাদের প্রতিপালককে সিজদা করছি ও প্রশংসা করছি। আল্লাহ তা'আলা তার অঙ্গীকার পূরণ

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

করেছেন, তার বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং গোটা সম্মিলিত বাহিনীকে পরাস্ত করেছেন। (বুখারী শরীফ, হা. নং ১৭৯৭)

ইবনে সা'দ এবং বালাযুরী বলেন, অবরোধ মোট পনের দিন স্থায়ী হয়। ওয়াকেদী বলেন, এটিই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মত। প্রখ্যাত তাবেয়ী সায়িদ ইবনে মুসাইয়াব বলেন, কাফেরদের মদীনা অবরোধ মোট চব্বিশ দিন ছিল। আল্লাহ ভালো জানেন। এই যুদ্ধে মুশরিকদের তিন ব্যক্তি নিহত হয়।

১. আমর ইবনে আবদুদ।
২. নাওফাল ইবনে আবদুল্লাহ।
৩. মুনিয়া ইবনে উবাইদ।

অপরদিকে মুসলিমদের ছয়জন শাহাদাত লাভ করেন।

১. সা'দ ইবনে মুয়ায রা.।
২. আনাস ইবনে উয়াইস রা.।
৩. আবদুল্লাহ ইবনে সাহর রা.।
৪. তুফাইল ইবনে নুমান রা.।
৫. সা'লাবা ইবনে আনামাহ রা.।
৬. কা'ব ইবনে যায়েদ রা.।

হাফেজ দিময়াতী আরো দুটি নাম বর্ণনা করেছেন,
১. কায়স ইবনে যায়েদ রা.।
২. আবদুল্লাহ ইবনে আবু খালেদ রা.।

গাযওয়ায়ে খায়বার

'খায়বার' মদীনা থেকে ৯৬ মাইল দূরবর্তী কৃষি সম্পদের প্রাচুর্য ও দুর্গবেষ্টিত আরবের একটি শহর। হযরত আবু উবাইদ রহ. এর মতে প্রাচীন আরবগোত্র 'আমালিকা'র খায়বার নামক এক ব্যক্তির অবস্থানের কারণে এ শহরকে খায়বার নামে নামকরণ করা হয়।

TOP

Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com App Store

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, ইহুদীদের ভাষায় খায়বার শব্দের অর্থ ‘কেল্লা’ বা ‘দুর্গ’। যেহেতু এ শহর অনেক কেল্লা এবং দুর্গবেষ্টিত ছিল কাজেই তাকে খায়বার নামে নামকরণ করা হয়েছে। (ফাতহুল বারী, ৭:৫৭৬, মুজামুল বুলদান লিল হামাউয়ী, ২:৪৬৯)

খায়বারযুদ্ধের প্রেক্ষাপট

হাফেয ইবনে হাজার রহ. বলেন, হিজরতের পর কাফেররা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোকাবেলায় তিন শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে,

১. এক শ্রেণি পূর্ববৎ শত্রুতা এবং যুদ্ধ অব্যাহত রাখে। মক্কার কুরাইশরা এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ছিল।

২. এক শ্রেণি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের জয়-পরাজয়ের ব্যাপারে ভবিষ্যতের অপেক্ষায় নীরবতা অবলম্বন করে। ইসলামও গ্রহণ করলো না এবং শত্রুতায়ও অবতীর্ণ হলো না। আরবের কোন কোন গোত্রের ভূমিকা এমন ছিল।

৩. এক শ্রেণি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এ মর্মে ‘মৈত্রি চুক্তি’ তে আবদ্ধ হয়, তারা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে না এবং তার বিরুদ্ধে কারো সহযোগিতা করবে না। মদীনার ইহুদী গোত্র- বনু কুরাইযা, বনু নাযির এবং বনু কায়নুকা; এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু এ তিন ইহুদী-গোত্রই পর্যায়ক্রমে মৈত্রী চুক্তি ভঙ্গ করে গোপনে-প্রকাশ্যে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধ-ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। ফলে তিন গোত্রকেই নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম দমন করে মদীনা হতে বহিষ্কার করেন। (ফাতহুল বারী, ৭:৪০২)

এরই ধারাবাহিকতায় চতুর্থ হিজরিতে মদীনার ইহুদী সম্প্রদায় বনী নযীর কে মদীনা থেকে বহিষ্কার করা হয়। বহিষ্কৃত ইহুদীদের অধিকাংশ খায়বারে গিয়ে বসতি স্থাপন করে। যাদের মধ্যে ইহুদী

সরদার হুয়াই ইবনে আখতাব, কিনানা ইবনে রবী এবং সাল্লাম ইবনে আবুল হুকাইকও ছিল। খায়বারে বহিষ্কৃত হয়েও তারা ইসলাম ও মুসলিমদের ধ্বংস-সাধনে প্রচেষ্টারত হয়।

এ প্রচেষ্টারই অংশ হিসেবে ইহুদী নেতা হুয়াই ইবনে আখতাব মক্কায় গিয়ে কুরাইশ নেতাদের মদীনায় মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উসকানি দিয়েছিল। একইভাবে কিনানা ইবনে রবী গাতফান গোত্রকে খায়বারের বাৎসরিক উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক প্রদানের লোভ দেখিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করেছিল। তাদের এ উসকানি ও প্ররোচনায় সাড়া দিয়ে উয়াইনা ইবনে হিসন তার মিত্রগোত্র নিয়ে এবং আবু সুফিয়ান কুরাইশদের নিয়ে মুসলিমদের উপর হামলার উদ্দেশ্যে মদীনায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। ইতিহাসে তা আহযাব যুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ। *(ফাতহুল বারী, ৭:৪০২)* যে যুদ্ধের বর্ণনা পাঠক ইতোপূর্বে অবগত হয়েছেন।

খায়বারের ইহুদীদের বারবার এভাবে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার অপরাধে আল্লাহ তা'আলা নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খায়বার আক্রমণের নির্দেশ দেন। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪:১৯৮; সীরাতে মুস্তফা, ২:২৬৭,৩০৭,৪০৮)

খায়বার যুদ্ধে বিজয়ের সুসংবাদ

ষষ্ঠ হিজরিতে হুদায়বিয়া হতে প্রত্যাবর্তনকালে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খায়বার যুদ্ধে বিজয়ের ভবিষ্যত সুসংবাদ প্রদান করেন,

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَ اَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا ○ وَّ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَّاْخُذُوْنَهَا ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ○ وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَاْخُذُوْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ

GET ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

وَ كَفَّ اَيۡدِىَ النَّاسِ عَنۡكُمۡ ۚ وَ لِتَكُوۡنَ اٰيَةً لِّلۡمُؤۡمِنِيۡنَ وَ يَهۡدِيَكُمۡ صِرَاطًا مُّسۡتَقِيۡمًا ۙ

নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের প্রতি খুশি হয়েছেন, যখন তারা গাছের নিচে আপনার কাছে বাই'আত গ্রহণ করছিল। তাদের অন্তরে যা-কিছু ছিল সে সম্পর্কেও তিনি অবগত ছিলেন। তাই তিনি তাদের উপরে অবতীর্ণ করলেন প্রশান্তি এবং পুরস্কারস্বরূপ তাদের দান করলেন আসন্ন বিজয় এবং বিপুল পরিমাণ গনিমতের মালও, যা তারা হস্তগত করবে। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন প্রচুর গনিমাতের, যা তোমরা হস্তগত করবে এবং তিনি তাৎক্ষণিকভাবে তোমাদের এ বিজয় দান করেছেন। (সূরা ফাতহ, আয়াত:১৮-২০)

এ আয়াতে ' বাই'আত' দ্বারা বায়' আতে রিদওয়ান এবং ' আসন্ন বিজয়' ও ' তাৎক্ষণিক বিজয়' দ্বারা খায়বার বিজয়ের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে।

খায়বারযুদ্ধের সময়কাল

ইমাম মালেক রহ. ও ইবনে হাযম জহেরী রহ. এর মতে খায়বার যুদ্ধ ষষ্ঠ হিজরিতে সংঘটিত হয়। তবে ইবনে ইসহাক রহ. এর মতে তা সপ্তম হিজরিতে সংঘটিত হয়েছে। আল্লামা ইবনে হাজার রহ. ও আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. ইবনে ইসহাকের মতটিই প্রাধান্য দিয়েছেন। অর্থাৎ ষষ্ঠ হিজরির জিলহজ্জ মাসের শেষদিকে হুদায়বিয়া হতে নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। এরপর সপ্তম হিজরির মহররম মাসের শুরুর কিছুদিন পর্যন্ত মদীনায় অবস্থান করেন। অতঃপর মহররমের শেষদিকে খায়বারের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ যাত্রা করেন।

হুদায়বিয়া হতে প্রত্যাবর্তনের পর খায়বারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতদিন মদীনায় ছিলেন,

এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। কারো মতে বিশদিন, কারো মতে দশদিন, আবার কারো মতে পনেরোদিন অবস্থান করেন। (ফাতহুল বারী, ৭:৫৭৬; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪:১৯৮)

খায়বারযুদ্ধের সৈন্যদল

ইবনে ইসহাক রহ. হযরত জাবের রা. এর সূত্রে বর্ণনা করেন, খায়বারে মুজাহিদদের সংখ্যা হুদায়বিয়ার মুসলিমদের সমপরিমাণ ছিল। অর্থাৎ ১৪০০। তাদের মধ্যে দুইশ' অশ্বারোহী এবং বারোশ' ছিল পদাতিক। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪:১৭০, ২২০)

এর বিপরীতে হযরত মুজাম্মা ইবনে জারিয়া রা.-এর সূত্রে বর্ণিত, খায়বারের যুদ্ধে মুসলিমদের সংখ্যা ছিল ষোল শ'। এর মধ্যে পদাতিক চৌদ্দশ'এবং অশ্বারোহী দুইশ'ছিল। (আবু দাউদ, হাদীস নং ৩০১০) এর বিপরীতে খায়বারের ইহুদীদের সংখ্যা ছিল দশ হাজার। [শরহুয যুরকানী ৩: ২৪৩; (সীরাতে মুস্তফা, ২:৪০৯)]

নবীজীর স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ

খায়বার যুদ্ধে গমনের পূর্বে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় তার স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করে যান। ইবনে হিশাম রহ. এর মতে নিয়োগকৃত গভর্নর ছিলেন নুমায়লা ইবনে আবদুল্লাহ লাইসী রা.। তবে হযরত আবু হুরায়রা রা. এর সূত্রে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সিবা ইবনে উরফুতা গিফারী রা. কে স্থলাভিষিক্ত করেন। হাফেয ইবনে হাজার রহ. এ মতটি সঠিক বলে উল্লেখ করেছেন।

এ সফরে 'উম্মুল মুমিনীনে'র মধ্য হতে হযরত উম্মে সালামা রা. নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলেন। (মুসনাদে আহমাদ:৮৫৫২; মুসতাদরাকে হাকীম:২২৪১; সিরাতুন্নবী:আল্লামা শিবলী নুমানী ও আল্লামা সুলাইমান নদভী রহ. ১:২৯৫)

জিহাদের পথে রওয়ানা এবং শাহাদাতের সুসংবাদ

GET ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

জিহাদের পথে আত্মোৎসর্গকারী সাহাবীদের গমন ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। তারা ছিলেন আল্লাহর উপর ঈমান ও ইখলাসে পরিপূর্ণ। প্রিয়নবীর সাথে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ রণাঙ্গন ছিল তাদের জন্য জান্নাতের বাগিচা। শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করে আল্লাহর প্রিয়ভাজন হওয়ার সহজতম পন্থা।

এ কারণেই নবীজীর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যখন সাহাবা কাফেলা খায়বারের পথে যাত্রা শুরু করে তখন হযরত আমের ইবনুল আকওয়া, যিনি একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন এবং সম্পর্কে হযরত সালামা ইবনুল আকওয়ার চাচা ছিলেন, তিনি আবৃত্তি করছিলেন,

اللّٰهُمَّلولاانتمااهتدينا + ولاتصدقناولاصلينا

فاغفرفداءلكماابقينا + وثبتالاقدامانلاقينا

والقينسكينةعلينا + انااذاصيحبناابينا

وبالصياحعولواعلينا

হে আল্লাহ, যদি আপনার তাওফীক না হতো, তা হলে আমরা না সঠিক পথের দিশা পেতাম, না নামায পড়তে কিংবা সদকা করতে পারতাম।

আপনি আমাদের জীবনের সকল গুনাহ মাফ করে দিন এবং শত্রুর মোকাবেলায় আমাদের দৃঢ়পদ রাখুন। (আপনার সন্তুষ্টির তরে আমাদের জীবন উৎসর্গিত হোক।)

আর আমাদের উপর সাকীনা অবতীর্ণ করুন। যদি কাফেররা আমাদের কুফরের দিকে ধাবিত করতে বদ্ধপরিকর হয় তবু আমরা তা প্রত্যাখ্যান করব।

যারা আমাদেরকে তাদের সাহায্যের জন্য আহ্বান করবে তারা আমাদের উপর আস্থা নিয়েই আহ্বান করবে। (কাশফুল বারী:খায়বার যুদ্ধ অধ্যায়)

TOP

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমেরের এ কবিতা শুনে বললেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা তোমার প্রতি রহম করুন’। অপর বর্ণনায় এসেছে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা তোমাকে ক্ষমা করে দিন’।

বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত সালামা রা. বলেন, (জিহাদের ময়দানে) নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কারো জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করতেন তখন সে অবশ্যই শহীদ হতো!

আমেরের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষমা প্রার্থনার অর্থ বুঝতে পেরে হযরত উমর রা. বললেন, হে আল্লাহর নবী, আমেরের জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে গেল। কতই-না ভালো হতো যদি আমরা আমেরের বীরত্ব দ্বারা আরো কিছুদিন উপকৃত হতে পারতাম!’

হযরত আমের এ যুদ্ধেই শহীদ হয়ে যান। (বুখারী শরীফ, হা. নং ৪১৯৬; মুসলিম, হা. নং ১৮০৭)

খায়বারের উপকণ্ঠে

শাহাদাতের পিয়াসী সাহাবীদের পবিত্র এই জামা‘আতকে নিয়েই নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বারের উপকণ্ঠে উপনীত হন।

ইবনে ইসহাক রহ, বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বারের নিকটে পৌঁছে ইহুদী এবং গাতফান গোত্রের অবস্থানস্থলের মধ্যবর্তী ‘রজী’ নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করেন। যেন ইহুদীদের মিত্র ‘গাতফানের’ লোকেরা ইহুদীদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসতে না পারে।

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ যুদ্ধকৌশল সফল হয় এবং গাতফান গোত্রের লোকেরা নিজেদের পরিবার-পরিজন ও সহায়-সম্পদের চিন্তায় ইহুদীদের সহযোগিতা থেকে বিরত থাকে। (ফাতহুল বারী, ৭:৫৮০)

GET ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

নবীজীর বাহন

খায়বারের বসতিতে প্রবেশকালে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাহন কী ছিল? এ ব্যাপারে ‘মুসতাদরাকে হাকিমে’ হযরত আনাস রা. থেকে এবং সুনানে আবু দাউদে হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর রা. থেকে বর্ণিত হাদীস দুটি দ্বারা জানা যায়, এ দিন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাহন ছিল গাধা, যার লাগাম খেজুর গাছের আঁশের রশি দ্বারা তৈরীকৃত ছিল। (মুসতাদরাকে হাকীম, হা. নং ৩৭৩৪; সুনানে আবু দাউদ, হা. নং ১২২৬)

তবে বুখারী শরীফে হযরত আনাস রা. এর অপর এক বর্ণনার আলোকে আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. এর মত হলো, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দিন ঘোড়ায় আরোহন করেছিলেন। তবে দুর্গ অবরোধকালে কোন দিন হয়তো গাধায় আরোহন করে থাকবেন। যা অন্য বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে। (আল বিদায়া ওয়াননিহায়া, ৪:২০২)

জনপদে প্রবেশের আদব শিক্ষাদান

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খায়বারের নিকটবর্তী হলেন তখন সেখানে প্রবেশের পূর্বে এ দু‘আ পড়লেন,

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ

وَمَا اظْلَلْنَ وَرَبَّ الْاَرْضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا اَقْلَلْنَ وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا اَضْلَلْنَ وَرَبَّ الرِّيَا

حِ وَمَا ذَرَيْنَ فَاِنَّا نَسْاَلُكَ مِنْ خَيْرِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرِ اَهْلِهَا

وَخَيْرِ مَا فِيْهَا وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ اَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا

‘হে আল্লাহ, হে সাত আসমান সাত জমিন এবং এ দুইয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর রব, হে ঐ পবিত্র সত্তা, যিনি পথভ্রষ্টকারী শয়তানের রব এবং শয়তান যাদের বিভ্রান্ত করে, তাদের রব, হে ঐ মহান সত্তা, যিনি বাতাসসমূহের এবং বাতাস যাতে প্রবাহিত হয় সেসব কিছুর রব, আমরা আপনার কাছে এ জনপদের এবং জনপদবাসীর কল্যাণ কামনা করছি। এবং এ জনপদ, তার অধিবাসী ও তার সবকিছুর অনিষ্ট থেকে

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি'। (আস সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ী, হা. নং ১০৩০৪)

আক্রমণের সূচনা এবং প্রিয়নবীর যবানে বিজয়ের সুসংবাদ

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদীদের উপর আক্রমণ এমন অবস্থায় করলেন যে, তারা সকালে তাদের ফসলি জমিতে কাজ করার উদ্দেশ্যে জমি চাষের বিভিন্ন সরঞ্জাম নিয়ে বের হচ্ছিল। তারা আমাদের দেখে বলে উঠলো,

محمد! والله،محمد! والخميس!!

হায়! খোদার কসম, মুহাম্মাদ তো তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে আক্রমণ করে বসেছে! এ কথা বলে তারা তাদের দুর্গের ভিতর আশ্রয় নিল।

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাদের দেখলেন তখন বললেন,

اللهاكبر،اللهاكبر،خربت خيبر،انااذانزلنابساحةقومفساءصباحالمنذرين

'আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার!! খায়বার ধ্বংস হবে। আমরা যখন কোন জনপদের আঙিনায় অবতরণ করি তখন যাদের সতর্ক করা হয়েছে তাদের প্রভাত হবে অতি মন্দ'। (বুখারী শরীফ হা. নং ৬১০, ২৯৯১)

'খায়বার ধ্বংস হবে' এ কথাটির ব্যাখ্যা হলো, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন, আল্লাহ তা'আলা খায়বারের ইহুদীদের তার হাতে পরাজিত করবেন। (ফাতহুল বারী, ৭:৫৮১; সিরাতে হালবিয়্যাহ, ৩:১২৩)

খায়বারের দুর্গসমূহ

খায়বারে ইহুদীদের ছোট-বড় বহুসংখ্যক দুর্গ ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেগুলো ধারাবাহিকভাবে বিজয় করেন। এ সকল বিজিত দুর্গের সংখ্যা, নাম ও বিজয়ের ধারাবাহিকতার ব্যাপারে ঐতিহাসিকগণের একাধিক মত রয়েছে। এক্ষেত্রে ঐতিহাসিকগণ যে সকল দুর্গের নাম উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে ছয়টির নাম এখানে উল্লেখ করা হলো।

TOP

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

১. নাইম দুর্গ।
২. কামুস দুর্গ।
৩. সা'দ বিন মুয়ায দুর্গ।
৪. কুল্লা দুর্গ। এটি গনীমত বণ্টনের সময় হযরত যুবায়ের রা. এর হাতে আসায় তাকে 'যুবায়ের দুর্গ' ও বলা হয়।
৫. ও ৬. ওয়াতীহ ও সুলালিম। এই দুর্গ দুটি দুর্গের সরদার 'ইবনে আবুল হুকাইক-এর দুর্গ' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। সবশেষে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুর্গ দুটি জয় করেন।

কোন কোন ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন, কুল্লা দুর্গ জয় করার পর নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছোট ছোট আরো কিছু দুর্গ জয় করেন। আল্লামা ওয়াকিদী রহ. এক্ষেত্রে 'উবাই দুর্গ'- এর নাম উল্লেখ করেছেন। আল্লামা যুরকানী রহ. উবাই দুর্গ-এর সাথে 'বারী দুর্গ'- এর নামও উল্লেখ করেছেন। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪:২০৯-২১১, ২১৫-২১৬; কাশফুল বারী, খায়বার যুদ্ধ অধ্যায়, সীরাতে মুস্তফা, ২:৪১২)

নাইম দুর্গ বিজয়

সর্বপ্রথম নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দুর্গটি জয় করেন তা হল নাইম দুর্গ। এ দুর্গ বিজয়কালে সাহাবী হযরত মাহমুদ ইবনে সালামা রা. শহীদ হন। আল্লামা হালাবী রহ. বলেন, যুদ্ধ করতে করতে যখন তিনি ক্লান্ত হয়ে নাইম দুর্গের এক কোনায় দেয়ালের ছায়ায় বিশ্রামের জন্য বসে পড়েন, তখন উপর থেকে পাথরের চাক্কি ফেলে তাকে শহীদ করে দেওয়া হয়। কারো মতে, মারহাব নামক ইহুদী আর কারো মতে, কিনানা ইবনে রবী পাথর নিক্ষেপ করে তাকে শহীদ করে। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪:২০৪; সীরাতে মুস্তফা, ২:৪১২)

কামুস দুর্গ বিজয়

নাইম দুর্গের পর মুসলিমরা কামুস দুর্গের দিকে অগ্রসর হলো। খায়বারের অন্যান্য সকল দুর্গের তুলনায় কামুস ছিল অধিক মজবুত এবং সুরক্ষিত। প্রখ্যাত ইহুদী বীর পাহলোয়ান মারহাব এখানেই ছিল।

সহস্র যোদ্ধার সমান মনে করা হতো তাকে। প্রায় বিশদিন পর্যন্ত মুসলিমরা এ দুর্গ অবরোধ করে রাখেন। (ফাতহুল বারী, ৭:৫৮১)

খায়বার (-এর কামুস দুর্গ) অবরোধ করার পর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর রা. ও হযরত উমর রা. কে ক্রমান্বয়ে তা বিজয় করার জন্য পাঠালেন। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলার ফায়সালা না থাকায় তারা উভয়েই অকৃতকার্য হয়ে ফিরে আসেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

انیدافعاللو اءغداالیٰ ر جلیحبهااللهور سولهو یحبااللهور سولهلایر جعحتیٰیفتحله

আগামীকাল আমি এমন একজনকে পতাকা দিব, যাকে আল্লাহ এবং তার রাসূল ভালোবাসেন এবং সেও আল্লাহ এবং তার রাসূলকে ভালোবাসে! আর সে ঐ কেল্লা ফাতাহ না করে ফিরে আসবে না। (বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ)

মনে মনে প্রত্যেক সাহাবীই চাচ্ছিলেন ‘বিজয় নিশান’ এর সৌভাগ্যের অধিকারী হতে। কিন্তু সকালে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রা. কে ডাকলেন। আলী রা. চক্ষুরোগে আক্রান্ত ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার চোখে থুথু লাগিয়ে দিলেন এবং তার জন্য দু‘আ করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু‘আর বরকতে আলী রা. তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলেন। এরপর আর কোন দিন তিনি চক্ষু রোগে আক্রান্ত হননি। (ফাতহুল বারী, ৭:৫৮৮)

এরপর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রা. কে পতাকা দিলেন। আলী রা. বললেন,

افاقتلهمحتیٰیکو نو امثلنا؟

কাফেররা আমাদের ন্যায় মুসলমান হওয়ার আগ পর্যন্ত কি আমি তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ চালিয়ে যাবো?’

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

TOP

انفذعلیٰرسلکحتیٰتنزلبسحاتهمثمادعهمالیٰالاسلامواخبرهمبمايجبعليهمفواللهلانیهديااللهبکر

جلاخیرلکمنحمرالنعم

ধীরে-সুস্থে চলো হে আলী, তাদের মুখোমুখি হলে প্রথমতঃ তাদের ইসলাম গ্রহণের দিকে আহ্বান করো এবং তাদের আল্লাহর বিধান সম্পর্কে অবগত করো। আল্লাহর শপথ, আল্লাহ তা‘আলা তোমার মাধ্যমে কাউকে হেদায়েত দিবেন, এটা তোমার জন্য লাল উট প্রাপ্তির চেয়েও উত্তম।

মারহাবের সাথে যুদ্ধ

দুর্গ অবরোধ করার পর দুর্গের প্রখ্যাত ইহুদী বীর মারহাব দুর্গ থেকে বের হয়ে তার সাথে একক যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য মুসলিমদের প্রতি রণহুঙ্কার ছাড়তে লাগলো। হযরত আমের ইবনুল আকওয়া তার মোকাবেলায় অবতীর্ণ হলেন। কিন্তু দ্বৈত লড়াইয়ের এক পর্যায়ে ঘটনাক্রমে হযরত আমেরের একটি আঘাত ব্যর্থ হয়ে তাকেই শহীদ করে দিল। লোকেরা যখন এটাকে আত্মহত্যা মনে করে হযরত আমেরের আমলের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে গেল, তখন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সন্দেহ দূর করে বললেন,

کذبمنقالهانلهلاجرين-وجمعبيناصبعه-انهلجاهدمجاهدقلعربیمشیبهامثله

যারা তার আমল বাতিল হওয়ার কথা বলছে তারা ভুল করছে। (এরপর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাতের দু‘আঙুল একত্র করে ইশারা করে বললেন,) সে তো দু’সওয়াবের অধিকারী। নিশ্চয় সে অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু মুজাহিদ। তার মতো আরব অনেক কমই আল্লাহর জমিনে রয়েছে!

এরপর পাহলোয়ান মারহাব রণসঙ্গীত গেয়ে গেয়ে ময়দানে হযরত আলী রা. এর মোকাবেলায় অবতীর্ণ হলো।

قَدْعَلِمَتْخَيْبَرُاَنِّيمَرْحَبُ ... شَاكِياالسِّلَاحِبَطَلٌمُجَرَّباذَاالْحُرُوبُاَقْبَلَتْتَلَهَّب

www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com

খায়বারবাসীরা জানে, আমি হলাম মারহাব। ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ রণাঙ্গনে যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত, অভিজ্ঞ সৈনিক।

হযরত আলী রা. সঙ্গীতের মাধ্যমেই তার জবাব দিয়ে অগ্রসর হলেন,

انَاالَّذِيسَمَّتْنِيامِّيحَيْدَرَهْ... كَلَيْثِغَابَاتٍكَرِيهِالْمَنْظَرَهْاوفِيهِمُبِالصَّاعِكَيْلَالسَّنْدَرَهْ

আমি ঐ বীর, যাকে তার মা নাম রেখেছে ‘হায়দার’ (সিংহ), যা বনের হিংস্র সিংহের মতোই সাক্ষাত মৃত্যু! প্রতিপক্ষের প্রতি আমার আঘাত অত্যন্ত নির্মম হয়ে থাকে!’

এরপর আলী রা. মারহাবের কথিত বীরত্ব মুহূর্তেই ইতিহাসে পরিণত করলেন। এক আঘাতেই মারহাব দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। খায়বার দুর্গের পতনও নিশ্চিত হলো। (মুসনাদে আহমাদ, ২২৯৯৩; বুখারী, ৩০০৯, ৪১৯৬; মুসলিম, ১৮০৭)

এ বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, মারহাবকে হত্যা করেন হযরত আলী রা.। কিন্তু হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. এর বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, মারহাবের মোকাবেলা করার জন্য সাহাবী মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অনুমতি চাইলেন। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি দিলেন এবং তার জন্য দু‘আ করলেন, ‘আয় আল্লাহ, তুমি তাকে সাহায্য কর।’

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু‘আর বরকতে মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা মারহাবকে হত্যা করে ফেললেন। (মুসনাদে আহমাদ, হা.নং ১৫১৩৪)

ইমাম ইবনুল আসির রহ. মারহাবের হত্যাকাণ্ড হযরত আলী রা. এর হাতে হওয়ার মতটি অধিকাংশ আলেমের মত বলে উল্লেখ করেছেন। তবে ইমাম ইবনে আবদুল বার রহ. এর মত হলো, মারহাবকে মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা হত্যা করেন।

ইমামুল মাগাযী আল্লামা ওয়াকিদী রহ. এ দু’বর্ণনার মাঝে সমন্বয়সাধন করে বলেন, মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা মারহাবকে তার পা কেটে

আহত করেছিল। আর পরবর্তী সময়ে আলী রা. মারহাবের মাথা কেটে তাকে হত্যা করেন। (ফাতহুল বারী, ৭:৫৯০; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪:২০৪-২০৬)

আলী রা.-এর বীরত্ব সংক্রান্ত একটি অগ্রহণযোগ্য বর্ণনা

কামুস দুর্গ বিজয়কালে হযরত আলী রা. এর বীরত্ব সম্পর্কে ইমাম বায়হাকী রহ. দুটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন।

একটি হযরত আবু রাফে রা. থেকে, যাতে উল্লেখ হয়েছে, কামুসদুর্গ জয়ে যদ্ধুরত অবস্থায় হযরত আলী রা. এর ঢাল ভেঙে গেলে তিনি দুর্গের দরজা উঠিয়ে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেন। পরবর্তী সময় আটজন জোয়ানের পক্ষেও সে দরজা বহন করা সম্ভব হয়নি।

দ্বিতীয় বর্ণনাটি হযরত জাবের রা. এর সূত্রে, যাতে এক সনদে (আটজনের পরিবর্তে) চল্লিশজন আর অন্য সনদে সত্তরজনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (দালায়িলুন নুবুওয়াহ লিল বায়হাকী, ৪:২০৫)

কিন্তু এসব রেওয়ায়েত সনদের দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণযোগ্য পর্যায়ের নয়। ইমাম বায়হাকী রহ. এই দুই রেওয়ায়েতকে যয়িফ সাব্যস্ত করেছেন। এ ছাড়াও ইমাম সাখাবী রহ. ও এ বর্ণনাগুলোর অগ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে বলেন,

قلت : بلكلهاواهيةولذاانكرهبعضالعلماء

এ বর্ণনাগুলোর সবকটিই অত্যন্ত দূর্বল। এ কারণেই আলেমগণ এ ঘটনার শুদ্ধতা মেনে নেননি। (আল মাকাসিদুল হাসানাহ, পৃষ্ঠা-২২৬)

ইমাম যাহাবী রহ. হযরত জাবের রা. এর রেওয়ায়েতের অগ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে বলেন,

هذامنكر

এ বর্ণনাটি মুনকার পর্যায়ের। (মীযানুল ইতিদাল, ৩:১১৩)

TOP

আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. সবগুলো রেওয়ায়েতকে যয়িফ সাব্যস্ত করে হযরত আবু রাফে-এর রেওয়ায়েত সম্পর্কে বলেন,

وفى هذا الخبر جهالة وانقطاع ظاهر

এ সনদের একজন বর্ণনাকারী অজ্ঞাত এবং সনদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪:২০৭)

উম্মুল মুমিনীন হযরত সাফিয়া রা. প্রসঙ্গ

হযরত সাফিয়া রা. ছিলেন ইহুদী-নেতা হুয়াই ইবনে আখতাবের মেয়ে এবং হযরত হারুন আলাইহিস সালামের বংশধর। প্রথমত তার বিয়ে হয়েছিল ইহুদী সাল্লাম ইবনে মিশকামের সাথে। তার থেকে বিচ্ছেদের পর তার বিয়ে হয় কিনানা ইবনে রবীর সাথে।

কামুস দুর্গ বিজয় হওয়ার পর অনেক ইহুদী নারী মুসলিমদের কয়েদি হিসেবে বন্দি হয়, যাদের মধ্যে হযরত সাফিয়াও ছিলেন। হযরত দিহইয়া কালবী রা. নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে একটি বাঁদী চাইলেন। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তার পছন্দমত একটি বাঁদী নিয়ে যেতে বললেন। হযরত দিহইয়া কালবী রা. সাফিয়াকে নিয়ে নিলেন। (বুখারী শরীফ, ২৮৯৩, ৪২১১; আবু দাউদ, ২৯৯১, ২৯৯৪, ২৯৯৭, ২৯৯৮)

হযরত সাফিয়া ইহুদী-সরদারের মেয়ে এবং হারুন আলাইহিস সালামের বংশধর হওয়ায় বিশেষ সম্মানের অধিকারী ছিলেন। বন্দি ইহুদী নারীদের মধ্যে সাফিয়ার মতো সম্মানিত কেউ ছিল না। পক্ষান্তরে সাহাবীদের মধ্যে হযরত দিহইয়া কালবী রা. এর সমপর্যায়ের অনেক সাহাবীই ছিলেন।

সঙ্গত কারণেই জনৈক সাহাবী নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আপত্তি জানালেন এবং সাফিয়ার সম্মান বহাল রাখার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুরোধ করলেন, তিনি যেন সাফিয়াকে বিয়ে করে নেন। এ অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত দিহইয়াকে সাফিয়ার পরিবর্তে অপর

একটি বাঁদি-সাফিয়ার চাচাতো বোনকে দিলেন। সম্ভবত অতিরিক্ত সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে তাকে আরো কিছু গোলাম-বাঁদি দিলেন এবং সাফিয়াকে নিজের কাছে রেখে তার যথার্থ সম্মান বহাল রাখলেন। (আবু দাউদ শরীফের এক বর্ণনায় ২৯৯৭)

পরবর্তী সময়ে হযরত সাফিয়া রা. ইসলাম গ্রহণ করলে এবং তার স্বামী কিনানা খায়বারযুদ্ধে নিহত হলে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আযাদ করে বিয়ে করে নিলেন।

খায়বার যুদ্ধ হতে ফেরার পথে ‘সাহবা’ নামক স্থানে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত সাদাসিধেভাবে ‘হাইস’ (খেজুর, পনীর ও ঘি দ্বারা তৈরীকৃত খাবার বিশেষ) দ্বারা সাহাবীদের অলিমা খাওয়ান এবং তিন দিন সেখানে অবস্থান করেন। (ফাতহুল বারী, ৭:৫৮২-৫৯০,৫৯১; উমদাদুল ক্বারী, ১২:২১৫, ২২২)

সা‘দ বিন মুয়ায দুর্গ বিজয়

কামুস দুর্গ বিজয় করার পর মুসলিমরা সা‘দ বিন মুয়ায দুর্গ জয় করার পথে অগ্রসর হন। খাদ্যসম্ভারের দিক থেকে এ দুর্গ ইহুদীদের সবচেয়ে বড় আশ্রয় ছিল। আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. ইবনে ইসহাক ও ওয়াকিদী রহ. থেকে বর্ণনা করেন, কতক সাহাবী নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে খাদ্যসংকটের অভিযোগ করলে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জন্য দু‘আ করলেন,

اللّٰهُمَّانكقدعرفتحالهموانليستلهمقوةوانليسبيديشيءاعطيهماياهفافتحعليهماعظمحصونهاعنهم غنىوا كثرهاطعاماوودكا

হে আল্লাহ! আপনি জানেন তাদের কোন শক্তি নেই। আর আমার কাছেও এমন কিছু নেই, যা আমি তাদের দিতে পারি। খাদ্যসম্ভারের দিক থেকে সবচেয়ে বড় দুর্গটি আপনি তাদের বিজয় করার তাওফীক দান করুন।

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ দু'আর বরকতে খুব সহজেই সাহাবায়ে কেরাম সা'দ বিন মুয়ায দুর্গ জয় করে নিলেন। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪:২১১; সীরাতে মুস্তফা, ২:৪১৫)

কুল্লা দুর্গ বিজয়

এরপর মুসলিমরা কুল্লা দুর্গের দিকে অগ্রসর হন। এটি একটি পাহাড়ের চূড়ায় নির্মাণ করা হয়। খায়বারের গনীমত বণ্টনের পর এ দুর্গ হযরত যুবায়ের রা. এর অংশে আসায় পরবর্তীকালে তাকে যুবায়ের কেল্লা নামে নামকরণ করা হয়। ইবনে কাসীর রহ. ইমাম ওয়াকিদীর বক্তব্য উল্লেখ করেন, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনদিন পর্যন্ত এ দুর্গ অবরোধ করে রাখেন।

কাফের যখন দীনের সৈনিক

এ দুর্গ অবরোধকালে আল্লাহ তা'আলা গায়েবিভাবে মুসলিমদের সাহায্য করলেন। এক ইহুদী নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে নিজের জানমালের নিরাপত্তার শর্তে দুর্গ বিজয়ের পথ বাতলে দেওয়ার অঙ্গীকার করলো। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিরাপত্তা দিলেন। ইহুদী নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললো, আপনি যদি এক মাসও এ দুর্গ অবরোধ করে রাখেন তবু আপনি তা বিজয় করতে পারবেন না। (কারণ ইহুদীদের কাছে কেল্লার ভিতরে যথেষ্ট খাদ্যসম্ভার মজুদ রয়েছে এবং) তারা দুর্গের বাইরে থেকে প্রবাহিত একটি নালার মাধ্যমে পানির প্রয়োজন পূরণ করে থাকে।

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সংবাদ পেয়ে বাইরে থেকে নালার পানির প্রবাহ বন্ধ করে দিলেন। ফলে দুর্গের ভেতরের ইহুদীরা বাধ্য হয়ে বের হয়ে এসে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। দশজন ইহুদী নিহত হলো। কয়েকজন মুসলমানও শহীদ হলেন। অবশেষে কুল্লা দুর্গ মুসলিমদের পদানত হলো। এভাবেই এক কাফের ইহুদীর মাধ্যমেই

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের বিজয় দান করলেন। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪:২১৬)

ওয়াতিহ ও সুলালিম দুর্গ বিজয়

কুল্লা দুর্গ বিজয়ের পর নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছোট ছোট কিছু দুর্গ জয় করেন। সবশেষে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াতিহ ও সুলালিম দুর্গ জয় করেন। ইহুদীরা অন্যান্য দুর্গ থেকে পরাজিত হয়ে এ দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিল। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায় ১৪দিন এ দুর্গ দুটি অবরোধ করে রাখেন। ইহুদীরা যখন নিজেদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী দেখতে পেল, তখন দুর্গ-অধিপতি ইবনে আবুল হুকাইক সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে দুর্গ থেকে নেমে এলো। হযরত ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সন্ধির প্রস্তাব দুটি শর্তে মেনে নেনঃ

- সোনা, রুপা এবং সকল যুদ্ধাস্ত্র তারা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সমর্পণ করে কেবল নিজেদের নিত্য-দিনের ব্যবহার্য্য সামগ্রী তাদের উট-ঘোড়ার বহনশক্তি পরিমাণ সাথে নিয়ে খায়বার ছেড়ে চলে যাবে।
- উল্লিখিত কোন নিষিদ্ধ জিনিস তারা গোপন করবে না বা লুকিয়ে নিয়ে যাবে না। (আবু দাউদ, হা. নং ৩০০৬; বায়হাকী, হা. নং ১৮৩৮৭)

কিন্তু ইহুদীরা এ শর্ত রক্ষা করলো না। বরং বনু কুরাইযার নেতা হুয়াই ইবনে আখতাবের একটি সোনা-রুপার থলে লুকিয়ে ফেললো। কিন্তু এ বিশ্বাসঘাতকতার কথা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম জেনে ফেললেন। যদ্দরূন সন্ধিচুক্তি ভেঙ্গে গেল। ফলে তিনি ইবনে আবুল হুকাইক এবং তার পরিবারের কয়েকজনকে হত্যার নির্দেশ দিলেন। যাদের মধ্যে সাফিয়ার ইহুদী স্বামী কিনানাও ছিল এবং ইহুদীদের সন্তান ও নারীদের বন্দি করলেন। তাদের সকল সম্পদ মুসলিমদের মাঝে বণ্টন করে দিলেন।

পরিশেষে যখন তাদের দেশান্তর করতে চাইলেন, তখন তারা আবেদন করলো যেন তাদের দেশান্তর না করে খায়বারে মুসলিমদের অধিকৃত ভূমিতে চাষাবাদের জন্য গোলাম হিসেবে রেখে দেওয়া হয়। উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক প্রদানের শর্তে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এ অনুরোধ মেনে নিলেন। এ মর্মে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রা. প্রতি বছর তাদের থেকে উক্ত ফসল উসুল করতেন।

হযরত ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেন যে, ইহুদীদের খায়বারে থেকে যাওয়ার সময়সীমার বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ ইচ্ছার উপর শর্ত আরোপ করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে হযরত উমর রা. ইহুদীদের খায়বার থেকে বহিষ্কার করে ‘তাইমা’ ও ‘আরিহা’ অঞ্চলের দিকে পাঠিয়ে দেন। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪:২২১,২১৬,২৩৭; ফাতহুল বারী, ৭:৫৮৯-৫৯০)

যা বর্তমানে সৌদি আরবের উত্তরপ্রান্তে ও জর্দানের সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থিত।

ইমামুল মাগাযী আল্লামা ওয়াকিদী রহ. এর মতে, খায়বার যুদ্ধে সর্বমোট পনেরোজন মুসলমান শহীদ হন। হাফেয ইবনে কাসীর রহ. ‘আলবিদায়া ওয়াননিহায়া’ গ্রন্থে তাদের নাম উল্লেখ করেছেন। (সীরাতে ইবনে হিশাম, ৩:৩৭৩; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪:২৩২)

খায়বার বিজয়ের পর মুসলিমদের সচ্ছলতা লাভ

খায়বার বিজয়ের পর গরিব মুসলিমদের জীবন-জীবিকায় সচ্ছলতা চলে আসে। আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র কুরআনে সূরা ফাতহে গনীমত প্রদানের যে ওয়াদা করেছিলেন তা পূর্ণ করে দেন। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রা. বলেন,

لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ قُلْنَا الْآنَ نَشْبَعُ مِنَ التَّمْرِ

খায়বার বিজয়ের পর আমাদের জন্য খেজুর দ্বারা পরিতৃপ্ত হওয়ার সুযোগ হয়ে গেল। (বুখারী, হা.নং ৪২৪২)

আনসারদের প্রদত্ত বাগান ও শষ্যক্ষেত ফেরত প্রদান

হিজরতের পর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাজির ও আনসারদের ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ করে দিয়েছিলেন। নিঃস্ব মুহাজির সাহাবায়েকেরামের জীবন-জীবিকার নিমিত্তে আনসাররা নিজেদের শস্যক্ষেত ও বাগানের বাৎসরিক উৎপাদিত ফসলে তাদের শরীক করে নিয়েছিলেন।

আনসারী সাহাবী হযরত আনাস রা. এর মাতা উম্মে সুলাইম রা. তার একটি খেজুর বাগান মুহাজির সাহাবীয়া হযরত উম্মে আইমান রা. কে দিয়েছিলেন। খায়বার বিজয়ের পর যখন মুহাজির সাহাবীরাও সচ্ছল হয়ে গেলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদের বাগানসমূহ ফেরত দিয়ে দিলেন তখন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে সুলাইম এর বাগানও তাকে ফেরত দিয়ে দিলেন। এবং উম্মে আইমানকে সন্তুষ্ট করার নিমিত্তে তাকে নিজের একটি বাগানও দিয়ে দিলেন। (বুখারী, হা.নং ২৬৩০; সীরাতে মুস্তফা, ২:৪২৩)

গনিমতের সম্পদ বণ্টন

হুদায়বিয়ার ঘটনায় যেসকল সাহাবা শরীক ছিলেন কেবল তাদেরই খায়বার যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি ছিল। খায়বারযুদ্ধের গনীমত কেবল তাদের মাঝেই বণ্টন করা হয়। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪:২২০)

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, জিহাদে জয় লাভের পর গনিমতের সম্পদ বণ্টনকালে আমি উপস্থিত হলে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো আমাকে বঞ্চিত করেননি। তবে খায়বার যুদ্ধ এর ব্যতিক্রম ছিল। কেননা, এ যুদ্ধের গনীমত কেবল আহলে হুদায়বিয়ার জন্য নির্ধারিত ছিল। (মুসনাদে আহমাদ, হা.নং ১০৯১২)

এ কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবান ইবনে সায়িদ ও তার সাথীদের, যারা খায়বারযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি, তাদের চাওয়ার পরও কোন অংশ দেননি। (বুখারী, হা.নং ৪২৯৮)

TOP

বণ্টন পদ্ধতি

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম গনীমত হিসেবে প্রাপ্ত খায়বারের সমস্ত ফসলি জমিন মুজাহিদদের মাঝে বণ্টন করেননি; বরং এসব জমিনের অর্ধেক তিনি মুজাহিদদের মাঝে বণ্টন করেন। বাকি অর্ধেক সাধারণ মুসলিমদের নাগরিক-সুবিধা পূরণের নিমিত্তে রাষ্ট্রায়ত্ত করে রাখেন।

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাতিবা, ওয়াতিহ ও সুলালিম নামক স্থানগুলোর জমিনসমূহ রাষ্ট্রায়ত্ত করে রাখেন। আর শাক, নিতাহ ও তার পার্শ্ববর্তী জমিনগুলো বণ্টন করে দেন। বণ্টনের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম জমিনগুলো মোট আঠারো ভাগ করেন। অতঃপর প্রত্যেক অংশ একশত ভাগ করেন। (আবু দাউদ, হা.নং ৩০১০-৩০১৫)

এরপর এ আঠারোশত অংশ সকল মুজাহিদের মাঝে কীভাবে বণ্টন করা হলো, এ ব্যাপারে একাধিক মত রয়েছে।

কারো মতে, মুসলিমদের সৈন্যসংখ্যা ছিল ১৪০০। তার মধ্যে ১২০০ পদাতিক এবং ২০০ অশ্বারোহী। প্রত্যেক পদাতিককে এক অংশ এবং প্রত্যেক অশ্বারোহীকে তিন অংশ করে দেওয়া হয়।

আর কারো মতে, মুসলিমদের সৈন্যসংখ্যা ছিল ১৫০০। তার মধ্যে ১২০০ পদাতিক আর ৩০০ আশ্বারোহী। প্রত্যেক পদাতিককে এক অংশ এবং প্রত্যেক অশ্বারোহীকে দুই অংশ করে দেওয়া হয়েছে। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪:২১৮-২২০; সীরাতে মুস্তফা, ২:৪২১-৪২২)

'ফাদাক' বিজয়

ফাদাক মদীনা হতে দু'দিনের দূরত্বে খায়বারের নিকটবর্তী একটি জনপদের নাম। (মুজামুল বুলদান, ২:২৭০)

ফাদাকের ইহুদীরা যখন জানতে পারলো নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বার জয় করে নিয়েছেন তখন তারা কোন প্রকার যুদ্ধে

না জড়িয়ে মুহায়িসাহ ইবনে মাসউদের মধ্যস্থতায় সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে পাঠালো। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথেও খায়বারের ইহুদীদের ন্যায় বাৎসরিক অর্ধেক ফসল প্রদান করার শর্তে সন্ধি প্রস্তাব মেনে নিলেন। এবং বললেন, ‘যখন ইচ্ছা আমরা তোমাদের এবং খায়বারবাসীদের এখান থেকে বের করে দেব।’ (সীরাতে ইবনে হিশাম)

হাফেয ইবনে কাসীর রহ. বলেন, খায়বার যুদ্ধের গনীমত থেকে প্রাপ্ত নির্ধারিত অংশ, ফাদাক (সম্পূর্ণরূপে) এবং মদীনা হতে বহিষ্কৃত ইহুদী গোত্র বনু কুরাইযার রেখে যাওয়া সম্পত্তি ছিল নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের একক মালিকানা। অন্যান্য মুসলমানের তাতে কোন অংশ ছিল না। কেননা, ফাদাক ও বনু কুরাইযার সম্পদ মুসলিমরা যুদ্ধ করে জয় করেনি বরং আল্লাহ তা‘আলা বিনা যুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তা দিয়েছিলেন। এসব সম্পদ থেকেই নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মুল মুমিনীনকে বাৎসরিক ব্যয়ভার বহন করতেন। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪:২২০)

‘ওয়াদিয়ে কুরা’ বিজয়

‘ওয়াদিয়ে কুরা’ সিরিয়া ও মদীনার মধ্যবর্তী বহু জনপদ বিশিষ্ট একটি এলাকা। (মুজামুল বুলদান, ৫:৩৯৭)

হাফেয ইবনে কাসীর রহ. ইমাম ওয়াকিদী ও ইবনে ইসহাক রহ. থেকে বর্ণনা করেন, ফাদাক বিজয়ের পর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াদিয়ে কুরার দিকে যাত্রা করেন। ওয়াদিয়ে কুরার লোকেরা মুসলিমদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা পরাজয় তাদের ভাগ্যে লিখে রেখেছিলেন। এ যুদ্ধে তাদের এগারজন লোক নিহত হলো। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারদিন ওয়াদিয়ে কুরায় অবস্থান করে গনিমতের সম্পদ সাহাবীদের মাঝে বণ্টন করেন। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় চলে আসেন। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪:২৩৬; সীরাতে মুস্তফা, ২:৪৩৬)

TOP

অন্যের সম্পদে খেয়ানতের মন্দ পরিণতি

হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন যে, ওয়াদিয়ে কুরায় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক গোলাম ছিল, যার নাম ছিল ‘মিদআম’। যুবাইব গোত্রের ‘রিফাআ’ নামক এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ গোলাম হাদিয়া দিয়েছিলেন। অজানা কোন শত্রুর তীরের আঘাতে এ গোলাম নিহত হয়। সাহাবীরা তাকে শহীদ ঘোষণা করলে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা প্রত্যাখ্যান করে বললেন,

بل والذى نفسى بيده ان الشملة التى اصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا

(না, সে শহীদ নয়!) বরং শপথ ঐ সত্তার, যার হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চয় গনিমতের সম্পদ বণ্টনের পূর্বেই যে শামলা (আলখেল্লার মতো ঢিলা পোশাক) সে খেয়ানত করেছিল তার কারণে তাকে জাহান্নামে যেতে হবে। *[সূত্র: গনীমতের সম্পদ বন্টনের পূর্বে সকল মুসলমানের হক। কাজেই বন্টনের পূর্বে আমীরের অনুমতি ছাড়া তার কোন অংশ নেয়া খেয়ানত]* (বুখারী শরীফ, হা.নং ৬৭০৭)

ইহুদী ষড়যন্ত্রের আরেক পর্ব

কুরআন মজীদে আল্লাহ তা‘আলা মুসলিমদের সর্বাধিক কঠিন শত্রু হিসেবে ইহুদীদের কথা উল্লেখ করেছেন। ইতিহাসও এ সত্যতা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে।

খায়বারের যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ইহুদী সাল্লাম ইবনে মিশকামের স্ত্রী যায়নাব বিনতে হারিস কোন এক কৌশলে বিষ মিশ্রিত বকরির গোশত নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাদিয়া হিসেবে পেশ করলো। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা মুখে দেওয়ামাত্র গোশতই তাকে বিষ মেশানোর কথা বলে দিল। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথে সাথে নিবৃত্ত হলেন। ইতোমধ্যে সঙ্গী সাহাবী হযরত বিশর ইবনে বারা রা. তা গলাধঃকরণ করে ফেলেছিলেন।

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদী মহিলাটিকে ডেকে বিষ দেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বললো, 'আপনি সত্য নবী কি না, তা পরীক্ষা করার জন্য বিষ দিয়েছিলাম। কেননা, যদি আপনি সত্য নবী হন, তবে বিষ আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি মিথ্যাবাদী হন তবে আমরা আপনার থেকে নাজাত পাবো!'

ইমাম যুহরী রহ. বলেন, এরপর এই ইহুদী নারী ইসলাম গ্রহণ করলো। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু কারো থেকে ব্যক্তিগত কারণে প্রতিশোধ নিতেন না, তাই নিজের ব্যাপারে তাকে মাফ করে দিলেন। কিন্তু সঙ্গী সাহাবী বিশর উক্ত বিষক্রিয়ায় মারা যাওয়ায় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই নারীকে কিসাসরূপে হত্যা করার নির্দেশ প্রদান করলেন। এ ঘটনায় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষক্রিয়ায় কিছুটা আক্রান্ত হয়ে গিয়েছিলেন। ফলে চিকিৎসাস্বরূপ তিনি সিংগা লাগান। এর পরেও জীবনসায়াহ্নে যখন মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হন, তখনও তিনি নিজের মাঝে উক্ত বিষক্রিয়া অনুভব করেছিলেন। (আবু দাউদ, ৪৫১১, ৪৫১২; আসসুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, ১৬০০৭, ১৬০১; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪:২২৭-৪২৮; সীরাতে মুস্তফা, ২:৪১৯)

খায়বারযুদ্ধের কয়েকটি শিক্ষণীয় ঘটনাঃ শহীদ নাকি জাহান্নামী

হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন যে, (খায়বারযুদ্ধে) মুসলিমরা যখন কাফেরদের মুখোমুখি হলো তখন মুসলিমদের পক্ষ হতে এক ব্যক্তি বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে চললো। যে কাফেরই তার সামনে আসছিল সেই তার তরবারির আঘাতে লুটিয়ে পড়ছিল। সাহাবীরা তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ওহীর মাধ্যমে অবগত হয়ে) বললেন, 'এই ব্যক্তি জাহান্নামী।'

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হলো। আকসাম ইবনে আবুল জুন নামক এক সাহাবী উক্ত ব্যক্তিকে

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

জখমের তীব্রতায় অস্থির হয়ে আত্মহত্যা করতে দেখতে পেলেন। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ঘটনা শুনে বললেন,

يَا بِلَالُ، قُمْ فَأَذِّنْ : لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ الا مُؤْمِنٌ، وَانَّ اللهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الفَاجِرِ

হে বিলাল, দাঁড়াও! ঘোষণা করে দাও! জান্নাতে কেবল মুমিন বান্দাদেরই প্রবেশাধিকার থাকবে। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা 'ফাজের' (গুনাহগার) ব্যক্তির মাধ্যমেও তার দীনের সাহায্য নিয়ে থাকেন। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৬৬০৬; সহী ইবনে হিব্বান, ৪৫১৯)

হাফেয ইবনে হাজার রহ. এ হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে তীন রহ. এর বক্তব্য উদ্ধৃত করেন, 'আত্মহত্যাকারী ঈমানদারের জাহান্নামী হওয়ার অর্থ হলো, যদি আল্লাহ তা'আলা তার আত্মহত্যার এ অপরাধ ক্ষমা না করেন তবে সে (নির্দিষ্ট সময়ের জন্য) জাহান্নামী হবে। অথবা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জাহান্নামী বলার কারণ হলো, আত্মহত্যাকে সে গুনাহ মনে করেনি; বরং বৈধ মনে করে সে এতে লিপ্ত হয়েছিল এবং (একটি হারামকে হালাল তথা বৈধ মনে করার কারণে) মৃত্যুর পূর্বে সে বেঈমান হয়ে গিয়েছিল। কাজেই সে চিরকালের জন্য জাহান্নামী হবে। (ফাতহুল বারী, ৭:৫৮৩-৫৮৬)

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীসের পেরিপ্রেক্ষিতে আলেমগণ বলেন, দীনের কাজ করতে পারাই কারো জন্য ঈমানদার এবং জান্নাতী হওয়ার দলীল নয়। কেননা, আল্লাহ তা'আলা তো ফাসেক এবং কাফের ব্যক্তির মাধ্যমেও দীনের কাজ নিয়ে থাকেন। ইহুদীর সহযোগিতায় দুর্গ বিজয়ের ঘটনা এর সুস্পষ্ট দলীল। কাজেই দীনের কাজ করতে পারলে শুকরিয়া আদায় করা এবং সাথে সাথে নিজের ঈমান, ইখলাস ও আমলের শুদ্ধতার ব্যাপারে যত্নবান হওয়া চাই। (কাশফুল বারী; খায়বার যুদ্ধ অধ্যায়)

জান্নাতের ধনভাণ্ডার

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

খায়বারযুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তনকালে এক উপত্যকায় পৌঁছলে সাহাবীরা উচ্চঃস্বরে আল্লাহু আকবার বলতে লাগলেন। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা শুনে বললেন,

يَا اَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى اَنْفُسِكُمْ. فَاِنَّكُمْ لا تَدْعُونَ اَصَمَّ وَلا غَائِبًا. اِنَّهُ مَعَكُمْ اِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ. تَبَارَكَ اسْمُهُ وَتَعَالَى جَدُّهُ

তোমরা নিজেদের উপর রহম কর। (এত উচ্চঃস্বরে তাকবির বলো না) নিশ্চয় তোমরা যে সত্তাকে ডেকে থাকো, তিনি বধির কিংবা অনুপস্থিত নন। বরং তিনি তো তোমাদের নিকটেই আছেন। এবং তিনি সবকিছু শুনেন।

এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু মুসা আশআরী রা. কে

لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ اِلا بِاللهِ

পড়তে শুনে বললেন,

يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ: اَلا اَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ

হে আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস, আমি তোমাকে জান্নাতের একটি ধনভাণ্ডারের কথা বলে দিব কি?

আবু মুসা আশআরী রা. জবাবে বললেন, অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল, আপনার উপর আমার পিতা-মাতা উৎসর্গিত হোক! নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, (জান্নাতের একটি ধনভাণ্ডার হলো)

قُلْ: لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ اِلا بِاللهِ

তুমি বলো,

لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ اِلا بِاللهِ

(আল্লাহ তা‘আলার অনুগ্রহ ছাড়া বান্দার গুনাহ থেকে বেঁচে থাকারও কোন ক্ষমতা নেই, নেকির কাজ করারও কোন শক্তি নেই।) (মুসলিম, হাদীস নং ২৭০৪; বুখারী, হা. নং ২৯৯২)

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

ঈমানের মূল্য

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. এর সূত্রে এক বর্ণনায় রয়েছে, খায়বার যুদ্ধে সাহাবায়ে কেরাম এক বকরি চালক রাখালকে ধরে নিয়ে এলো। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিলে লোকটা মুসলমান হয়ে গেল এবং সাহাবী হওয়ার মর্যাদা লাভ করলো! ইসলাম গ্রহণের পরমুহূর্তেই রণাঙ্গনের যুদ্ধসারিতে গিয়ে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে পড়লো। যুদ্ধ করতে করতে একটি তীরের আঘাতে এই নবীন সাহাবী শাহাদাত বরণ করলেন। অথচ ইসলাম গ্রহণের পর তার একটি সেজদা করারও সুযোগও হয়নি! শুধু ঈমানের বদৌলতে আল্লাহ তা' আলা তাকে এমন সম্মানিত করলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিজের একটি জুব্বা দ্বারা কাফন দিলেন এবং বললেন,

لَقَدْ حَسُنَ اسْلَامُ صَاحِبِكُمْ. لَقَدْ دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَانَّ عِنْدَهُ لَزَوْجَتَيْنِ لَهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ

তোমাদের এ নবীন সাথীর ইসলাম উত্তম হয়েছে। আমি তার কাছে প্রবেশ করে দেখতে পেলাম, তাকে দুজন হুর স্ত্রী দেওয়া হয়েছে। (দালায়িলুন নুবুওয়াহ লিল বায়হাকী, ২:২২০)

খায়বারযুদ্ধে নাযিলকৃত হুকুম-আহকাম

১. এ যুদ্ধে গৃহপালিত গাধার গোশত খাওয়ার নিষেধাজ্ঞা এবং ঘোড়ার গোশত খাওয়ার অবকাশের হুকুম অবতীর্ণ হয়। (তবে অন্যান্য হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে ঘোড়ার গোশত খাওয়ার বৈধতার ব্যাপারে ফকিহদের মতবিরোধ রয়েছে।) (বুখারী শরীফ, হা.নং ৪২১৯)

২. এ যুদ্ধেই "মুত' আ বিবাহ" (নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চুক্তি করে বিবাহ) সম্পূর্ণরূপে হারাম ঘোষণা করা হয়। (বুখারী শরীফ, হা.নং ৫১১৫)

৩. হারাম তথা সম্মানিত মাসসমূহে (জিলকদ, জিলহজ্জ, মুহাররম ও রজব) কাফেরদের সাথে জিহাদ করার বৈধতা অবতীর্ণ হয়।

কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু ‘ আলাইহি ওয়াসাল্লামের খায়বার অভিযান হয়েছিল ‘ সফর’ মাসে।

৪. হিংস্র জীব-জন্তু এবং পাঞ্জা দ্বারা শিকার করে আহার করে, এমন শিকারি পাখির গোশত খাওয়া নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। (আবু দাউদ, হা. নং ৩৮০৫)

ঐতিহাসিক মক্কা বিজয়

পবিত্র কুরআনে কারীমে সূরা ফাতহে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

اِنَّا فَتَحۡنَا لَکَ فَتۡحًا مُّبِیۡنًا

‘হে রাসূল! নিশ্চয়ই আমি আপনাকে প্রকাশ্য বিজয় দান করেছি।’(সূরা ফাতহ, আয়াত: ১)

সূরা ফাতহের এ আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা সাহাবায়ে কেরামকে ঐতিহাসিক মক্কা বিজয়ের পূর্বসুসংবাদ প্রদান করেছেন। যে বিজয়ের মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর দীনকে, তার রাসূলকে এবং মুমিন বান্দাদেরকে সম্মানিত করেছেন। যে বিজয়ের মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলা বিশ্ব মানবতার হেদায়াতের প্রাণকেন্দ্র বাইতুল্লাহকে কুফর ও শিরক থেকে মুক্ত করেছেন। তাই ইসলামী ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে এ বিজয় ছিল একটি “ঐতিহাসিক বিজয়”!

মক্কা বিজয়ের প্রেক্ষাপট

ষষ্ঠ হিজরী জিলক্বদ মাসে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে উমরা আদায়ের উদ্দেশ্যে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হন। কিন্তু হুদাইবিয়া নামক স্থানে পৌছার পর মক্কার কাফেররা তাতে বাঁধা প্রদান করে। পরিশেষে দু’পক্ষের মাঝে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইতিহাসে যাকে “হুদাইবিয়ার সন্ধি” নামে আখ্যায়িত করা হয়। (ফাতহুল বারী, ৭:৫৪৩)

হুদাইবিয়ার এই সন্ধি চুক্তির ধারাগুলো বাহ্যিকভাবে ছিল সম্পূর্ণরূপে ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থবিরোধী। কিন্তু প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তা‘আলা

GET ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

আপাত দৃষ্টিতে নীতিগত এই পরাজয়কেই ভবিষ্যতের সুস্পষ্ট বিজয় আখ্যায়িত করেছিলেন। এবং এ হুদাইবিয়ার সন্ধি থেকেই রচিত হয়েছিল মক্কা বিজয়ের মূল প্রেক্ষাপট।

ইমাম ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন,

كَانَتْ صُلْحُ الْحُدَيْبِيَةِ مُقَدِّمَةً وَتَوْطِئَةً بَيْنَ يَدَيْ هَذَا الْفَتْحِ الْعَظِيمِ، امِنَ النَّاسُ بِهِ وَكَلَّمَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَنَاظَرَهُ فِي الْاسْلَامِ وَتَمَكَّنَ مَنِ اخْتَفَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِمَكَّةَ مِنْ اظْهَارِ دِينِهِ، وَالدَّعْوَةِ الَيْهِ، وَالْمُنَاظَرَةِ عَلَيْهِ، وَدَخَلَ بِسَبَبِهِ بَشَرٌ كَثِيرٌ فِي الْاسْلَامِ، وَلِهَذَا سَمَّاهُ اللهُ فَتْحًا فِي قَوْلِهِ: {انَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا}

হুদাইবিয়ার সন্ধি মূলতঃ ছিল মহান মক্কা বিজয়ের ভূমিকা। এ সন্ধির মাধ্যমে মানুষের জান-মালে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়। কাফের-মুসলমান পারস্পরিক মতবিনিময় ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি আদান-প্রদানের সুযোগ তৈরি হয়। মক্কায় আত্মগোপনে থাকা মুসলমানরা পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভ করে। ব্যাপকভাবে মানুষ ইসলামে প্রবেশ করতে থাকে। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা এ সন্ধি চুক্তিকে 'সুস্পষ্ট বিজয়' আখ্যায়িত করেছেন'। (যাদুল মা'আদ, ৩:৩৬৯)

তবে হুদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর প্রাথমিক পর্যায়ে বাহ্য দৃষ্টিতে তা নীতিগত পরাজয় মনে হওয়ায় সাহাবায়ে কেরামের জন্যও তা মেনে নেওয়া কষ্টকর ছিলো।

বীর সাহাবী হযরত উমর ফারুক রা. নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অনুযোগ করে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমরা সত্যের উপর আর কাফেররা মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত, এ কথা কি সঠিক নয়? নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অবশ্যই সঠিক! হযরত উমর রা. পুনরায় জিজ্ঞাস করলেন, আমাদের শহীদরা জান্নাতী আর তাদের মৃতরা জাহান্নামী, এ বিশ্বাসও কি নির্ভুল নয়? নবীজী বললেন, হ্যাঁ অবশ্যই! এরপর উমর রা. বললেন,

তবে কেন আমরা আমাদের দ্বীনের ক্ষেত্রে এমন পরাজয়মূলক শর্ত মেনে নেব? নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

«يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، إِنِّي رَسُولُ اللهِ وَلَنْ يُضَيِّعَنِي اللهُ أَبَدًا».

‘হে খাত্তাবের পুত্র! নিশ্চয় আমি আল্লাহর রাসূল! কাজেই আল্লাহ তা‘আলা কখনোই আমাকে ধ্বংস করবেন না!...

এরপর যখন উপরোক্ত আয়াত সহ সূরা ফাতহ অবতীর্ণ হলো, তখন উমর রা. তা শুনে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, ‘সত্যিই কি এ পরাজয় বিজয়ে রূপান্তরিত হবে? নবীজী বললেন, “হ্যাঁ”। উমর রা. সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন।’ (মুসলিম শরীফ, হা. নং ১৭৮৫)

পরবর্তীতে সকল সাহাবায়ে কেরামই বুঝতে পেরেছিলেন যে, মক্কা বিজয়ের পটভূমি রচিত হয়েছে এই হুদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তি থেকেই। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রা. বলেন,

انَّكُمْ تَعُدُّونَ الْفَتْحَ فَتْحَ مَكَّةَ، وَنَحْنُ نَعُدُّ الْفَتْحَ صُلْحَ الْحُدَيْبِيَةِ.

‘তোমরা ফাতহে মক্কাকে ফাতহ (বিজয়) মনে কর, অথচ আমরা (সাহাবায়ে কেরাম) তো হুদাইবিয়ার সন্ধিকেই ফাতহ মনে করতাম। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরা ফাতহ, আয়াত:১)

পরাজয় যেভাবে বিজয়ে রূপান্তরিত হলো

হুদাইবিয়ার সন্ধি মুসলমানদের জন্য বাহ্যিকভাবে যদিও পরাজয়মূলক ছিল, কিন্তু বাস্তবতার নিরিখে তাতে ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য চূড়ান্ত বিজয় তথা মক্কা বিজয়ের প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছিল। মুফাক্কিরে ইসলাম সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. তার “আস সীরাতুন্নববিয়্যাহ” গ্রন্থে হুদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তির মাধ্যমে ইসলামের চূড়ান্ত বিজয়ের প্রেক্ষাপট রচনার বিশদ বিবরণ উদ্ধৃত করেছেন। যার কয়েকটি নিম্নরুপ:

১. নবশক্তির উত্থান

এ চুক্তির মাধ্যমে ইসলাম 'জাযীরাতুল আরবে' এক নবশক্তিরূপে এমনভাবে আবির্ভূত হলো যে, সমগ্র আরব তাদের শক্তির স্বীকৃতি দিয়ে সন্ধি করতে বাধ্য হয়েছিল।

২. যুদ্ধবিরতী

এ চুক্তির মাধ্যমে সশস্ত্র দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ধারা বন্ধ হয়ে গেলো। মুসলমানরা নিশ্চিন্তে-নির্বিঘ্নে ইসলামের প্রচার প্রসারে আত্মনিয়োগের উন্মুক্ত সুযোগ পেয়ে গেলো।

৩. বিশ্ব দরবারে ইসলাম

হুদাইবিয়া সন্ধি চুক্তির পরই নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পারস্য, রোম সহ বিভিন্ন সম্রাজ্যের বাদশাহর নিকট ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত পত্র প্রেরণ করেন।

৪. মক্কার দূর্বল মুসলমানদের ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভ

মক্কার যে সকল মুসলমান কোন অপারগতা বশত হিজরত করতে না পারার দরুণ অসহায়ত্বের জীবন অতিবাহিত করছিলো, এই সন্ধি চুক্তির মাধ্যমে তারা পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভ করলো।

৫. ইসলামের সৌন্দর্যের প্রচার-প্রসার

সন্ধি চুক্তির মাধ্যমে যুদ্ধ বন্ধ হয়ে গেলে কাফেররা ইসলামের সৌন্দর্য কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়ে গেলো। ফলে ইসলামের নির্মল আলোয় তাদের হৃদয়াকাশ থেকে কুফর-শিরকের অন্ধকার দূর হয়ে যেতে লাগলো। এভাবে মক্কা বিজয়ের আগেই তারা ব্যাপকভাবে ইসলামে প্রবেশ করতে লাগলো।

ইমাম যুহরী রহ. বলেন, "হুদাইবিয়ার সন্ধি পরবর্তী দু'বছরে ইসলাম গ্রহণকারীদের সংখ্যা পূর্ববর্তী সময়ে ইসলাম গ্রহণকারীদের সংখ্যার তুলনায় বেশি ছিল!" ইবনে হিশাম রহ. বলেন, "ইমাম যুহরীর এ কথার প্রমাণ হলো, হুদাইবিয়া সন্ধির সময় মুসলমানদের সংখ্যা ছিল

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

মাত্র ১৪০০। আর মাত্র দু'বছরের ব্যবধানে মক্কা বিজয়ের সময় মুসলমানদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১০, ০০০ (দশ হাজার)!"

৬. খালেদ ইবনে ওলীদ রা. এর ইসলাম গ্রহণ

হুদাইবিয়ার সন্ধির ফলে ইসলাম গ্রহণকারী এ সকল নও মুসলিমের মধ্যে 'আল্লাহর তরবারী' খ্যাত হযরত খালেদ ইবনুল ওয়ালীদ রা. ও ছিলেন। যে তরবারী ইসলামের পক্ষে কখনো কোনো ময়দানে পরাজিত হয়নি! (আল ইসাবাহ, ২:২১৫; সীরাতে ইবনে হিশাম, ৩:৩৩৭)

মক্কা বিজয়ের বাহ্যিক প্রেক্ষাপট:

কুরাইশ কর্তৃক হুদাইবিয়া সন্ধি চুক্তি ভঙ্গ

মক্কা বিজয়ের মূল প্রেক্ষাপট হুদাইবিয়ার সন্ধির মাধ্যমে রচিত হলেও মক্কা অভিমুখে সশস্ত্র অভিযান পরিচালনার জন্য একটি তাৎক্ষণিক উপলক্ষের প্রয়োজন ছিল। কুরাইশ কর্তৃক সন্ধি চুক্তি ভঙ্গের মাধ্যমে তা পূর্ণতা লাভ করে।

আল্লামা আইনী রহ. ফাতহে মক্কার এই বাহ্যিক প্রেক্ষাপট প্রসঙ্গে বলেন, 'মক্কার কুরাইশরা হুদাইবিয়ায় নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কৃত সন্ধি চুক্তি ভঙ্গ করেছিলো। এ খবর নবীজীর কাছে পৌঁছলে নবীজী মক্কা অভিমূখে অভিযান পরিচালনা করেন। (উমদাতুল কারী, ১২:২৬০)

হুদাইবিয়ার যুদ্ধ বিরতির চুক্তি অনুযায়ী কুরাইশদের জন্য মুসলমানদের সাথে কিংবা তাদের কোনো মিত্র গোত্রের সাথে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়া নিষিদ্ধ ছিলো। কিন্তু কুরাইশরা এ চুক্তি লঙ্ঘন করে ফেলে...।

হযরত ইকরামা রহ. বলেন, ' হুদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তির পর আরব গোত্র সমূহের মধ্য হতে বনু খুজাআ মুসলমানদের সাথে এবং বনু বকর কুরাইশদের সাথে মৈত্রি চুক্তিতে আবদ্ধ হলো। বনু বকর আর বনু খুজাআর মধ্যে জাহিলী যামানা হতে সশস্ত্র দ্বন্দ্ব-সংঘাত অব্যাহত ছিল।

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

বনু বকর কুরাইশদের সহযোগিতায় পূর্ব শত্রুতার পরিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর হলো। কুরাইশরাও তাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা করলো।’

ইবনে ইসহাক রহ. বলেন, বনু বকরের সরদার নওফেল ইবনে মু‘আবিয়ার নেতৃত্বে ‘ওতীর’ নামক এক জলাশয়ের নিকট তারা বনু খুজাআর উপর হামলা করলো। বনু খুজাআ ‘হারামের সীমানায় আশ্রয় নিলেও বনু বকর হারামের নিষিদ্ধতা উপেক্ষা করে হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে গেলো।

ইবন সাদ রহ. বলেন, কুরাইশদের মধ্য হতে সাফওয়ান ইবনে উমাইয়্যা, হুয়াইতিব ইবনে আব্দুল উয্যা, মিকরাজ ইবনে হাফস প্রমূখ কাফের রণাঙ্গনে বনু বকরের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় অবতীর্ণ হলো। ইমামে মাগাযী, মূসা ইবনে উকবা কুরাইশদের মধ্য হতে শাইবা ইবনে উসমান ও সাহল ইবনে আমর এর নামও উল্লেখ করেছেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হা. নং ৩৮০৫৭; তাবাকাতে ইবনে সা‘আদ, ২:৩১৬)

নবীজীর দরবারে বনু খুজাআর ফরিয়াদ

লড়াই শেষ হলে বনু খুজাআর একটি প্রতিনিধি দল মদীনায় নবীজীর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আগমন করলো। ইবনে সা‘দ রহ. এ প্রতিনিধি দলের নেতা হিসেবে আমর ইবনে সালেম এর নাম উল্লেখ করেছেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হা. নং ৩৮০৫৭; তাবাকাতে ইবনে সা‘আদ, ২:৩১৭)

আমর ইবনে সালেম, বনু বকরের লড়াই এবং কুরাইশদের সহযোগিতা ও তাদের সন্ধি ভঙ্গের কথা দীর্ঘ এক কবিতায় আবেগঘন ভাষায় উপস্থাপন করেন। ‘মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা’র উল্লিখিত বর্ণনায় উদ্ধৃত সে কবিতাসমূহের দুটি পংক্তি নিম্নরূপ..

يَا رَبُّ اِنِّي نَاشِدٌ مُحَمَّدًا حِلْفَ اَبِينَا وَاَبِيهِ الْاَتْلَدَا

فَانْصُرْ هَدَاكَ اللهُ نَصْرًا اَيَّدًا وَادْعُ عِبَادَ اللهِ يَاتُوا مَدَدًا

‘হে আমার প্রতিপালক! আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেই মৈত্রি চুক্তি স্বরণ করিয়ে দিচ্ছি, যা সম্পাদিত হয়েছিল আমাদের এবং তার পূর্ব পুরুষদের মাঝে।

(হে আল্লাহর রাসূল!) আমাদের সাহায্য করুন। এবং আল্লাহর বান্দাদেরকে আহবান করুন, যাতে তারা সাহায্যের জন্য উপস্থিত হয়।’

ইবনে ইসহাক রহ. বলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ফরিয়াদ শুনে বললেন,

نصرتياعمرو بنسالم

হে আমর ইবনে সালেম! তোমাকে অবশ্যই সাহায্য করা হবে। (ফাতহুল বারী, ৭:৬৩৫)

সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যামুরা রা. কে পত্র বাহক হিসেবে মক্কার কুরাইশদের নিকট এ মর্মে সংবাদ প্রেরণ করেন যে, তারা যেন তিনটি প্রস্তাবের কোনো একটি গ্রহণ করে নেয়,

১. বনু খুজাআর নিহত ব্যক্তিদের রক্তপণ আদায় করে দিবে।
২. অথবা বনু বকরের সাথে কৃত মৈত্রি চুক্তি ভঙ্গ করে পৃথক হয়ে যাবে।
৩. কিংবা হুদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তি ভঙ্গের প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে দিবে।

পত্রবাহক যখন সংবাদ নিয়ে মক্কায় পৌঁছলো, তখন কুরাইশদের পক্ষ হতে কুরতা ইবনে আমর এ জবাব পাঠালো যে, আমরা হুদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তি ভঙ্গের জন্য তৈরি আছি। জবাব নিয়ে দূত রওয়ান হয়ে যাওয়ার পরক্ষণেই তাদের বোধদয় হলো এবং হুদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তি নবায়নের জন্য তারা আবু সুফিয়ানকে মদীনায় প্রেরণ করলো। (ফাতহুল বারী, ৭:৬৪২)

কুরাইশদের সন্ধি নবায়ন প্রচেষ্টা

TOP

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

আবু সুফিয়ান মদীনায় এসে উপস্থিত হলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে বললেন,

قَدْ جَاءَ كُمْ ابُو سُفْيَانَ وَسَيَرْجِعُ رَاضِيًا بِغَيْرِ حَاجَتِهِ

‘তোমাদের নিকট আবু সুফিয়ান এসে উপস্থিত হচ্ছে। আর সে তাঁর উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হয়েই ফিরে যাবে’। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হা. নং ৩৮০৫৭)

নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালোবাসা !

আবু সুফিয়ান মদীনায় পৌছে প্রথমত তার কন্যা নবীজীর বিবি উম্মে হাবীবা রা. এর কাছে গেলেন।

উম্মে হাবীবা রা. এর নাম হলো ‘রমলা’। মদীনায় হিজরতের আগে যখন মুসলমানরা হাবশায় হিজরত করেছিলেন তখন তাদের মধ্যে উম্মে হাবীবাও ছিলেন। হাবশায় থাকা অবস্থায় নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বিবাহের প্রস্তাব পাঠান। হাবশার বাদশাহ ‘নাজাশী’ চারশত দীনারের মহর নিজের পক্ষ হতে আদায় করে দিয়ে উম্মে হাবীবা রা.কে নবীজীর সাথে বিয়ে দেন। (যাদুল মা‘আদ, ১:১০৬)

আবু সুফিয়ান যখন উম্মে হাবীবার কাছে পৌঁছলেন, তখন উম্মে হাবীবা রা. পিতাকে দেখে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিছানা উঠিয়ে ফেললেন, যাতে পিতা নবীজীর বিছানায় বসতে না পারে। আবু সুফিয়ান কন্যার এ আচরণ দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, হে কন্যা! তুমি এ বিছানা কেন উঠিয়ে রাখলে? এ বিছানাকে আমার যোগ্য মনে করো না, নাকি আমাকে এ বিছানার যোগ্য মনে করো না? উম্মে হাবীবা রা.বললেন,

هُوَ فِرَاشُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْتَ مُشْرِكٌ نَجِسٌ. فَلَمْ احِبَّ انْ تَجْلِسَ عَلَى فِرَاشِهِ.

‘এটা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিছানা। আপনি তো মুশরিক, আর মুশরিক তো নাপাক হয়ে থাকে। কাজেই

www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com

নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিছানার উপর কোনো নাপাক ব্যাক্তি বসবে এটা আমি কখনোই পছন্দ করবো না।’

আবু সুফিয়ান বললো, হে আমার মেয়ে! সত্যিই আমার থেকে বিচ্ছেদের পর তোমার মাঝে অনেক বিরূপ পরিবর্তন ঘটেছে!’

এরপর আবু সুফিয়ান নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে সন্ধি নবায়নের দাবি জানালেন। নবীজী কোনো জবাব দিলেন না। (যাদুল মা'আদ, ৩:৩৫০)

আবু সুফিয়ান, দরবারে নববী থেকে ব্যর্থ হয়ে একে একে আবু বকর রা. উমর রা. এর কাছে গেলেন। কিন্তু কেউই এ ব্যপারে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সুপারিশ করতে সম্মত হলেন না। পরিশেষে হযরত আলী রা. এর পরামর্শে এককভাবে মসজিদে নববীতে সন্ধি নবায়নের ঘোষণা দিয়ে মক্কায় চলে এলেন। কুরাইশরা আবু সুফিয়ানের আগমণের অপেক্ষায় প্রহর গুনছিলো। যখন তারা জানতে পারলো যে, আবু সুফিয়ান, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবার থেকে সন্ধি নবায়নের কোনো প্রতিশ্রুতি ছাড়াই কেবল এককভাবে ঘোষণা দিয়ে চলে এসেছে, তখন তাকে অভিসম্পাত করে বললো,

وَاللهِ مَا رَاَيْنَا كَالْيَوْمِ وَافِدَ قَوْمٍ , وَاللهِ مَا اَتَيْتَنَا بِحَرْبٍ فَنَحْذَرَ , وَلَا اَتَيْتَنَا بِصُلْحٍ فَنَاْمَنَ

খোদার কসম! তোমার মত নির্বোধ কোনো প্রতিনিধি আমরা আগে কখনো দেখিনি। আল্লাহর শপথ! তুমি না যুদ্ধের সংবাদ নিয়ে এসেছো যে, আমরা তার প্রস্তুতি নিতে পারি। আর না সন্ধির সুসংবাদ নিয়ে এসেছো যে, আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারি! (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হা. নং ৩৮০৫৭)

বিজয়াভিযানের প্রস্তুতি

আবু সুফিয়ান চলে যাওয়ার পর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যান্ত গোপনীয়তার সাথে অভিযানের প্রস্তুতির জন্য সাহাবায়ে কেরামকে নির্দেশ দিলেন । এবং আম্মাজান আয়েশা রা. কে বললেন,

جَهِّزِينِي وَلَا تُعْلِمِنَّ بِذَلِكَ احَدًا

‘আমার সফরের সরঞ্জাম প্রস্তুত করো। আর কাউকে এ ব্যাপারে কিছু জানিও না’।

কন্যা আয়েশা রা. এর প্রস্তুতি দেখে পিতা হযরত আবু বকর রা. নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অভিযানের কারণ জিজ্ঞেস করলে নবীজী বললেন,

انَّهُمْ اوَّلُ مَنْ غَدَرَ

নিশ্চয় কাফেররা [হুদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তি ভঙ্গ করে] সর্বপ্রথম গাদ্দারী করেছে! (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হা. নং ৩৮০৫৫)

হাতেব ইবনে আবী বালতাআ রা. -এর চিঠি

ইবনে ইসহাক রহ. বলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন অভিযানের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে ফেললেন, তখন সাহাবী হযরত হাতেব ইবনে আবী বালতাআ রা. এ অভিযানের সংবাদ সম্বলিত একটি চিঠি ‘সারা’ নাম্মী এক মহিলার মারফতে মক্কাবাসীর নিকট প্রেরণ করেন। মূসা ইবনে উকবা রহ. এর মতে এ মহিলাকে দশ দীনারের পারিশ্রমিক প্রদান করা হয়েছিল।

চিঠির ভাষা ছিল,

اما بعد: يَا معشر قُرَيْش، فَان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، جَاءَكُم بِجَيْش كالليل، يسير كالسيل، فوَاللَّه لَو جَاءَكُم وَحده نَصره الله عَلَيْكُم، وانجز لَهُ وعده، فانظروا لانفسكم وَالسَّلَام.

হে কুরাইশগণ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের নিকট এমন এক বাহিনী নিয়ে ধেয়ে আসছেন, যারা নিকষ রাতের মত [চারিদিক ছেয়ে ফেলবে], যাদের গতি হবে প্লাবনের স্রোতের

ন্যায়। আল্লাহর কসম! যদি নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাই তোমাদের মোকাবেলায় অবতীর্ণ হন, তবুও আল্লাহ তা‘আলা নিজ প্রতিশ্রুতি পূরণার্থে তাকে তোমাদের উপর বিজয়ী করবেন। সুতরাং তোমরা নিজেদের বাঁচানোর চিন্তা করো। সালাম। (ফাতহুল বারী, ৭:৬৩৫-৬৩৬)

বুখারী শরীফের বর্ণনায় এসেছে, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহীর মাধ্যমে হাতেব রা. এর চিঠির ব্যাপারে অবগত হয়ে হযরত আলী রা., হযরত যুবায়ের ইবনুল আওয়াম রা., হযরত আবু মারছাদ রা. ও হযরত মিকদাদ রা. এ চারজন সাহাবীকে নির্দেশ প্রদান করলেন যে,

«انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ، فَإِنَّ بِهَا امْرَأَةً مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مَعَهَا كِتَابٌ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ»

তোমরা বেরিয়ে পড়। “রওজায়ে খাখ” নামক স্থানে তোমরা মুশরিকদের প্রতি প্রেরিত হাতেবের চিঠি বহণকারিণী এক মুশরিক নারী কে পাবে...!

নবীজীর কথার সত্যতার উপর সাহাবায়ে কেরামের ঈমান!

নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ মত চার সাহাবী “রওজায়ে খাখ” নামক স্থানে গিয়ে সে মহিলাকে দেখতে পেয়ে ধরে ফেললো। এবং তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলো। মহিলা চিঠির কথা পুরোপুরি অস্বীকার করে বসলো। চার সাহাবী মহিলার প্রাথমিক তল্লাশী করে কোনো চিঠি খুঁজে পেলেন না। কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের ঈমান তো ছিলো এমন যে, চোখের দেখা ভুল হতে পারে, কিন্তু নবীজীর কথা কখনোই অসত্য হতে পারে না। এ কারণেই তাঁরা মহিলাকে হুমকি দিয়ে বললেন,

مَا كَذَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُجَرِّدَنَّكِ

'নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনোই অসত্য বলেননি। তুমি হয়তো চিঠি বের করে দেবে। আর না হয়তো আমরা তোমাকে বিবস্ত্র করে তল্লাশী নিতে বাধ্য হবো'!

মহিলা বাধ্য হয়ে তার শরীরের পেছন দিকে [দেহের নিম্নাংশের পরিধেয় বস্ত্র] ইযার -এর মধ্যে গুজে রাখা মাথা হতে প্রলম্বিত চুলের বেণীর অগ্রভাগ থেকে চিঠি বের করে দিলো।

চার সাহাবী যখন চিঠি নিয়ে নবীজীর দরবারে পৌছলেন, তখন নবীজী হাতেবকে ডেকে চিঠির কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন।

হাতেব রা. বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করবেন না। (আমি যা করেছি তার কারণ হলো) আমি কুরাইশের সাথে মৈত্রি চুক্তিতে আবদ্ধ ছিলাম। আপনার সঙ্গী অন্যান্য মুহাজিরগণের হিজরতকালীন মক্কায় রেখে আসা ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজনের হেফাজতের জন্য আত্মীয়-স্বজন সেখানে রয়েছে। কিন্তু আমার ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজন হেফাজতের জন্য কোনো অবলম্বন সেখানে নেই। যদ্দরুণ আমি চেয়েছিলাম, এ চিঠির মাধ্যমে কুরাইশরা যেন আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়। এবং কৃতজ্ঞতার অনুভূতি থেকে মক্কায় রেখে আসা আমার পরিবার-পরিজনদের কোনো ক্ষতি করা থেকে তারা বিরত থাকে। আমি এ কাজ এ জন্য করিনি যে, আমি মুরতাদ হয়ে গেছি, কিংবা এ জন্যও করিনি যে, আমি কুফরের উপর সন্তুষ্ট আছি..!"

নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতেব রা. এর আত্মপক্ষ সমর্থনকে সত্যায়ন করে বললেন, "নিশ্চয় সে [হাতেব] সত্য কথা বলেছে। "

এতদ্বসত্ত্বেও হাতেব রা. এর এ কর্মকান্ড যেহেতু বাহ্যদৃষ্টিতে ভিন্নরকম মনে হচ্ছিল, তাই বীর সাহাবী হযরত উমর রা. তা বরদাশত করতে

TOP

Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com App Store

না পেরে বলে ফেললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে অনুমতি প্রদান করুন, আমি এই মুনাফেকের গর্দান উড়িয়ে দিই!’

নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

انَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهَ اطَّلَعَ عَلَى مَنْ شَهِدَ بَدْرًا فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ

‘হে উমর! হাতেব তো বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। তুমি কি জানো না যে, আল্লাহ তা‘আলা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের পূর্বাপর সর্ব বিষয়ে অবগত হয়েই বলেছেন যে,

[হে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণ!], তোমরা যা ইচ্ছা করো! আমি তোমাদের আগে-পরের সকল গুনাহ মাফ করে দিয়েছি!’

নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা শুনে উমর রা. কেঁদে ফেললেন এবং নিজের ভুল বুঝতে পেরে বললেন, “আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই সম্যক অবগত!”

এর পরপরই সূরা মুমতাহিনার এ আয়াত নাযিল হলো,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَ عَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَ قَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ ۚ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَ اِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ ؕ اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِيْ سَبِيْلِيْ وَ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِيْ تُسِرُّوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَ اَنَا اَعْلَمُ بِمَاۤ اَخْفَيْتُمْ وَ مَاۤ اَعْلَنْتُمْ ؕ وَ مَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ○

‘হে মুমিনগণ! তোমরা যদি আমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমার পথে জিহাদের জন্য (ঘর থেকে) বের হয়ে থাকো, তবে আমার শত্রু ও তোমাদের নিজেদের শত্রুকে এমন বন্ধু বানিও না যে, তাদের কাছে ভালোবাসার বার্তা পৌঁছাতে শুরু করবে, অথচ তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে, তাঁরা তা এমনই প্রত্যাখ্যান করেছে যে, রাসূলকে এবং তোমাদেরকেও কেবল এ কারণে (মক্কা হতে) বের করে দিচ্ছে

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান এনেছো। তোমরা গোপনে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করো, অথচ তোমরা যা কিছু গোপনে করো ও যা কিছু প্রাকাশ্যে করো আমি তা ভালোভাবে জানি। তোমাদের মধ্যে কেউ এমন করলে সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হলো। (সূরা মুমতাহিনা, আয়াত:১; বুখারী শরীফ, হা. নং ৩০৮১,৩৯৮৩, ৪২৭৪)

বিজয়ের পথে রওনা

এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে সাহাবায়েকেরামকে নিয়ে মক্কা অভিমুখে রওনা হন। মক্কা অভিমুখে নবীজীর এ অভিযান সম্পর্কে কুরাইশরা সম্পূর্ণ বে-খবর ছিলো। (মুসতাদরাকে হাকীম, হা.নং ৪৩৫৯)

হিজরী ৮ম সনের তৃতীয় রমযানে নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা থেকে মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্য বের হন। আর ১৩তম রমযানে মক্কায় প্রবেশ করেন। মাঝে বার দিন পথে কেটে যায়।

রওয়ানার প্রাক্কালে নবীজী হযরত আবু রূহম গিফারী রা. কে মদীনায় নিজের স্থলাভিষিক্ত নির্বাচন করে যান। এ সময়ে নবীজীর সফরসঙ্গী মুহাজির ও আনসার সাহাবায়ে কেরামের সংখ্যা ছিলো দশ হাজার। (ফাতহুল বারী, ৭:৬৩৮; উমদাতুল কারী, ১২:২৬৩)

রোযা ভেঙে ফেলা...

ফাতহে মক্কার এ সফরে নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম সকলেই রোযাদার ছিলেন। 'কুদাইদ' ও 'উসফান' এলাকাদ্বয়ের মধ্যবর্তী "কাদীদ" নামক একটি জলাশয়ের নিকটে পৌছে নবীজী রোযা ভেঙে ফেলেন এবং সাহাবায়ে কেরামকেও ভেঙে ফেলতে নির্দেশ দেন। (বুখারী শরীফ, হা. নং ৪২৭৯; মুসনাদে আহমাদ, হা. নং ১১৮২৫)

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. বলেন, 'মুসাফিরের জন্য সফর অবস্থায় রোযা না রাখার অনুমতি রয়েছে। তবে ফাতহে মক্কার এ সফরে

নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসাফির হওয়ার কারণে রোযা ভাঙ্গেন নি, বরং রোযা ভাঙার উদ্দেশ্য ছিলো উম্মাতকে এ কথা বুঝানো যে, রণাঙ্গনে কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদরত মুজাহিদদের জন্য শারীরিক দূর্বলতা দূরীকরণের নিমিত্তে রোযা ভেঙে ফেলারও অবকাশ রয়েছে’। (ফাতহুল বারী, ৬:১১৩)

ক্ষমা ও উদারতার নবী!

মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী “সানিয়্যায়ে ইকাব” নামক স্থানে পৌঁছানোর পর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চাচাতো ভাই আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস এবং ফুফাতো ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে আবী উমাইয়াহ যারা এ যাবত কাফের ছিলেন নবীজীর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আগমন করলেন। উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা রা. তাদেরকে সাক্ষাত দানের ব্যাপারে নবীজীর কাছে সুপারিশ করলেন। যেহেতু তারা নবীজীকে ইতোপূর্বে নানাভাবে কষ্ট দিয়েছিলো, কাজেই নবীজী তাদের সাথে সাক্ষাতে সম্মত হলেন না, কিন্তু তারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করতঃ ক্ষমা চেয়ে ইসলাম গ্রহণের আর্তি জানিয়ে অত্যন্ত আবেগঘন ভাষায় কিছু কবিতা আবৃত্তি করলেন। ফলে দয়ার নবী তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন, তারা ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হলেন। (মুসতাদরাকে হাকেম, হা. নং ৪৩৫৯)

নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চাচা হযরত আব্বাস রা. যিনি ইসলাম গ্রহণ করত নবীজীর হুকুমে মক্কায় রয়ে গিয়েছিলেন, পরিবারসহ হিজরতের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন, পথিমধ্যে তিনিও ‘জুহফা’ নামক স্থানে নবীজীর সাথে মিলিত হন। (সীরাতে ইবনে হিশাম, ৪:৪২; যাদুল মা‘আদ)

মক্কার উপকণ্ঠে...

সফররত অবস্থায় নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সাহাবায়েকেরামকে নিয়ে “মাররুয্যাহরান” নামক স্থানে পৌছলেন, তখন নবীজী সঙ্গী সাহাবায়ে কেরামের প্রত্যেককে নিজ নিজ তাবুর

TOP

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

সামনে আগুন জালানোর আদেশ দিলেন। নির্দেশ মতো আগুন জালানো হলো। সে রাতে সাহাবায়ে কেরামের প্রজ্জ্বলিত মশাল ছিলো দশ হাজার।

নবীজী যেহেতু ইতোপূর্বে কুরাইশদের সন্ধি নবায়ন আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, ফলে কুরাইশরা নিশ্চিতভাবে না জানলেও মক্কা আক্রমণের ব্যাপারে তাদের দৃঢ় আশঙ্কা ছিলো ।

এ আশঙ্কা থেকেই মক্কার কাফেররা সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আবু সুফিয়ান, হাকীম ইবনে হিযাম ও বুদাইল ইবনে ওরকা এ তিনজনকে প্রেরণ করলো। "মাররুয্যাহরান" পৌছে তারা যখন দেখতে পেলো যে, হজ্জের সময় আরাফার ময়দানে অসংখ্য হাজীরা রাত্রিযাপনকালে যেভাবে আগুন জালায়, সেভাবে অসংখ্য পরিমাণে আগুন জলছে, তখন তারা অবাক হয়ে গেলো। এবং একে অন্যকে এর কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে লাগলো।

রাতের বেলা দুশমনের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উমর রা. এর নেতৃত্বে আনসারী সাহাবাদের এক জামা'আতকে নিয়োগ করেছিলেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হা. নং ৩৮০৫৫)

তারা আবু সুফিয়ান ও তার সাথীদ্বয়ের অস্তিত্ব টের পেয়ে তাদের পাকড়াও করে ফেললো। (বুখারী শরীফ, হা.নং ৪২৮০)

ইতোমধ্যে নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের খচ্চরে চড়ে নবীজীর চাচা আব্বাস রা. এসে উপস্থিত হলেন। আসন্ন বিপদ টের পেয়ে পূর্ব বন্ধুত্বের সূত্রতায় আবু সুফিয়ান হযরত আব্বাস রা. এর কাছে মুক্তির পন্থা কামনা করলো! আব্বাস রা. তাকে খচ্চরের পিঠে বসিয়ে দ্রুত নবীজীর দরবারের উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। কারণ প্রবল আশঙ্কা ছিলো যে, আল্লাহর এ দুশমনকে দেখে মুসলমানদের তরবারী কোষবদ্ধ থাকবে না। পথে হযরত উমর রা. আবু সুফিয়ানকে দেখে

ফেললেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের চরম দুশমন আবু সুফিয়ানকে দেখে উমর রা. এর মতো আশেকে রাসূলের পক্ষে নিবৃত থাকা কোন ক্রমেই সম্ভব ছিল না! কাজেই তাকে হত্যার অনুমতি নেওয়ার উদ্দেশে ওমর রা. তৎক্ষণাৎ নবীজীর দরবারের উদ্দেশে ছুটলেন। ইতোমধ্যে আব্বাস রা. ও দরবারে রিসালাতে পৌছে গেলেন। (শরহু মা'আনিল আসর, হা.নং ৫৪৫০)

ক্ষমা মহানুভবতার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত!

ওমর রা. নবীজীর কাছে আবু সুফিয়ানকে হত্যার অনুমতি চেয়ে বললেন,

هَذَا ابُو سُفْيَانَ , قَدْ امْكَنَ اللهُ مِنْهُ بِلَا عَقْدٍ وَلَا عَهْدٍ , فَدَعْنِي فَاضْرِبُ عُنُقَهُ

"হে আল্লাহর রাসূল! এই যে, আবু সুফিয়ান, আমাদের কোনো প্রচেষ্টা ছাড়াই আল্লাহ তা'আলা তাকে আমাদের হস্তগত করে দিয়েছেন। সুতরাং আমাকে অনুমতি দান করুন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই!"

আব্বাস রা. বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাকে নিরাপত্তা দান করেছি।"

নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হত্যার অনুমতি দিলেন না। বরং আব্বাস রা. কে বললেন,

اذْهَبْ بِهِ الَى رَحْلِكَ فَاذَا اصْبَحْتَ فَاتِنَا بِهِ

" তাকে তোমার তাবুতে নিয়ে যাও, সকাল বেলা নিয়ে এসো" ।

আবু সুফিয়ানের ইসলাম গ্রহণ

সকাল বেলা যখন আব্বাস রা. আবু সুফিয়ানকে নবীজীর দরবারে উপস্থিত করলেন, তখন নবীজী তাকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে বললেন,

وَيْحَكَ يَا ابَا سُفْيَانَ , الَمْ يَانِ لَكَ انْ تَشْهَدَ انْ لَا الَهَ الَّا اللهُ؟

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

“হে আবু সুফিয়ান! এখনও কি তোমার এ কথার সাক্ষ্য দেওয়ার সময় আসেনি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই?”

আবু সুফিয়ান ইসলামের ব্যাপারে তাঁর অন্তরের সন্দিহান অবস্থার কথা বলে সাক্ষ্য প্রদানে বিরত থাকলো। নবীজী আবার তাকে দাওয়াত দিলেন,

وَيْلَكَ يَا اَبَا سُفْيَانَ اَلَمْ يَانِ لَكَ اَنْ تَشْهَدَ اَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ

“হে আবু সুফিয়ান! এখনও কি এ কথার সাক্ষ্য দেওয়ার সময় আসেনি যে, নিশ্চয় আমি আল্লাহর রাসূল!”

আবু সুফিয়ান এবারও দোদুল্যমানতা প্রকাশ করলো। হযরত আব্বাস রা. তাকে বললেন, “আবু সুফিয়ান! তোমার ধ্বংস হোক! ইসলাম গ্রহণ করো! এবং তোমার গর্দান উড়ে যাওয়ার আগেই এ কথার সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল।”

এরপর আবু সুফিয়ান তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান করে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিল।

আবু সুফিয়ান যখন নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন আব্বাস রা. নিবেদন করলেন,

يَا رَسُوْلَ اللهِ، اِنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ يُحِبُّ هٰذَا الْفَخْرَ، فَاجْعَلْ لَهُ شَيْئًا.

“হে আল্লাহর রাসূল! আবু সুফিয়ান একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। তার ব্যক্তিত্ব সম্মান ও গৌরবময় বিষয় পছন্দ করে। কাজেই (মক্কা প্রবেশকালে) আপনি তাকে গৌরবময় কোনো বিষয়ের অধিকার দান করুন।”

নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

«نَعَمْ، مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَغْلَقَ عَلَيْهِ دَارَهُ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَهُوَ آمِنٌ»

হ্যাঁ, (আজকের দিনে মক্কাবাসীদের মধ্য হতে) যে আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ। যে নিজ ঘরে দরজা বন্ধ করে আশ্রয় নিবে সেও নিরাপদ। আর যে মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে, সেও আজ নিরাপদ থাকবে। (হাদীস নং ৩০২২)

আবু সুফিয়ানের মুসলিম বাহিনী পর্যবেক্ষণ

আবু সুফিয়ানকে মক্কায় প্রেরণের পূর্বে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাইলেন তাকে মুসলিম সেনাবাহিনীর শৌর্যবীর্যের ঝলক দেখাতে!

আব্বাস রা. তাকে পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে গেলেন। বীরত্ব ও সাহসিকতার দ্যূতি ছড়িয়ে সাহাবায়েকেরামের জামা‘আত ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে পথ অতিক্রম করতে লাগলো, আর আবু সুফিয়ান তা দেখতে লাগলেন। এক পর্যায়ে আনসারী সাহাবাদের একটি বড় জামা‘আত নিয়ে হযরত সা‘দ বিন উবাদাহ রা. এগিয়ে এলেন। যার হাতে মুসলিম সেনাবাহিনীর ঝান্ডা ছিলো। আবু সুফিয়ানকে দেখে (কাফেরদের জুলুম নির্যাতনের ব্যাপারে আবু সুফিয়ানের অগ্রণী ভূমিকার কথা মনে পড়ে যাওয়ায়) সা‘দ বিন উবাদা রা. বলে উঠলেন,

يَا أَبَا سُفْيَانَ، اليَوْمَ يَوْمُ المَلْحَمَةِ، اليَوْمَ تُسْتَحَلُّ الكَعْبَةُ،

“হে আবু সুফিয়ান! আজ তো ‘হত্যার’ দিন, আজ কাবার মধ্যে হত্যাযজ্ঞের বৈধতা দেয়া হবে।” (বুখারী শরীফ, হা. নং ৪২৮০)

বিনয় ও নম্রতার আরো একটি দৃষ্টান্ত!

কিছুক্ষণ পর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করলেন। বিনয়বশতঃ নবীজী ছিলেন সাহাবাদের একটি ক্ষুদ্র কাফেলার সাথে!

TOP

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

আবু সুফিয়ান যেহেতু হযরত সা'দ বিন উবাদার কথায় আতংকিত হয়ে গিয়েছিলেন, কাজেই নবীজীকে দেখেই সে সা'দ বিন উবাদার কথা অভিযোগের সূরে জানালো। নবীজী তা শুনে বললেন,

«كَذَبَ سَعْدٌ، وَلَكِنْ هَذَا يَوْمٌ يُعَظِّمُ اللهُ فِيهِ الكَعْبَةَ، وَيَوْمٌ تُكْسَى فِيهِ الكَعْبَةُ»

সা'দ ভুল বলেছে, আজ তো কাবাকে সম্মানিত করা হবে! আজ কাবাকে গিলাফ দ্বারা সুসজ্জিত করা হবে!!

আবু সুফিয়ানকে লক্ষ্য করে সা'দ বিন উবাদা রা. এর বক্তব্য যেহেতু বাহ্য দৃষ্টিতে শোভনীয় ছিল না, কাজেই নবীজী তার হাত থেকে ঝান্ডা নিয়ে নিলেন, তবে তিনি যেন কষ্ট না পান সে দিকে লক্ষ্য রেখে ঝান্ডা তার পুত্র 'কায়স' কে দিয়ে দিলেন। এরপর স্বয়ং হযরত সা'দ এর অনুরোধে নবীজী সে ঝান্ডা কায়স থেকে নিয়ে হযরত যুবায়ের রা. কে ধারণ করতে দিলেন। (মুসনাদে বাযযার, ৭৩১৬; ফাতহুল বারী, ৭:৬৪৫)

আবু সুফিয়ানের সতর্কীকরণ

মুসলিম সেনাবাহিনীর শক্তিমত্তা পর্যবেক্ষণ করে আবু সুফিয়ান মক্কায় চলে গেলেন। এবং চিৎকার করে করে মক্কাবাসীকে সতর্ক করতে লাগলেন, পাশাপাশি নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুনির্দিষ্ট নিরাপত্তা দানের ঘোষণাও করতে লাগলেন। (তহাবী শরীফ, হা. নং ৫০৫৪)

মক্কায় প্রবেশ

সাহাবী হযরত ইবনে উমর রা. বলেন,

دَخَلَ مَكَّةَ مِنْ كَدَاءٍ مِنَ الثَّنِيَّةِ العُلْيَا الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ، وَخَرَجَ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى

নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'সানিয়্যায়ে উলইয়া' এর 'বাতহা' এর অন্তরগত 'কাদা' নামক স্থান দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন। আর 'সানিয়্যায়ে সুফলা' দিয়ে বের হয়ে যান। (বুখারী শরীফ, হা. নং ১৫৭৬)

TOP

নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবায়ের ইবনে আওয়াম রা. কে মুহাজির সাহাবাদের আমীর বানিয়ে 'হাজুন' নামক স্থানে তার ঝান্ডা লাগানোর নির্দেশ দিয়ে তাকে মক্কার উঁচু অঞ্চল "কাদা" দিয়ে প্রবেশ করতে বললেন। আর তাকে নির্দেশ দিলেন যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম "কাদা" দিয়ে প্রবেশ করে 'হাজুন' নামক স্থানে না আসা পর্যন্ত সে যেন স্থান ত্যাগ না করে। অপরদিকে হযরত খালিদ রা. কে অপর কিছু গোত্রের আমীর বানিয়ে লোকালয়ের নিকটবর্তী কোনো অঞ্চলে তার ঝান্ডা স্থাপনের নির্দেশ দিয়ে মক্কার নিচু অঞ্চল 'কুদা' দিয়ে প্রবেশ করতে বললেন। আর সা'দ ইবনে উবাদা রা. কে আনসারদের একটি বাহিনীর সাথে প্রেরণ করলেন। সাথে সাথে এ নির্দেশও দিয়ে দিলেন যে, যারা লড়াই থেকে বিরত থাকে, তাদের সাথে যেন লড়াই না করা হয়।

নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সাহাবায়েকেরামকে নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন তিনি ইহরাম অবস্থায় ছিলেন না। হাকেম রহ. বলেন,

وَلم يَخْتَلِفُوا انه دَخلهَا وَهُوَ حَلَال

এ বিষয়ে উলামায়ে কেরামের ঐক্যমত্য রয়েছে যে, ফাতহে মক্কার সময় মক্কায় প্রবেশকালে নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম অবস্থায় ছিলেন না।

ইহরাম গ্রহণ না করার কারণ হলো যে, ফাতহে মক্কার সময় নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আল্লাহ তা'আলা তার নবীর জন্য মক্কাকে হালাল করে দিয়েছিলেন। (উমদাতুল কারী, ৭:৫৩৭)

ফাতহে মক্কার সফরে নবীজীর অবস্থানস্থল

ফাতহে মক্কার এ সফরে নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থানস্থল ছিলো 'হাজুন' নামক স্থানে। যেখানে নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবায়ের ইবনে আওয়াম রা. কে তার ঝান্ডা স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ স্থানকে 'শিআবে আবু তালেব',

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

‘মুহাস্সাব’, ‘খাইফে বনু কিনানা’, ‘আবত্বহ’ প্রভৃতি নামেও অভিহিত করা হয়। এ স্থানেই মক্কার কাফেররা কুফরের উপর শপথ নিয়েছিলো। এখানে নবীজীর জন্য চামড়া দ্বারা তৈরিকৃত একটি তাবু টানানো হয়, নবীজী সে তাবুতেই অবস্থান নেন। (ফাতহুল বারী, ৬:১১৭; তাবাকাতে ইবনে সা‘আদ, ২:৩১৮)

ইমাম নববী রহ. বলেন, ‘কুফরের উপর শপথ করা’ এর অর্থ হলো, মক্কার কাফেররা হিজরতের পূর্বে নবুওয়্যাতের সপ্তম বছরে যখন নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফেরদের মাঝে ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করেন, এবং নবীজীর খান্দানও নবীজীর ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিধানে সচেষ্ট হয়, তখন নবীজীকে এবং নবীজীর খান্দান বনু হাশেম ও বনু মুত্তালিবকে মক্কা থেকে বয়কট করে ‘খাইফ’ এ নির্বাসিত করে। যেটা ছিলো মূলত বনু হাশেমের মালিকানাধীন পাহাড়ের এক ঘাটি, যাকে ‘শিআবে আবু তালেব’ বলা হতো। (উমদাতুল কারী, ৭:১৫০)

খান্দামা লড়াই!

মক্কায় প্রবেশের সময় কাফেররা বড় ধরণের কোনো প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে না পারলেও ‘খান্দামা’ নামক স্থানে খালিদ রা. এর বাহিনীর বিরুদ্ধে তারা কিছুটা ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের চেষ্টা করে। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগেই সাহাবাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। ফলে কাফেরদের এ প্রতিরোধ ছিল মূলত হেরে যাওয়া লড়াইয়ে বিজয়ী হওয়ার ব্যর্থ প্রচেষ্টা। খালিদ রা. তাদেরকে নির্মমভাবে পরাজিত করেন।

হযরত আবু হুরাইরা রা. বলেন, ফাতহে মক্কার দিন নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আনসারদের ডেকে আনতে বললেন। আনসার সাহাবীরা সমবেত হলে বললেন,

«تَرَوْنَ اِلَى اَوْبَاشِ قُرَيْشٍ، وَاَتْبَاعِهِمْ». ثُمَّ قَالَ بِيَدَيْهِ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْاُخْرَى
«اُحْصُدُوهُمْ حَصْدًا» ثُمَّ قَالَ: «حَتَّى تُوَافُونِي بِالصَّفَا».

" কুরাইশ ও তাদের অনুসারীদের দলসমূহ তোমরা দেখতে পাচ্ছো" , এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু ' আলাইহি ওয়াসাল্লাম করণীয় সম্পর্কে হাত দ্বারা ইশারা করে বললেন, ' তোমরা তাদেরকে কর্তিত ফসলের ন্যায় কেটে ফেলো' , এরপর বললেন, " এরপর তোমরা আমার সাথে সাফা পাহাড়ে মিলিত হবে" । (মুসলিম শরীফ, হা. নং ১৭৮০)

এ লড়াইয়ে কুরাইশদের ২৪ জন এবং তাদের সহযোগী হুজাইল গোত্রের ৪ জন নিহত হয়। সাহাবায়ে কেরামের মধ্য হতে মাসলামা জুহানী রা. ও কুরয ইবনে জাবের ফিহরী রা. শহীদ হন। (বুখারী শরীফ, হা. নং ৪২৮০; ফাতহুল বারী, ৭:৬৪৭)

' বিনয়ী' বেশে ' বিজয়ী' র পদার্পণ!

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা' আলা দুনিয়ার রাজা বাদশাদের রীতি-নীতি সম্পর্কে উল্লেখ করে ইরশাদ করেন,

اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْٓا اَعِزَّةَ اَهْلِهَآ اَذِلَّةً ۚ

' রাজা-বাদশাগণ যখন কোনো জনপদে ঢুকে পড়ে, তখন তাকে ধ্বংস করে ফেলে, এবং তার মর্যাদাবান বাসিন্দাদেরকে লাঞ্ছিত করে ছাড়ে।' (সূরা নামল, আয়াত: ৩৪)

যদি ইতিহাসের পাতা উল্টানো হয়, তবে ইসলামের আলো বঞ্চিত সম্রাজ্যবাদী মানসিকতার বাদশাহদের ক্ষেত্রে আল্লাহর এ বাণীর সত্যতা দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত হবে। এর বিপরীতে এ সত্যও উদ্ভাসিত হবে যে, ইসলামের আলোয় আলোকিত অন্তকরণের অধিকারী কোনো মর্দে মুজাহিদ যখন বিজয়ী বেশে কোনো জনপদে প্রবেশ করেছেন, তখন তা ধ্বংস করার পরিবর্তে ইসলামের শাশ্বত বিধানমতে সেখানকার অধিবাসীদের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করেছেন। ক্ষমা, উদারতা আর মহানুভবতার দৃষ্টান্ত স্থাপনে ব্রতী হয়েছেন।

ইসলামের এ সোনালী ইতিহাস কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; বরং এটাই ইসলামের শিক্ষা এবং ইসলামের নবীর দীক্ষা, দশ বছর কাফেরদের

অবর্ণনীয় নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হয়ে যিনি আপন মাতৃভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং মদীনার ভূমিতেও কাফেররা যাকে স্বস্তিতে থাকতে দেয়নি, সেই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামই যখন আত্মোৎসর্গী সাহাবাদেরকে নিয়ে যারা তার কথায় প্রাণ বিলিয়ে দেওয়াকেও সামান্য জ্ঞান করতো, বিজয়ী বেশে আপন মাতৃভূমিতে প্রবেশ করলেন, তখন ঔদ্ধত্য, অহংকার আর প্রতিশোধস্পৃহার স্থলে স্থাপন করলেন বিনয়-নম্রতা এবং ক্ষমা ও উদারতার এক বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত।

আজকের দুনিয়া কি পারবে বিজাতীয়দের ইতিহাস ঘেটে এমন একটিমাত্র তুলনা পেশ করতে? কখনই তা পারবে না। এ গৌরবের অধিকার শুধু ইসলামের নবীর, এ সম্মানের প্রাপ্তিটুকু কেবল সে নবীর অনুসারীদের।

মক্কায় প্রবেশকালে নবীজী সাল্লাল্লাহু ' আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণে-উচ্চারণে ঔদ্ধত্য কিংবা অহংকার তো ছিলই না; বরং প্রতিটি পদক্ষেপে ঝরে পড়ছিলো বিনয়-নম্রতা আর আল্লাহ তা' আলার প্রতি কৃতজ্ঞতা। এ যেন বিজয়ী সেনাপতির বেশে বিনয়ী বান্দা।

হযরত আনাস রা. বলেন, ফাতহে মক্কার সময় নবীজী সাল্লাল্লাহু ' আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় এমন অবস্থায় প্রবেশ করেন যে, বিনয়বশতঃ তার থুতনী সওয়ারীর পিঠের সাথে লেগে যাচ্ছিলো। মনে হচ্ছিলো, নবীজী সাল্লাল্লাহু ' আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেন কৃতজ্ঞতার সেজদায় পড়ে আছেন! (মুসতাদরাকে হাকেম, হা. নং ৭৮৮৮)

নবীজীর বিনয়মাত্রা এতটা ছিলো যে, প্রবেশকালে তিনি তেজস্বী ঘোড়ার পরিবর্তে সাধারণ উটনীতে আরোহণ করেন এবং উঁচু স্তরের কোনো সাহাবীর পরিবর্তে নিজের পেছনে গোলাম পালকপুত্র যায়দ রা. এর ছেলে উসামা রা. কে বসিয়ে প্রবেশ করেন! (বুখারী শরীফ, হা. নং ৪২৮৯)

হাজরে আসওয়াদ চুম্বন ও কাবা ঘরের তাওয়াফ

TOP

এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘ আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে হারামে প্রবেশ করেন। প্রথমে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করেন। এরপর বাইতুল্লাহর তওয়াফ করেন। (মুসলিম শরীফ, হা. নং ১৭৮০)

হযরত ইবনে উমর রা. বলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতহে মক্কার দিন তার উটনী ‘ কাসওয়া’ তে আরোহণ করে তওয়াফ করেন। এবং হাতে থাকা বক্র মাথা বিশিষ্ট লাঠি দ্বারা ‘ রুকন’ স্পর্শ করেছিলেন। (সহী ইবনে খুজাইমা, হা. নং ২৭৮১; যাদুল মা‘আদ, ৩:৩৫৮)

কাবার আশেপাশের মূর্তি অপসারণ

ইসলাম তাওহীদ ও একত্ববাদের ধর্ম। পৌত্তলিকতা আর মূর্তিপূজার কোনো অবকাশ ইসলামে নেই। এ কারণেই ইসলামে সবচেয়ে বড় গুনাহ যা আল্লাহ তা‘ আলা কখনো ক্ষমা করবেন না তা হলো “ শিরক” । ছবি আঁকা বা ভাস্কর্য তৈরি করা সহ ‘ শিরক’ এর সকল চোরাপথ ইসলামে কঠিনভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ফাতহে মক্কার সময় কাবা ও তার আশেপাশের এবং সমগ্র মক্কার মূর্তি ও পূজামণ্ডপগুলো নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘ আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কঠোরতার সাথে নিশ্চিহ্ন করেছিলেন, তা দ্ব্যর্থহীনভাবে পৌত্তলিকতা সম্পর্কে ইসলামের সেই অনড় অবস্থানকেই প্রমাণিত করে।

শিরক ও পৌত্তলিকতা বিরোধী একত্বাবাদের ধর্ম ইসলামের অনড় অবস্থানকে সুস্পষ্ট করার নিমিত্তেই এতদ্বসংক্রান্ত হাদীসের বর্ণনাগুলো আমরা পাঠক সম্মুখে কিছুটা বিস্তারিত উদ্ধৃত করার প্রয়াস পাবো। পরিশেষে একটি বানোয়াট বর্ণনার অসারতা তুলে ধরতেও সচেষ্ট হবো।

ফাতহে মক্কার সময় কাবার চতুর্পার্শ্বে সর্বমোট তিনশত ষাটটি মূর্তি রাখা ছিলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘ আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হাতের লাঠির দ্বারা মূর্তিগুলোর দিকে ইশারা করেন, তখন মোজেজা স্বরূপ

www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com

স্পর্শ করা ছাড়া শুধু ইশারাতেই মূর্তিগুলো মুখ থুবড়ে পড়ে যেতে থাকে।

ইবনে মাসউদ রা. বলেন ফাতহে মক্কার দিন নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘ আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন বাইতুল্লার চারপাশে তিনশত ষাটটি মূর্তি ছিলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘ আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতের একটি লাঠি দ্বারা মূর্তিগুলোকে আঘাত করছিলেন এবং যবানে এ আয়াত পড়ছিলেন,

"جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا" ○ "جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيْدُ" ○

‘ সত্য এসে গেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয়ই মিথ্যা এমন জিনিস, যা বিলুপ্ত হওয়ারই।’ সত্য এসে গেছে আর মিথ্যা না পারে কিছু শুরু করতে আর না পারে কিছু পুনরাবৃত্তি করতে!’ (মুসলিম শরীফ, ১৭৮১)

হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন,

«دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى الْكَعْبَةِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ صَنَمًا، وَقَدْ شَدَّ لَهُمْ إبْلِيسُ أَقْدَامَهُمْ بِالرَّصَاصِ، فَجَاءَ وَمَعَهُ قَضِيبُهُ فَجَعَلَ يَهْوِي بِهِ إلَى كُلِّ صَنَمٍ مِنْهَا فَيَخِرُّ لِوَجْهِهِ،

ফাতহে মক্কার দিন নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘ আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন (মসজিদে হারামে) প্রবেশ করলেন, তখন কাবার পাশে তিনশত ষাটটি মূতি রাখা ছিলো, যেগুলোর পা ইবলিস শয়তান (মাটির সাথে) সীসা দ্বারা বেঁধে রেখেছিলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘ আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতের লাঠির দ্বারা মূর্তিগুলোর দিকে ইশারা করা মাত্রই তা মুখ থুবড়ে পড়ে যেতে লাগলো। (তাবারানী কাবীর, হা. নং ১০৬৫৬; মাজমাউজ যাওয়ায়েদ, হা. নং ১০২৫৪)

বাইতুল্লার চাবি গ্রহণ ও তাতে প্রবেশ

GET ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসমান ইবনে তালহা যিনি বাইতুল্লাহর চাবি হেফাজতের দায়িত্বে ছিলেন, তার কাছে থেকে চাবি নিয়ে বাইতুল্লায় প্রবেশ করেন। (তাবারানী কাবীর, হা. নং ৮৩৯৫; যাদুল মা'আদ, ৩:৩৫৮)

কাবা অভ্যন্তরের মূর্তি অপসারণ

কাবার অভ্যন্তরে কিছু ছবি ছিলো দেয়ালে অঙ্কিত আর কিছু ছিলো ভাস্কর্য বা মূর্তির আকারে। কাবার আশেপাশের মূর্তি অপসারণের আগে নবীজী যখন 'বাতহা' অবস্থান করছিলেন, তখনই সাহাবাদেরকে কাবার অভ্যন্তরে থাকা মূর্তিসমূহ বের করার এবং স্তম্ভে ও দেয়ালে অঙ্কিত ছবিহসমূহ মুছে ফেলার নির্দেশ প্রদান করেন।

তবে মোছার পরও কিছু প্রতিকৃতির ছাপ রয়ে গিয়েছিলো। যেগুলো সহজে অপসারণ করা যাচ্ছিলো না। নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কাবার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন, তখন নিজে এবং সাহাবাদের মাধ্যমে সেই রয়ে যাওয়া ছবিগুলো পানি, মাটি ও জাফরানের মাধ্যমে মুছে ফেলেন। (ফাতহুল বারী, ৭:৬৫৪)

হযরত জাবের রা. বলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবা ঘরে প্রবেশের পূর্বে 'বাতহা' স্থানে থাকাকালীন উমর রা. কে নির্দেশ দিলেন, যেন তিনি কাবার অভ্যন্তরে থাকা সকল ছবি মিটিয়ে দেন। উমর রা. নির্দেশ পালন করলেন, এরপর নবীজী কাবার অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। (আবু দাউদ, ৪১৫৬)

উসামা ইবনে যায়দ রা. এর বর্ণনামতে কাবার অভ্যন্তরে প্রবেশের পর নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন প্রতিকৃতি দেখতে পেলেন, তখন আমাকে পানি আনতে বললেন, আমি এক বালতি পানি নিয়ে এলাম, নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে পানি দ্বারা সে প্রতিকৃতি মুছতে লাগলেন। আর বলতে লাগলেন,

«قَاتَلَ اللهُ قَوْمًا يُصَوِّرُونَ مَا لَا يَخْلُقُونَ»

“ আল্লাহ তা‘ আলা ধ্বংস করুন ঐ সকল লোককে, যারা এমন বস্তুর প্রতিকৃতি তৈরি করে, যারা কোন কিছুর মধ্যে প্রাণ দানে সক্ষম নয়!” (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হা. নং ২৫৭২২)

হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর বর্ণনামতে কাবার অভ্যন্তরের ছবিগুলোর মধ্যে হযরত ইবরাহীম আ. ও মারইয়াম আ. এর ছবি ছিল। (অপর বর্ণনামতে ইসমাইল আ. এর ছবিও ছিলো।) নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবরাহীম আ. ও মারইয়াম আ. এর ছবি দেখে বললেন, এঁরা (ইবরাহীম আ. ও মারইয়াম আ.) তো (আল্লাহর এ বিধান) শুনেছেন যে, ফেরেশতারা সে গৃহে প্রবেশ করেন না, যাতে কোনো চিত্র থাকে। (অর্থাৎ ছবির ব্যাপারে তাঁরা কখনও সম্মত থাকতে পারেন না।) (বুখারী শরীফ, হা. নং ৩৩৫১)

ইসমাইল আ. এর পরিবর্তে ইবরাহীম আ. যে জান্নাতী দুম্বাটি কুরবানী করেছিলেন, তার দুটি শিং কাবার অভ্যন্তরে ঝুলানো ছিলো। ফাতহে মক্কার দিন নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘ আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবার অভ্যন্তর হতে বের হওয়ার পর কাবা ঘরের চাবি রক্ষক উসমান ইবনে তালহা কে ডেকে বললেন,

اِنِّي كُنْتُ رَاَيْتُ قَرْنَيِ الْكَبْشِ حِينَ دَخَلْتُ الْبَيْتَ، فَنَسِيتُ اَنْ اٰمُرَكَ اَنْ تُخَمِّرَهُمَا،
فَخَمِّرْهُمَا فَاِنَّهُ لَا يَنْبَغِي اَنْ يَكُونَ فِي الْبَيْتِ شَيْءٌ يَشْغَلُ الْمُصَلِّيَ

‘বাইতুল্লায় প্রবেশের সময় আমি তোমাকে দুম্বার শিং দুটো ঢেকে দেওয়ার আদেশ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমি তা ভুলে গিয়েছি। সেগুলো ঢেকে দিও, কেননা ঘরে এমন কোনো বস্তু থাকা উচিত নয়, যা নামাযীর মনোযোগ বিনষ্ট করে!’ (মুসনাদে আহমাদ, হা. নং ১৬৬৩৭)

একটি বানোয়াট বর্ণনা

আযরাকী রহ. (মৃত্যু ২৫০ হি.) তার কিতাব ‘আখবারু মক্কা’ *(প্রকাশনা: দারুল আন্দালুস, বৈরুত)* গ্রন্থে কাবা ঘরের অভ্যন্তরে মূর্তি ভাঙা প্রসঙ্গে একটি বর্ণনা এনেছেন। যাতে রয়েছে যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবার অভ্যন্তরে প্রতিকৃতি অপসারণের সময় সব

প্রতিকৃতিই মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দান করেন, তবে কেবল ঈসা আ. ও মারইয়াম আ. এর প্রতিকৃতি না মিটিয়ে রেখে দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। (আখবারু মক্কা, ১:১৬৮-১৬৯)

আযরকী রহ. -এর এ বর্ণনাটি মুহাদ্দিসীনে কেরামের দৃষ্টিতে 'মুনকার' (চরম আপত্তিকর) এবং অগ্রহণযোগ্য।

'মতন' মুনকার হওয়া প্রসঙ্গ

কাবা ঘরের অভ্যন্তরের এবং আশেপাশের মূর্তি ভাঙার বিষয়ে আমরা ইতোপূর্বে যে হাদীসগুলো উল্লেখ করেছি, সে সবগুলো বর্ণনার সনদ গ্রহণযোগ্য পর্যায়ের। পক্ষান্তরে আযরকী রহ. এর বর্ণনাটি ঐ সকল বর্ণনার পরিপন্থী হওয়ায় গ্রহণযোগ্য নয়। উপরন্তু তা শরী'আতের মানশা ও রুচিরও বিপরীত। কেননা, যেখানে ছবি নির্মাণের কারণে সর্বোচ্চ শাস্তির কথা এসেছে, এবং নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে তিনশত ষাটটি মূর্তি ভাঙলেন, এমনকি কাবায় ঢোকার আগেই উমর রা. কে পাঠালেন অভ্যন্তরের মূর্তি অপসারণের জন্য, নিজ হাতে পানি দ্বারা অঙ্কিত ছবি মুছলেন, সেখানে এটা কীভাবে সম্ভব হতে পারে যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈসা আ. ও মারইয়াম আ. এর ছবি রেখে দেবেন? অথচ বুখারী শরীফের এর বর্ণনামতে নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম খোদ মারইয়াম আ. এর ছবির উপরও আপত্তি করেছিলেন! (বুখারী শরীফ, হা. নং ৩৩৫১)

সারকথা হলো, ফাতহে মক্কার সময় কাবার অভ্যন্তরে মারইয়াম আ. এর ছবি থাকার কথাটি যদিও সঠিক কিন্তু সে ছবি অপসারণ না করার যে বর্ণনা রয়েছে, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও বানোয়াট বর্ণনা। বরং অন্যান্য সহীহ বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন অন্য সব ছবি অপসারণ করেছিলেন, তেমনি মারইয়াম আ. এর ছবিও অপসারণ করেছিলেন।

দুঃখজনক কথা হলো, ২০০৮ সালে ঢাকা বিমানবন্দরের অদূরে হাজী ক্যাম্পের সামনে থেকে যখন লালন ভাস্কর্য সরিয়ে ফেলা হলো, তখন এর প্রতিবাদে বাংলাদেশের প্রয়াত একজন খ্যাতিমান কথা সাহিত্যিক দৈনিক প্রথম আলোতে (২৭ অক্টোবর ২০০৮ ঈ.সোমবার) ক্ষোভ ও হতাশা ব্যক্ত করতে গিয়ে এই বানোয়াট বর্ণনাটি উদ্ধৃত করে এ কথা বুঝাবার অপপ্রয়াস চালিয়েছিলেন যে, ইসলামে ভাস্কর্য সংস্কৃতি স্বীকৃত। দীন ও শরী'আতের মেযায ও রুচির বিপরীতে গিয়ে তিনি কেবল অনাধিকার চর্চার দোষেই দুষ্ট হয়েছেন, তা নয়; বরং কাবা ঘরের মূর্তিভাঙ্গা সংক্রান্ত সহীহ বর্ণনাসমূহ এড়িয়ে 'একটি বানোয়াট বর্ণনা' তুলে এনেছেন।

অথচ মুহাদ্দেসীনে কেরামের দৃষ্টিতে উল্লিখিত বর্ণনাটি গ্রহণযোগ্য না হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্ট। সুতরাং এ বর্ণনা নিয়ে কোন বিভ্রান্তির সুযোগ নেই।

কাবার অভ্যন্তরে নবীজীর নামায আদায় ও তাকবীর প্রদান

নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতুল্লায় প্রবেশের পর প্রথমত অভ্যন্তরের প্রতিকৃতিসমূহের রয়ে যাওয়া ছাপ অপসারণ করেন। এরপর সেখানে নামায আদায় করেন এবং প্রত্যেক প্রান্তে তাকবীর বলেন। (যাদুল মা'আদ, ৩:৩৫৮)

নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উসামা ইবনে যায়দ রা. বেলাল রা. ও বাইতুল্লার চাবি রক্ষক উসমান ইবনে তালহা এ তিনজনকে নিয়ে বাইতুল্লায় প্রবেশ করেন। দরজা দিয়ে প্রবেশ করে সোজা পশ্চিম দেয়ালের দিকে এগিয়ে যান। পশ্চিম দেয়াল থেকে তিন হাত দূরত্বে দাঁড়িয়ে ডানদিকে দু'স্তম্ভ , বামদিকে এক স্তম্ভ এবং পেছন দিকে তিন স্তম্ভ রেখে দু'রাকা'আত নামায আদায় করেন। বাইতুল্লাহ সে সময়ে ছয় স্তম্ভ বিশিষ্ট ছিলো। (বুখারী শরীফ, হা. নং ৩৯৭, ৫০৪; মুসনাদে আহমাদ, হা. নং ৫০৬৫)

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

ইবনে আব্বাস রা. বলেন, বাইতুল্লায় প্রবেশের পর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রত্যেক প্রান্তে তাকবীর বলেন। (বুখারী শরীফ, হা. নং ৪২৮৮)

ঐহিহাসিক খুতবা : ক্ষমা ও উদারতার সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত

নামায শেষ করে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বাহিরে আসেন তো দেখতে পান যে, কুরাইশরা তাদের ব্যাপারে নবীজীর সিদ্ধান্ত জানার জন্য অপেক্ষা করছে।

নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতুল্লার দরজায় দাঁড়িয়ে গেলেন। সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে একটি খুতবা পড়লেন। যাতে সর্বপ্রথম তিনি মক্কা বিজয়ের উপর আল্লাহ তা‘আলার শুকরিয়া আদায় করলেন। কিছু আহকাম বয়ান করলেন এবং যারা তাকে দীর্ঘ দশ বছর অবর্ণনীয় নির্যাতন করেছিলো, সেই কাফের কুরাইশদের ব্যাপারে তাঁর ক্ষমার সিদ্ধান্তের ঘোষণাও দিলেন।

এ ছিলো এক ঐতিহাসিক ক্ষমা। কেননা, কোষমুক্ত তরবারীর নির্দয় আঘাতে দীর্ঘদিনের জুলুম-নির্যাতন, অন্যায়-অবিচারের প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো প্রতিরোধ যেখানে ছিল না, সেখানে সবকিছু ভুলে গিয়ে ক্ষমা ও উদারতার এমন উন্মুক্ত ঘোষণা তো কেবল সর্বোত্তম মানবের পক্ষেই সম্ভব ছিল।

ঐতিহাসিক সে খুতবায় নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ، اَلَا كُلُّ مَاثُرَةٍ اَوْ دَمٍ اَوْ مَالٍ يُدَّعَى فَهُوَ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ اِلَّا سَدَانَةَ الْبَيْتِ وَسِقَايَةَ الْحَاجِّ، اَلَا وَقَتِيلُ الْخَطَا شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا، فَفِيهِ الدِّية مُغَلَّظَة، مِائَة مِنَ الْاِبِلِ، اَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا اَوْلَادُهَا... (رواه احمد وابن اسحاق)

(وفي رواية ابن اسحاق) يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، انَّ اللهَ قَدْ اذْهَبَ عَنْكُمْ نَخْوَةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَتَعَظُّمَهَا بِالْاٰبَاءِ، النَّاسُ مِنْ اٰدَمَ، وَاٰدَمُ مِنْ تُرَابٍ، ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْاٰيَةَ: يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَاُنْثٰى، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ اَتْقَاكُمْ ... الْاٰيَةَ كُلَّهَا.

(وفي رواية البيهقي):مَا تَقُولُونَ وَمَا تَظُنُّونَ "؟ قَالُوا: نَقُولُ: اِبْنُ اَخٍ وَابْنُ عَمٍّ حَلِيمٌ رَحِيمٌ. قَالَ: وَقَالُوا ذَلِكَ ثَلَاثًا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اَقُولُ كَمَا قَالَ يُوسُفُ: لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. قَالَ: فَخَرَجُوا كَاَنَّمَا نُشِرُوا مِنَ الْقُبُورِ فَدَخَلُوا فِي الْاِسْلَامِ.

এক-অদ্বিতীয় আল্লাহ তা‘আলা ব্যতিত কোনো মা‘বুদ নেই। তিনি তাঁর (বিজয়ের) প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে দেখিয়েছেন। তার ‘বান্দা’ কে সাহায্য করেছেন এবং কাফেরদের সম্মিলিত বাহিনীকে একাই পরাজিত করেছেন।

শুনে রাখো! (জাহেলী যুগের) সমস্ত অভ্যাস ও জান-মালের দাবি আমার পায়ের নিচে (অর্থাৎ তা বাতিল করা হলো), তবে বাইতুল্লার দাড়োয়ানী এবং হাজীদেরকে যমযমের পানি পান করানোর অভ্যাসটি পূর্ববৎ বহাল থাকবে।

শুনে রাখো! যে ব্যক্তি কারো চাবুক কিংবা লাঠির আঘাতে ভুলবশতঃ নিহত হবে, তার রক্তপণ হলো একশত উট, যার মধ্যে চল্লিশটি উটনী হতে হবে গর্ভবতী।

হে কুরাইশ লোকসকল! আল্লাহ তা‘আলা জাহেলী যুগের অহমিকাবোধ ও পূর্বপুরুষের নামে অহংকারবোধ বাতিল করে দিয়েছেন। সকল মানুষ এক আদম এর সন্তান, আর আদম আ. হলেন মাটির তৈরি।

এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনে কারীমের এ আয়াত পড়লেন,

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقۡنٰكُمۡ مِّنۡ ذَكَرٍ وَّ اُنۡثٰى وَ جَعَلۡنٰكُمۡ شُعُوۡبًا وَّ قَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوۡا ؕ اِنَّ اَكۡرَمَكُمۡ عِنۡدَ اللّٰهِ اَتۡقٰكُمۡ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيۡمٌ خَبِيۡرٌ ○

(আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন), (হে মানুষ!) আমি তোমাদের সকলকে এক পুরুষ ও এক নারী হতে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা একে অন্যকে চিনতে পারো। প্রকৃতপক্ষে তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা বেশি মর্যাদাবান সেই, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি মুত্তাকী। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু জানেন, সবকিছু সম্পর্কে অবহিত। (সূরা হুজরাত, আয়াত:১৩)

এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বললেন, . . 'হে কুরাইশ লোকসকল! আজকে আমার কাছ থেকে তোমরা কেমন আচরণ আশা করো? (কুরাইশরা যদিও নিজেদের অপরাধের ব্যাপারে সচেতন ছিলো, তদুপরি নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদারতার অবগতিও তাদের যথেষ্ট ছিলো। কাজেই তারা বললো-) আপনি আমাদের একজন (সম্ভ্রান্ত) ভাইয়ের সন্তান, এবং সম্ভ্রান্ত চাচার সন্তান। আপনি সহনশীল এবং দয়ালু!

নবীজী তাদেরকে বললেন, 'আমি তোমাদেরকে সেটাই বলবো, যেটা ইউসুফ আ. তার (অপরাধী) ভাইদেরকে (ক্ষমা প্রদানকালে) বলেছিলেন,

لَا تَثۡرِيۡبَ عَلَيۡكُمُ الۡيَوۡمَ يَغۡفِرُ اللّٰهُ لَكُمۡ وَهُوَ اَرۡحَمُ الرّٰحِمِيۡنَ ○

'আজ তোমাদের উপর কোনো অভিযোগ আনা হবে না। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। তিনি সকল দয়ালু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দয়ালু।' (মুসরানাদে আহমাদ, হা. নং ১৫৩৮৮; সীরাতে ইবনে হিশাম, ৪:৬০)

নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পরে লোকেরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলো।

হত্যার দণ্ডাদেশ প্রাপ্ত কতিপয় কাফের

নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেও কাফেরদের মধ্যে এমন কিছু দাগী আসামী রয়ে গিয়েছিলো, যারা ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতি সাধনে কাফেরদের মধ্যে সর্বোচ্চ ভূমিকা রেখেছিলো। তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া ‘ইনসাফ’ পরিপন্থি ছিলো। কাজেই সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করার পরেও নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুনির্দিষ্ট এ সকল কাফেরদেরকে হারামের যেখানেই পাওয়া যায়-এমনকি যদি তারা বাইতুল্লার গিলাফও ধরে থাকে, তবে সেখানেই তাদেরকে হত্যা করার হুকুম দান করেন।

উল্লেখ্য, মক্কা বিজয়ের দিন আল্লাহ তা‘আলা তার নবীর শানে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হারামের সীমানায় হত্যাকার্যের নিষিদ্ধতার হুকুম উঠিয়ে নিয়েছিলেন। যার বর্ণনা সামনে আসছে।

হত্যার দণ্ডাদেশ প্রাপ্ত এ সকল কাফেরদের অধিকাংশই ইসলাম গ্রহণ করে নেওয়ায় নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে মাফ করে দিয়েছিলেন। তারা হলেন,

১. আব্দুল্লাহ ইবনে খতল। যাকে আবু বারযা রা. হত্যা করেন।

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আবী সারাহ। হত্যা দণ্ডাদেশ পাওয়ার পর যে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলো। হযরত উসমান রা. এর সুপারিশে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মাফ করে দেন।

৩. ইকরামা ইবনে আবু জাহল। যে ইয়ামানের দিকে পালিয়ে গিয়েছিলো। তার স্ত্রী উম্মে হাকীম যে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলো, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামর কাছ থেকে স্বামীর নিরাপত্তা নিয়ে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। দরবারে রিসালাতে পৌঁছে ইকরামা ইসলাম গ্রহণ করেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকেও মাফ করে দেন।

TOP

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

৪. হুয়াইরিস ইবনে নুকাইদ। যে মক্কার জীবনে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সীমাহীন কষ্ট দিয়েছিলো। হযরত আলী রা. তাকে হত্যা করেন।

৫. হাব্বার ইবনে আসওয়াদ। মক্কার জীবনে মুসলমানদের উপর নির্যাতনে সে অগ্রণী ছিলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা হযরত যয়নব রা. যখন হিজরত করেন, তখন পথিমধ্যে এই হাব্বার নবীজীর কন্যাকে উট থেকে ফেলে দিয়েছিলো। সে আঘাতেই পরবর্তীতে যয়নব রা. ইন্তেকাল করেন। এতদ্বসত্ত্বেও ফাতহে মক্কার দিনে হাব্বার যখন ইসলাম গ্রহণ করলো তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মাফ করে দিলেন।

৬.৭. ইবনে খতল এর দু’বাঁদি, যাদের নাম ছিলো ফারতানা ও ক্বরীনা। তাদের একজনকে হত্যা করা হয়। আর আরেকজন ইসলাম গ্রহণ করে নেয়।

৮. সারা। সে ইসলাম গ্রহণ করে নেয়।

৯. হারেস ইবনে তলাতিল। হযরত আলী রা. তাকে হত্যা করেন।

১০. কা‘ব বিন যুহায়র। সে ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছিলো।

১১. ওয়াহশী। যে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চাচা হযরত হামজা রা. কে ওহুদের যুদ্ধে নির্মমভাবে শহীদ করেছিলো। সেও ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছিলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকেও মাফ করে দেন।

১২. হিন্দ বিনতে উতবা (আবু সুফিয়ানের স্ত্রী।) সেও ইসলাম গ্রহণ করে নেওয়ায় নবীজী তাকে মাফ করে দেন।

১৩. আরনাব। ইবনে খতলের বাঁদি। তাকে হত্যা করা হয়।

১৪. উম্মে সা‘দ। তাকে হত্যা করা হয়।

TOP

এই সর্বমোট আটজন পুরুষ ও ছয়জন নারীকে হত্যার আদেশ দেয়া হয়। (ফাতহুল বারী, ৭:৬৪৮; ৪:৭২; সীরাতে মুস্তফা, ৩:৪৬)

কাবা ঘরের চাবি হস্তান্তর

নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতুল্লাহ থেকে বের হওয়ার পর উসমান বিন তলহা, যার কাছে ইতোপূর্বে চাবি ছিলো, তাঁর কাছেই হস্তান্তর করেন। তখন হযরত আলী রা. আবেদন করলেন,

يَا رَسُوْلَ اللهِ، لَئِنْ كُنَّا اوتِينَا النُّبُوَّةَ، وَاعْطِينَا السِّقَايَةَ، وَاعْطِينَا الْحِجَابَةَ، مَا قَوْمٌ بِاعْظَمَ نَصِيبًا مِنَّا،

'হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের খান্দানে নবী পাঠানো হয়েছে, আমাদেরকেই হাজীদের পানি পান করানো সৌভাগ্য দান করা হয়েছে। এর সাথে সাথে যদি বাইতুল্লাহর দারোয়ানীর সৌভাগ্যও আমাদের হতো, তবে আমাদের চেয়ে দুনিয়ার বুকে ভাগ্যবান কোনো সম্প্রদায় আর হতো না..!!

নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রা. এর এ কথাটি অপছন্দ করলেন। এবং চাবিটি কাবা ঘরের আগের দারোয়ান উসমান ইবনে তালহা কে অর্পণ করলেন এবং বললেন,

«خُذُوهَا يَا بَنِي طَلْحَةَ خَالِدَةً تَالِدَةً لَا يَنْزِعُهَا مِنْكُمْ الَّا ظَالِمٌ»

'হে তলহার বংশধর! এ চাবি নিয়ে নাও। আজীবনের জন্য এ সৌভাগ্য তোমাদের জন্য রইলো। কোনো জালেম-অত্যাচারি ব্যক্তি ছাড়া এ চাবি তোমার থেকে কেউ কেড়ে নেবে না।' (তাবারানী কাবীর, হা. নং ৮৩৯৫, ১১২৩৪)

উসমান বিন তলহাকে চাবির দায়িত্ব অর্পণ করার পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আব্বাস রা. কে হজ্বের সময় হাজীদেরকে পানি পান করানোর দায়িত্ব অর্পণ করেন। (মাজমাউজ যাওয়ায়েদ, ৫৭০৭, ১০২৫৪; তাবাকাতে ইবনে সা'আদ, ২:৩১৮)

TOP

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

মক্কার ইথারে আবারো তাওহীদের বুলন্দ আওয়াজ...

এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেলাল রা. কে আযান দেওয়ার নির্দেশ দান করেন। বেলাল রা. বাইতুল্লাহর ছাদে উঠে যান এবং তাওহীদ ও রিসালাতের স্বাক্ষ্য সম্বলিত আযানের ধ্বনি উচ্চারণ করেন। এ যেন মক্কা বিজয়ের চূড়ান্ত ঘোষণা বাতাসের ডানায় ভর করে ইথারে ইথারে ছড়িয়ে দেওয়া।! (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হা. নং ৩৮০৫৫)

মক্কাবাসীর ইসলাম গ্রহণ এবং নবীজীর হাতে বাই‘আত

নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কাবাসীকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করার পর মক্কাবাসী ব্যাপকভাবে ইসলাম গ্রহণ করা শুরু করে। বাই‘আত গ্রহণের জন্য নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফা পাহাড়ের উপর বসে যান। প্রথমে পুরুষদের থেকে এরপর নারীদের থেকে বাই‘আত গ্রহণ করেন। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪:৩৪৩)

নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের থেকে ‘ইসলাম’ ও ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’ এর স্বাক্ষের উপর বাই‘আত গ্রহণ করেন। (মুসনাদে আহমাদ, হা. নং ১৫৪৩১)

নারীদের ক্ষেত্রে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতে হাত রেখে বাই‘আত করতেন না, বরং কথার মাধ্যমে বাই‘আত করে নিতেন। আম্মাজান আয়েশা রা. বলেন,

لا وَاللهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَاةٍ قَطُّ، غَيْرَ انَّهُ بَايَعَهُنَّ بِالْكَلَامِ، وَاللهِ مَا اخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النِّسَاءِ الَّا بِمَا امَرَهُ اللهُ، يَقُولُ لَهُنَّ اذَا اخَذَ عَلَيْهِنَّ: «قَدْ بَايَعْتُكُنَّ» كَلَامًا

আল্লাহর কসম! নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনোই কোনো পরনারীর হাত স্পর্শ করেননি, বরং তিনি কথার মাধ্যমে নারীদেরকে বাই‘আত করতেন। আল্লাহর শপথ! নবীজী আল্লাহর নির্দেশ মতে যে সকল নারীকে স্পর্শ করা বৈধ তাদের ছাড়া অন্য

www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com

কোনো নারীকে স্পর্শ করেননি, বরং তিনি যখন নারীদের বাই‘আত গ্রহণ করতেন, তখন কেবল মৌখিকভাবে বলতেন, “আমি তোমাদেরকে বাই‘আত করে নিয়েছি।” (বুখারী শরীফ, হা. নং ৫২৮৮)

উম্মে হানী রা. এর ঘরে নামায আদায়

উম্মে হানী রা. ছিলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাতো বোন, আবু তালেবের কন্যা। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে হানী রা. এর ঘরে প্রবেশ করে গোসল করেন এবং দুই দুই করে আট রাকা‘আত চাশতের নামায আদায় করেন। (বুখারী শরীফ, হা. নং ৪২৯২; আবু দাউদ, হা. নং ১২৯০)

গোসল ও নামায আদায় শেষ করে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ অবস্থানস্থল তথা মুহাস্সাব, যেখানে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাবু টানানো হয়েছিলো, সেখানে চলে যান। (ফাতহুল বারী, ৭:৬৫৭)

দ্বিতীয় দিনের খুতবা,

ফাতহে মক্কার সফরে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনসম্মুখে দুটি খুতবা প্রদান করেন। একটি. ফাতহে মক্কার দিন, কাবা ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে। দ্বিতীয়টি. বিজয়ের দ্বিতীয় দিন। (তাবাকাতে ইবনে সা‘আদ, ২:৩১৮)

সাহাবী হযরত আবু শুরাইহ রা. ফাতহে মক্কার দ্বিতীয় দিনে নবীজীর প্রদত্ত খুতবা বর্ণনা করে বলেন, ‘নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে প্রথমে আল্লাহ তা‘আলার প্রশংসা করেন। এরপর বলেন,

انَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ، وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الاخِرِ انْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا، وَلَا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً، فَانْ احَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا، فَقُولُوا: انَّ اللهَ قَدْ [ص:] اذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَاذَنْ لَكُمْ، وَانَّمَا اذِنَ لِي

TOP

Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com App Store

فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا اليَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ، وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ"

অপর বর্ণনায় খুতবার আরো কিছু অংশ এভাবে এসেছে,

لا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلا يُعْضَدُ شَوْكُهَا، وَلا يُخْتَلَى خَلاهَا، وَلا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إلَّا لِمُنْشِدٍ».

فَقَالَ العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ: إلَّا الإذْخِرَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَإنَّهُ لا بُدَّ مِنْهُ لِلْقَيْنِ وَالبُيُوتِ، فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ: «إلَّا الإذْخِرَ فَإنَّهُ حَلالٌ»

নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলাই মক্কাকে হারাম (সম্মানিত) করেছেন। লোকেরা করেনি। কাজেই আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী কোনো মুমিনের জন্য সেখানে রক্তপাত করা বৈধ নয়। কিংবা সেখানের কোনো গাছ কাটা ও (অপর বর্ণনামতে) কোনো শিকার করা, বা ঘাস কাটাও বৈধ নয়। সেখানের পতিত কোনে বস্তুও তুলে নেওয়াও বৈধ নয়। তবে যে মালিক সন্ধান করার উদ্দেশ্যে নেয়, তার জন্য বৈধ আছে। (বুখারী শরীফ, হা. নং ১০৪, ৪৩১৩)

এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্বাস রা. এর আবেদনে প্রয়োজনের তাগিদে 'ইজখির' (ঘাস বিশেষ) কে কাটার বৈধতা দেন। এরপর বলেন,

'কেউ যদি (ফাতহে মক্কার সময়কালীন) রাসূলের লড়াই দ্বারা রক্তপাতের বৈধতার সুযোগ নিতে চায়, তবে তাকে বলে দাও যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে বৈধতা দিয়েছিলেন, তোমাদেরকে দেননি, আর রাসূলের জন্য দেয়া বৈধতাও দিনের নির্দিষ্ট একটি সময়ের জন্য ছিলো। এরপর তা আগের মতো হারাম করে দেয়া হয়েছে। প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তি এ কথাগুলো অনুপস্থিতের নিকট পৌছে দেবে!

মক্কার অশেপাশের মূর্তিভাঙা

নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা বিজয় করেন, তখন কেবল মসজিদে হারামে বা কাবার অভ্যন্তরেই মূর্তি ছিলো এমন

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

নয়; বরং মক্কার আশেপাশেও অনেক মূর্তি ছিলো। নবীজী সাহাবায়ে কেরাম কে প্রেরণ করে সে সকল মূর্তিও ভেঙে ফেলেন। এ সকল মূর্তিগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিলো তিনটি,

১. উয্যা

মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী স্থানে তা নির্মিত ছিলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম খালেদ রা. কে প্রেরণ করেন তা ভেঙে ফেলার জন্য। খালেদ রা. তা চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলেন।

২. লাত

তায়েফের 'সাকীফ' গোত্রের পূজনীয় ছিলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুগীরা ইবনে শু'বা ও আবু সুফিয়ান রা. কে প্রেরণ করেন তা ভেঙে ফেলার জন্য। ফলে তা ভেঙে ফেলা হয়।

৩. মানাত

মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী 'কুদাইদ' নামক স্থানে স্থাপিত ছিলো। জাহেলী যুগে মদীনার আওস, খাযরায ও খুজাআ গোত্রের পূজনীয় ছিলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু সুফিয়ান রা. কে তা ভেঙে ফেলতে পাঠান। ফলে সেটাও ভেঙে ফেলা হয়। (আসসুনানুল কুবরা, নাসায়ী, ১১৪৮৩; তাফসীরে ইবনে কাসীর, ৭:৪৫৯)

এভাবে মক্কার আশেপাশের সমস্ত মূর্তিও নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভেঙে ফেলেন। নবীজীর এ কর্মপন্থাও সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ বহণ করে যে, ইসলামে ভাস্কর্য সংস্কৃতির কোনো বৈধতা নেই!

প্রিয় কে পেয়েও হারানোর শঙ্কা!

নবুওয়্যাত রবি তো উদিত হয়েছিলো মক্কার আকাশে। কিন্তু দূর্ভাগ্য ছিলো মক্কাবাসীর, সে রবীর রশ্মিকে তারা সযত্নে গ্রহণ করতে পারেনি। সৌভাগ্য লেখা ছিলো মদীনাবাসীর, যারা সে আলো গ্রহণ করেছিলো কৃতজ্ঞ হৃদয়ে, সহাস্য বদনে। পরম আনন্দে আন্দোলিত হয়েছিলো মদীনার পবিত্র ভূমি...তলা'আল বাদরু আলাইনা...!!

TOP

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

কিন্তু ফাতহে মক্কার সময় নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় অবস্থান করলেন, স্বভাবতই আনসারী সাহাবীদের মনে শংকা দেখা দিলো যে, তাহলে কি নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় থেকে যাবেন? ‘প্রিয়’ কে পেয়েও তাকে হারানোর শংকায় তাদের হৃদয়-মন কেঁদে উঠলো!

মুহাব্বাতের আতিশয্যে কিছু সাহাবী তো তাদের শংকার কথা ব্যাক্তও করে ফেললেন। ওহীর মাধ্যমে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা জানতে পেরে আনসারী সাহাবাদেরকে আশ্বস্ত করে বললেন,

«كَلَّا، اِنِّي عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، هَاجَرْتُ الَى اللهِ وَالَيْكُمْ، وَالْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ»

‘কখনোই না, আমি আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল। আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদের কাছে হিজরত করেছি। আমার বেঁচে থাকাও তোমাদের সাথে এবং মৃত্যুও তোমাদের সাথে..!! (মুসলিম শরীফ হা. নং ১৭৮০)

কতদিন ছিলেন মক্কায়

মক্কা বিজয়ের পর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে মোট উনিশ দিন অবস্থান করেন। এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়েকেরামকে নিয়ে মাতৃভূমি ত্যাগ করেন। (বুখারী শরীফ, হা. নং ৪২৯৮)

মক্কা বিজয়ের কিছুদিন পর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তায়েফ অভিমুখে অভিযান পরিচালনা করেন, তখন সাহাবী হযরত হুবাইরা ইবনে শিবল রা. কে মক্কার গভর্ণর নিযুক্ত করেন। এরপর তায়েফ অভিযান শেষ করে যখন মদীনা অভিমুখে রওয়ান হন, তখন হযরত আত্তাব ইবনে আসীদ রা. কে মক্কার গভর্ণর নিযুক্ত করেন।

মক্কা বিজয় কি সন্ধিমূলক না কি বলপূর্বক ?

আল্লাহ তা‘আলা যখন মুসলমানদেরকে কোনো দেশের বিজয় দান করেন, তখন সে দেশটি সন্ধির মাধ্যমে বিজিত হলো? না কি বলপূর্বক বিজিত হলো? তা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়ে উঠে। যেহেতু এর সাথে ইসলামের ভূমি আইন সম্পর্কিত অনেক হুকুম আহকামের সম্পৃক্ততা রয়েছে। এ প্রাসঙ্গিতার বিচারে ঐতিহাসিক মক্কা বিজয় সন্ধির মাধ্যমে হয়েছে না কি বলপূর্বক হয়েছে? তাও একটি গুরত্বপূর্ণ প্রশ্ন ।

এ প্রশ্নের উত্তরে উলামায়ে কেরামের মতবিরোধ রয়েছে। তবে অগ্রগণ্য মত হলো যে, মক্কা সন্ধির মাধ্যমে নয়; বরং বলপূর্বক বিজিত হয়েছে।

মক্কা বিজয়ের ঘটনা হতে আহরিত বিধি-বিধান

এই ছিলো ঐতিহাসিক মক্কা বিজয়ের বিস্তারিত বিবরণ। উম্মতের জন্য যাতে রয়েছে আবশ্যকীয়রূপে গ্রহণীয় বিভিন্ন উপদেশ ও বিধিবিধান। ফাতহে মক্কার সময় প্রদত্ত নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষণ নিয়েই যদি শুধু গবেষণা করা হয়, তবে তাতে উম্মতের জন্য রয়েছে সীরাতে মুস্তাকিমের বিবিধ নির্দেশনা। মূলত জ্ঞানী পাঠকের জন্য এ ঘটনার প্রতিটি ছত্রেই ছড়িয়ে আছে অসংখ্য উপদেশ ও শিক্ষা! তন্মধ্য হতে কিছু বিধি-বিধান এবং উপদেশাবলী নিম্নে উল্লেখ করা হলো,

১. কোনো মুসলমান যখন অপর কোনো মুসলমানকে আল্লাহ এবং তার রাসূলের প্রতি ভালোবাসার কারণে রাগান্বিত হয়ে ঘটনার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞতাবশত মুনাফেক কিংবা কাফের বলবে, তবে এ কারণে বক্তাকে (মুসলমানকে কাফের বলার কারণে) কাফের আখ্যা দেওয়া হবে না। যেমনটি ঘটেছে হযরত উমর রা. ও হাতেব ইবনে আবী বালতাআ রা. এর ক্ষেত্রে।

২. নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যারা গালি দিবে, কিংবা কটূক্তি করবে, তাদেরকে হত্যা করা শরী‘আতের দৃষ্টিতে বৈধ।

TOP

যেমন নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ অপরাধের কারণে মক্কা বিজয়ে দিন সাধারন ক্ষমা ঘোষণা করার পরও অন্য অনেকের সাথে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামর কটূক্তিকারী ইবনে খতলের দু’বাঁদিকে হত্যার হুকুম দিয়েছিলেন।

৩. আল্লাহ তা‘আলা মক্কাকে ‘হারাম’ (সম্মানিত) করেছেন। যেমনটি নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামর খুতবায় উল্লিখিত হয়েছে। এতটাই সম্মানিত করেছেন যে, মক্কার স্থানীয় কোনো পশু-পাখী শিকার করাও বৈধ নয়। এবং এ কারণেই মক্কায় প্রবেশকারীর জন্য হজ্জ/উমরার ইহরাম ছাড়া প্রবেশ করা বৈধ নয়।

৪. হত্যাকার্যে নিহিত ব্যাক্তির ওয়ারিসদের জন্য দু’টি অধিকার রয়েছে, যেমনটি নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুতবায় উল্লিখিত হয়েছে, (ক) কিসাস স্বরূপ হত্যাকারীকে মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানের সহায়তায় হত্যা করা। (খ) অথবা রক্তপণ গ্রহন করা।

৫. ছবি লটকানো আছে, এমন ঘরে নামায পড়া নিষেধ। কেননা, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ততক্ষণ পর্যন্ত কাবার অভ্যন্তরে নামায পড়েননি, যতক্ষণ না সেখানে সকল প্রতিকৃতি অপসারণ করা হয়েছে।

৬. কালো পাগড়ি পরা নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামর থেকে প্রমাণিত রয়েছে। মক্কায় প্রবেশকালে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কালো পাগড়ি পরেছিলেন। তবে সর্বাঙ্গে কালো পোষাক পরা নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয়।

৭. কোনো মুসলমান যদি মুরতাদ হয়ে যায় (আল্লাহর পানাহ!), এবং সে তওবা করে ফিরে না আসে, তবে মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানের জন্য তাকে হত্যা করার আবশ্যক হয়ে যায়। যেমন মুরতাদ হয়ে যাওয়ার অপরাধে আব্দুল্লাহ ইবনে সারাহকে, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম হত্যা করেছিলেন।

TOP

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

৮. ক্ষমা ও উদারতার গুণ, মক্কী জীবনে সকল নির্যাতনের কথা ভুলে গিয়ে নবীজী কাফেরদেরকে যেভাবে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন।

৯. সাফল্য প্রাপ্তিকে নিজের কৃতিত্ব মনে না করে আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামত মনে করার গুণ, যেমন নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজিত হওয়ার পর কেবলই আল্লাহর প্রশংসা করছিলেন।

১০. নবীজীর প্রতি ভালোবাসাকে পিতা-মাতা বরং দুনিয়ার সকল কিছুর ভালোবাসার তুলনায় অগ্রাধিকার দান করতে হবে। যেমন অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন উম্মে হাবীবা রা. ইত্যাদি।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে মক্কা বিজয়ের ইতিহাস থেকে সঠিকভাবে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন।

সমাপ্ত

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store